দারুব্রহ্মকথা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

রেণুকা
৫, নরেন সেন স্কোয়ার, কলকাতা-৯
পরিবেশক : এস. চক্রবর্তী এণ্ড সন্স
২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা-৯.

প্রকাশক : সুব্রত বসু
'সুইট হোম' পূর্ব কোদালিয়া
নব বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

মুদ্রক : স্টার প্রিন্টিং প্রেস
২১/এ, রাধানাথ বোস লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

সূচীপত্র

সাপ বিষয়ে একটি উপাখ্যান

সাপটিকে আমি প্রথম দেখি লালীর জন্মদিনে। রঙচঙে চিত্রিত এক সুন্দর বিভীষিকা, কারণ সাপটি ছিল নিস্পন্দ, কয়েক মিনিটের জন্য যেন লালী আর আমার মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য পাঁচিল হয়ে উঠেছিল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। জিভ ব্লটিং পেপারের মতো লালীর জন্য ক্ষরিত সমস্ত গ্রন্থিরস শুষে নিয়েছিল। লালীর জন্মদিনে একগোছা রজনীগন্ধাই শ্রেষ্ঠ উপহার ভেবে সেই শরৎকালের ভোর-বেলায় যখন আমি বাগানের দিকে হেঁটে যাই, এখনও মনে আছে, সারারাতের শিশিরের মতো আমিও প্রচুর সিক্ত ও কোমল ছিলাম। অথচ রজনীগন্ধার ঝাড়ের ভেতর সাপটিকে দেখামাত্র টের পেলাম কোথাও একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। তাই আমি নিমেষে শুকনো বিবর্ণ টেরাকোটার মতো সময়ের দেয়ালে সেঁটে গিয়েছিলাম।

একটু পরে লালীর বাবা দয়াময় দোতলার ছাদ থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করেন, আমি এভাবে দাঁড়িয়ে কী করছি। দয়াময় ছিলেন বড় কুটিলমনা আর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মানুষ। তাঁর প্রশ্নের জবাবে আমি ভাঙা গলায় বলি, সাপ। তখন দয়াময় ছাদ থেকে অদৃশ্য হন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের বাগানে এসে ঢোকেন। তাঁর হাতে বন্দুক ছিল। কিন্তু তাঁকে একটুও উত্তে-জিত দেখাচ্ছিল না। খুব শান্ত গলায় তিনি সাপটিকে দেখিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যেটুকু সময় লেগেছিল, সাপটির লুকিয়ে পড়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট এবং আর তন্নতন্ন খুঁজে তাকে আমরা দেখতে পাইনি। তখন দয়াময় বাগানের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলেন, বাগানটা একেবারে জঙ্গল করে ফেলেছ তোমরা।

আসলে গ্রামের প্রান্তে পুরনো একটা নালার ধারে এই বাগানটা করেন আমার ঠাকুর্দা। কিছু ফলের গাছের সঙ্গে ফুলের গাছও পুঁতেছিলেন তিনি। আমার বাবা ছিলেন ন্যালাভোলা মানুষ।

প্রকৃতি সম্পর্কে উদাসীন এক শহুরে কেরানি। ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর মা কোনও কারণে প্রকৃতির দিকে মুখ ফেরান। তাঁকে যখন-তখন এই বাগানের ভেতর দেখতে পেতাম। শীতের সময় নিজের হাতে ঝাঁটা ধরে শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন ধরাতেন। আগাছা ওপড়াতেন। টিনের ঝারিতে প্রতি বিকেলে জল ঝরাতেন ফুলফলের গাছপালার মূলে এবং গাছটি তাঁর তুলনায় নিচু হলে তার সর্বাঙ্গ ধুইয়ে দিতেন। তাঁর চোখে বাৎসল্যের উজ্জ্বলতা ঝলমল করতে দেখেছি।

আর দয়াময়কে দেখতাম দোতলার ছাদে দাঁড়িয়ে বাগান-পরিচারিকা আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে। স্কুল থেকে ফিরে প্রতি বিকেলেই জানতাম মাকে কোথায় দেখতে পাব। বাবা সাইকেলে চেপে শহরের আপিসে যেতেন। তাঁর ফিরে আসতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যেত। কোনো-কোনো মধ্যরাতে পাশের ঘর থেকে মায়ের চ্যাঁচামেচি শুনতে পেতাম। তারপর আমার ন্যালাভোলা, শান্ত ও মৃদুভাষী বাবাকে এক বসন্তকালের ভোরবেলায় এই বাগানের ঈশানকোণের আমগাছের উঁচু ডাল থেকে ঝুলতে দেখা যায়। সেই প্রথম বাবাকে আমি উলঙ্গ দেখি। আমার বয়স তখন সাত বছর।...

দয়াময়ের মেয়ে লালী ছিল আমার সহপাঠিনী। লালী চুপিচুপি আমাকে বলেছিল, জানিস বীরু, কেন পানুকাকা গলায় দড়ি দিয়েছেন? আমার বাবার সঙ্গে তোর মায়ের ভাব ছিল।

ওই বয়সে 'ভাব' ব্যাপারটা আমার বোধগম্য ছিল না। অথচ পরে বুঝেছিলাম মেয়েরা কত আগে জীবনের অনেক গূঢ় জিনিস টের পেয়ে যায়। আর লালীই একদিন মুক্তকেশীর ভাঙ্গা মন্দিরতলায় কল্কেফুলের জঙ্গলে কল্কেফুল তুলে কী ভাবে মধু চোষা যায় শেখানোর সময় হঠাৎ মুখে টিপে হেসে বলেছিল, বীরু, আমিও তোর সঙ্গে ভাব করব। রাজি?

কিছু না বুঝেও বলেছিলাম, রাজি।

তারপর কত দিনভর রাতভর ভেবেছি, ভাব কী জিনিস জেনে নিতে হবে লালীর কাছে। অথচ বাবার ন্যালাভোলা ধাতটি আমার মধ্যে এমনই প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, জিগ্যেস করতে সাহস পেতাম না। লালী ছিল তেজী ছটফটে মেয়ে। ছেলেদের সঙ্গে স্কুলের ময়দানে

খেলাধুলো করত। ছেলেদের মধ্যে মাতব্বরি করত। সংস্কৃত পণ্ডিত মশাইয়ের ঘুমন্ত হাঁ-করা মুখে সে একটুকরো চক ফেলে দেওয়ায় ক্লাসসুদ্ধু বেতের ঘা খাওয়া সত্ত্বেও কেউ তার নাম করে দেয়নি। তার বাবা দয়াময় স্কুলের সেক্রেটারী, সেজন্যও নয়। আসলে লালীকেই যেন সবাই ভয় পেত।

তো এই লালীর জন্মদিনে ফুল উপহার দেওয়ার কথা কেন আমার মাথায় এসেছিল, জানি না। আমি তখন রীতিমতো যুবক। মেয়েদের জন্য কামনাবাসনা অথবা ভালবাসার বোধে জ্বরো-জ্বরো। যে আবেগে পাখিরা বাসাগড়ার জন্য খড়কুটো কুড়িয়ে বেড়ায়, সেই-রকম জীব-জাগতিক আবেগ আমাকে সবসময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। পাঁড়াগাঁয়ে প্রচলিত 'ভাব' শব্দটি কী, ততদিনে আমার ওতপ্রোত জানা হয়ে গেছে। অথচ তখনও সাহস পাই না যে লালীকে স্মরণ করিয়ে দিই মুক্তকেশীর মন্দিরতলার সেই বিস্ময়কর মুহূর্তটিকে।

লালীর চেহারায় রুক্ষতাময় লাবণ্য ছিল। যত বয়স বাড়ছিল, তত তার লাবণ্যকে ক্ষইয়ে দিচ্ছিল সেই উগ্র রুক্ষতা। তাই কি তার বিয়ে হচ্ছিল না? বুঝি না। পাড়াগাঁয়ে জন্মদিন পালনের ব্যাপারটা মোটেও ছিল না। আসলে আমাদের গ্রামের একটি প্রান্ত ঘেঁষে হাইওয়ে এবং বিদ্যুৎ আসার পর এই ব্যাপারটা শহর থেকে আরও সব আধুনিক পণ্যের সঙ্গে চলে আসে। শুনেছিলাম লালীর জন্ম-দিনে অনেক সরকারি কর্তাব্যক্তি সস্ত্রীক আসবেন। আসবে লালীর কলেজের মেয়ে ও পুরুষ বন্ধুরা। আর তার আগের দিন সন্ধ্যায় লালী এসে আমাকে নেমন্তন্ন করে যায়। বাড়িতে আমি একা ছিলাম। মা গিয়েছিলেন তাঁর অসুস্থ দাদাকে দেখতে। সেই সন্ধ্যায় লালীকে জনহীন বাড়িতে একা পেয়ে আমি কি কিছু করতে পারতাম! অসম্ভব। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, লালীর রুক্ষ চেহারায় ঠিকরে পড়ছিল কী এক দুর্দান্ত চঞ্চলতা, যার সামনে হয়তো পৃথিবীর সেরা সাহসী যুবকেরাও নেতিয়ে যেত ভিজে বেড়ালের মতো।

সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি লালীর জন্মদিনে কী উপহার দেব ভেবে। ভোরের দিকে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে যেই মনে পড়েছিল আজ লালীর জন্মদিন, অমনি মনে হয়েছিল, আরে তাই তো!

ফুলের চেয়ে সুন্দর উপহার আর কী থাকতে পারে তার জন্য, যে আমার সঙ্গে প্রথম কৈশোরে 'ভাব' করতে চেয়েছিল?

কিন্তু রজনীগন্ধার ঝাড়ের ভেতর ওই চিত্রিত সুন্দর বিভীষিকা আমাকে ও লালীকে নিমেষে দুদিকে বিশাল দূরত্বে সরিয়ে দেয়। আমি লালীর জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেতে যাইনি। লালীও কৈফিয়ত চাইতে আসেনি। আর বাবার আত্মহত্যার পর মা কে জানে কেন প্রকৃতির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত উল্টোদিকে সরে এসেছিলেন। বাগানটি সত্যিই জঙ্গল হয়ে উঠেছিল। মা ফিরে এলে তাঁকে সাপের কথা বলায় গম্ভীর মুখে এবং আস্তে বলেন, এ বাড়িতে একটা বাস্তুসাপ আছে।...

সাপটিকে দ্বিতীয়বার দেখি, নালার ধারে জরাজীর্ণ পাঁচিলের কাছে। আর একটু হলেই তার ওপর পা ফেলতাম। পা ফেলতে গিয়ে কেন জানি না কোথায় পা ফেলছি দেখতে গিয়েই তাকে আবিষ্কার করি। পাঁচিল থেকে ভেঙে পড়া ছোট্ট ইটের স্তূপে কিছু বুনো কচুর ঝোপ গজিয়েছিল। সাপটি তার ওপর খুব আস্তে ওঠার চেষ্টা করছিল। সেবারও আমি নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে পড়ি এবং সাপটিকে ইটের স্তূপের ভেতর ঢুকে যেতে দেখি। মা মৃত্যুর আগে বহুবার বলে গিয়েছিলেন, বাস্তুসাপ মারতে নেই। বাস্তুসাপ কখনও বাড়ির লোককে দংশায় না।

তারপর কোনো কোনো রাতে সাপটিকে আমি স্বপ্নে দেখতে পেতাম। তার চিত্রবিচিত্র শরীর, জ্বলজ্বল নীল দুটি চোখ, চেরা লকলকে জিভ অবিকল দেখতে পেতাম। আমি তাকে পার হবার জন্য পাখির মতো উড়ে যেতাম। একরাতে দেখলাম, তাকে পেরিয়ে উড়ে যেতে যেতে যেখানেই নামবার চেষ্টা করি, সেখানেই মাটির ওপর তাকে দেখতে পাই। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠি। ঘুম ভেঙে যায়। গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ এবং আলো জ্বেলে কুঁজোর দিকে পা বাড়াতে সাহস পাই না। তন্নতন্ন খুঁজি, সাপটা কোথাও আছে কি না। কোনো-কোনো রাতে হঠাৎ মনে হয়, সাপটা আমার পাশে এসে শুয়েছে। কোনো রাতে সবে তন্দ্রার ঘোর এসেছে, মনে হয় সাপটি আমার বুকে কুণ্ডলী-পাকিয়ে বসে ফণা তুলে উজ্জ্বল

নীল চোখে আমাকে দেখছে।

সাপটির কথা লালীকে বলব ভেবেছিলাম। কিন্তু বলতে পারিনি তার বিদ্রূপের ভয়ে। লালী ছিল বড্ড ঠোঁটকাটা মেয়ে। এমনিতে সে সবাইকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলত। তার বাঁকা হাসিটি ছিল ব্লেডের চেয়ে ধারালো। প্রতিবেশীরা বলত, অমন পুরুষালি ঢঙ আর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা—কে বিয়ে করবে অমন মেয়েকে? দয়ালসিঙ্গি সোনা দিয়ে মুড়েও গছাতে পারবে না কাউকে।

একদিন সকালে হাসিমুখে দয়াময় এলেন আমার কাছে।… বীরু, কী করছ-টরছ বলো শুনি?

তাঁকে খাতির দেখিয়ে বসিয়ে বললাম, কিছু না জ্যাঠামশাই।

কিছু না? অবাক হবার ভঙ্গি করলেন দয়াময়। তাহলে চলছে কী করে তোমার?

কয়েকটা টিউশনি করছি। ওতেই চলে যাচ্ছে।

শুনে একটু গুম হয়ে থাকার পর দয়াময় বললেন, তুমি আমাদের স্কুলে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারো। একজন সায়েন্স টিচার দরকার।

কিন্তু আমি তো আর্টস গ্র্যাজুয়েট।

তাতে কী? দয়াময় একটু হাসলেন। সে আমি দেখব'খন। তুমি আজই অ্যাপ্লিকেশন লিখে হেডমাস্টারমশাইকে দিয়ে এস।…

দয়াময়ের কথামতো দরখাস্ত দিয়ে এলাম। হেডমাস্টারমশাই কেমন মুখ করে দরখাস্তটা হাতে নিয়ে শুধু বললেন, ঠিক আছে।

দিনকতক পরে দুপুরবেলায় হন্তদন্ত হয়ে লালী এল। তার চেহারায় খুনীর আদল। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সে বলল, বীরু, তোকে একটা কথা বলতে এলাম।

হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, কী রে?

লালী ক্রুদ্ধস্বরে বলল, তোর বড্ড বাড় হয়েছে। তোকে আমি ভাল ছেলে বলে জানতাম। তোর পেটে-পেটে এত—

হঠাৎ সে থেমে গিয়ে রাক্ষসীর মতো কটমটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ভয়পাওয়া গলায় বললাম, কী ব্যাপার খুলে বল্ না লালী। আমি তো কিছু জানি না।

জানো না! নেকু! লালী ভেংচি কাটল। তোর সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি।

লালী, কী হয়েছে?

লালী হিসহিস করে বলল, এলালী তোর জন্য জন্মায়নি জেনে রাখিস। ইশ! আমি যেন গাছের ফলটি—হাত বাড়িয়ে টুপ করে পেড়ে নিবি।

বলেই সে তেমনি জোরে বেরিয়ে গেল। আমি ভ্যাবলা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। পরে মনে হল, ব্যাপারটা যেন আঁচ করতে পারছি। দয়াময় কি তাহলে লালীর সঙ্গে আমার—

বাস্তুসাপটাকে আমি তৃতীয়বার দেখি বন্যার বছর এবং সেবারই সাপটির সঙ্গে আমার একটি নিগূঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সেবারকার মতো ভয়ঙ্কর বন্যা কখনও আমরা দেখিনি। তিনদিন তিনরাত একটানা বৃষ্টিতে আমাদের বাগানের পেছনের খালটি এমনিতেই কানায়-কানায় উপচে পড়ছিল। চতুর্থ রাতে ডুমডুম ঢোলের বাজনায় আর কোলাহলে আমার ঘুম ভেঙে যায়। সুইচ টিপে দেখি আলো জ্বলল না। বাইরে এরাতে ঝোড়ো হাওয়ার শনশন শব্দের সঙ্গে বৃষ্টির শব্দ মিশে একটি প্রাকৃতিক অস্থিরতার শব্দচিত্র আঁকা হচ্ছিল। আর তার সঙ্গে অন্ধকারের রঙ, বজ্রবিদ্যুতের রঙ, মানুষের আর্তি, ঢোলের ঘোষণার সঙ্গে পঞ্চায়েতি খবর জড়িয়ে-মড়িয়ে শব্দ-বর্ণময় দুর্বোধ্য একটি চিত্রকলা—যা মানুষ ও প্রকৃতি যথেচ্ছভাবে এঁকে যাচ্ছিল, যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি কী করব বুঝতে পারছিলাম না।

কিছু পরে বিদ্যুতের আলোয় কয়েকটি পলকের জন্য উঠোনের জল দেখতে পাই। তখনই আমার টর্চের কথা মনে পড়ে। ঘরে ঢুকে বালিশের পাশ থেকে টর্চটি তুলে নিই। বারান্দায় বেরিয়ে টর্চটি জ্বালি এবং আমার পা থেকে কয়েকহাত দূরে সেই চিত্রিত সুন্দর বিভীষিকাকে আবিষ্কার করি।

আলোর মধ্যে ধরা পড়ে সাপটির আঁকাবাঁকা ছন্দময় গতি রুদ্ধ হয়। দ্রুত সে মাথা তোলে। তার ফণা দুলতে থাকে। চেরা লকলকে জিভ আর দুটি নীল উজ্জ্বল চোখ দিয়ে আলোর

আড়ালে সম্ভবত আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করছিল।

এবার তার সঙ্গে আমার এক বিপজ্জনক লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে। টর্চ নিভিয়ে ফেলি। আবার জ্বালি। মধ্যেকার কয়েকটি সেকেন্ড সে ফণা গুটিয়ে আবার এঁকেবেঁকে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু যেই টর্চ জ্বালি, সে হিসহিস শব্দ করে ফণা তোলে ও থমকে যায়।

কতক্ষণ এই খেলা চলছিল বলা কঠিন, শেষবার টর্চের ক্ষয়াটে আলোয় তাকে বারান্দার কোনায় জমিয়ে রাখা আসবাবপত্রের ভেতর ঢুকে যেতে দেখেছিলাম। যে ঘরটাতে আমি শুই, তার দরজা থেকে দূরত্বটা ছিল হাত দশেকের মতো। কাজেই ঘরে গিয়ে দরজা এঁটে এবং সাপটার এঘরে ঢোকার মতো ফাঁক বা ফাটল আছে কি না সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে যখন আমি শুয়ে পড়লাম, তখন আমার শরীর পাথরের চেয়ে ভারি আর নির্জীব। আমার স্নায়ুকোষগুলি নিষ্ক্রিয়। নেপথ্যের প্রাকৃতিক ও মানবিক যাবতীয় শব্দচিত্র নিতান্তই প্রাতিভাসিক হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারছিলাম না আমি কোথায় আছি, কিংবা জীবিত না মৃত, নাকি এতদিনকার দেখা ঘুমের অন্তবর্তী সমস্ত স্বপ্ন একত্রিত হয়ে আমাকে অবচেতনায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতিভাসময় প্রায় জড় আমার অস্তিত্বের ভেতর সারাক্ষণ ফণা তুলে হিসহিস করছিল ওই সুন্দর বিভীষিকা—তার কুণ্ডলীপাকানো শরীর আমার বুকের ভেতরটা ঠান্ডা হিম করে দিচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল, প্রকৃতির গভীর এক সন্ধিস্থলে, যেখানে জড় ও প্রাণের সীমান্তরেখা, সেই জীবন্মৃত্যুময় রেখাটির ওপর আমি শুয়ে আছি।

শেষরাতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে কেউ ডাকছিল। তিনি দয়াময়। দরজা খুলতেই একরাশ জল ঢুকে পড়ল ঘরে। পায়ে সাড়া ছিল না বলেই দরজার নিচের সূক্ষ্ম ফাটল দিয়ে চুইয়ে পড়া জলে ঘরের মেঝের সিক্ততা টের পাইনি, অথবা স্বপ্নাচ্ছন্নতাই এর কারণ। দয়াময়ের হাতে টর্চ ছিল। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কী বীরু? পৃথিবী ভেসে গেলেও চিরদিন তোমার হাঁটু জল।

দয়াময় আমাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন। আমি তাঁকে সাপের কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু উনি কান করলেন না। আমার

হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নামালেন। উঠোনের জল দুজনেরই কোমর পর্যন্ত জড়িয়ে ধরল। নীলধূসর আলোয় একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছু নিষ্প্রভ নক্ষত্র দেখতে পেলাম। বাতাস বন্ধ। চারদিকে শুধু জলের শব্দ। মাঝেমাঝে মানুষজনের চিৎকার। দয়াময় যখন আমাকে তাঁর দোতলায় পেঁছে দিলেন, তখন প্রথমেই আমি লালাকে খুঁজলাম। কিন্তু তাকে দেখতে পেলাম না। দয়াময় আমাকে একটা লুঙ্গি পরতে দিলেন। আবার আমি সাপের কথাটা বলতে গেলাম। অমনি দয়াময় চাপা স্বরে রুষ্টভাবে বললেন, সাপ তোমার মাথার ভেতর।

আলো আরও স্পষ্ট হলে দয়াময়ের গেটের কাছে রিলিফের নৌকো এল। দয়াময় তখন রিলিফের কাজে বেরিয়ে গেলেন।…

সাপটির সঙ্গে আমার চতুর্থবার দেখা হয় বন্যার জল গ্রাম থেকে নেমে যাওয়ার ক'দিন পরে। বারান্দার কোনায় রাখা আসবাবপত্র ফেলে দেবার জন্য যে লোকটিকে ডেকে এনেছিলাম, তার নাম ছিল শুকুর। সে ছিল নিতান্তই এক ক্ষেতমজুর। কিন্তু সাপ মারতে তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ। গ্রামের বহু সাপ সে মেরেছিল। আমাদের এলাকায় দু'চারজন ওঝা ছিল বটে, কিন্তু সাপধরা বেদে ছিল না। তাই কোথাও বিষাক্ত সাপ দেখতে পেলে শুকুরকে ডাকা হত। শুকুর বারান্দার কোনা থেকে সব বাতিল জিনিস সরিয়ে ফেলে রায় দিয়েছিল, সাপটা চলে গেছে। আর ঠিক সেদিনই বাগানে আগাছার ঝোপের ভেতর হঠাৎ সাপটিকে আমি দেখতে পাই।

বাগানের ঘাসেভরা মাটিটা তখনও ভেজা ছিল। আকাশে ছিল গনগনে সূর্য। ঝলমল করছিল গাছপালা। আসলে আমি সাপটিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আগাছার তলায় স্যাঁতসেঁতে নগ্ন মাটিতে তার চিত্রিত সুন্দর শরীর একেবারে নিস্পন্দ। তার গলার নিচেটা স্ফীত দেখে বুঝলাম সে কিছু গিলেছে, তাই এমন চুপচাপ আর ক্লান্ত।

খুব দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। সাপটিকে মেরে ফেলা এখন হয়তো খুবই সহজ। ছায়ার ভেতর ভিজে মাটিতে ছত্রাক আর

খড়কুটোর পাশে সামান্য বাঁকাচোরা তার শরীর প্রাকৃতিক লাবণ্যে ও কোমলতায় বড় উজ্জ্বল। তাকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ওর ওই সৌন্দর্যের মধ্যে মৃত্যুর বিভীষিকাও ওতপ্রোত। প্রতি সেকেন্ডে বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছে স্ফীত হতে হতে আমাকে স্বয়ং জীবন এসে ভুতের মতো পেয়ে বসল। আমি জীবনচেতনায় অস্থির হয়ে দৌড়ে একটা লাঠি আনতে গেলাম।

আর সেই সময় ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে লালীকে আসতে দেখলাম। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। লালী সোজা বারান্দায় উঠল এবং আমার ঘরে ঢুকে গেল।

ঘরে গিয়ে দেখি, সে আমার বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসেছে। খাটের একটা বাজু আঁকড়ে ধরে সে মুখ নামিয়ে আছে। খোঁপা ভেঙে তার চুল উপচে পড়ছে একদিকে। তার পিঠটা কাঁপছে। আমি আস্তে বললাম, কী হয়েছে রে?

লালীকে সেই প্রথম আমি কাঁদতে এবং ভেঙে পড়তে দেখলাম। কিছুক্ষণ পরে সে সোজা হয়ে বসল। চুলগুলো খোঁপা করে বেঁধে নিল। ভিজে চোখ মুছে ফেলল। তখন আবার জিগ্যেস করলাম, লালী, কী হয়েছে?

লালী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, আমার একটা কথা রাখবি বীরু?

কী কথা রে?

লালী আমার চোখে চোখ রেখে বলল, আগে আমার গা ছুঁয়ে বল, রাখবি।

কিন্তু কথাটা কী, আগে বলবি তো?

লালীর ভিজে চোখ জ্বলে উঠল। বীরু, তাহলে আমার মরা মুখ দেখবি!

খুব হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, তুই মরবি কেন?

লালী শক্ত মুখে বলল, মরব। আর মরার আগে লিখে রেখে যাব আমার মরার জন্য তুই দায়ী।

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, কেউ বিশ্বাস করবে না।

লালী উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, এবার যদি আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করি?

এবং একথা বলেই সে ঝটপট শাড়ি খোলার ভঙ্গি করল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম সে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। ঝটপট বলে ফেললাম, ঠিক আছে। কথা রাখব। বল কী কথা ?

লালী নিষ্ঠুর নিঃশব্দ হেসে বলল, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। তারপর সে কয়েক পা এগিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল, আমার গা ছুঁয়ে বল।

ওর কাঁধ ছুঁয়ে বললাম, ঠিক আছে। বল।

লালী ষড়যন্ত্রসংকুল কণ্ঠস্বরে বলল, তুই এখনই বাবাকে গিয়ে বল—স্ট্রেটকাট বল গিয়ে, আমাকে বিয়ে করবি।

ভীষণ অবাক হয়ে বললাম, লালী ! সেবার তুই নিজে এসে—

আমার কথা কেড়ে লালী বলল, তুই একটা ইডিয়েট বীরু ! সত্যি সত্যি তো তুই বিয়ে করছিস না। শুধু—মুখে গিয়ে কথাটা বল।

কিন্তু ব্যাপারটা খুলে বলবি তো ?

লালী শান্তভাবে আবার বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসল। তারপর পা দোলাতে দোলাতে বলল, বাবা একটা লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিচ্ছে। সে কে জানিস ? স্কুলে যে নতুন একজন টিচার জুটিয়েছে—ভূতের মতো দেখতে। আচ্ছা, তুই বল তো বীরু, আমি কি দেখতে খারাপ ?

কক্ষনো না। সায় দিয়ে বললাম। তুই সত্যি সুন্দর। তোর কেন যে বিয়ে হচ্ছে না !

লালী একটু হাসল। হচ্ছে না নয়। আমি নিজেই বাগড়া দিই জানিস ?

বলিস কী !

হুঁ। দেখেশুনে পছন্দ করে যায়। তারপর আমি বেনামে চিঠি লিখে জানিয়ে দিই, মেয়ের চরিত্র খারাপ। কতজনের সঙ্গে প্রেম-ট্রেম করে নষ্ট হয়েছে। একটা চিঠিতে তোর নামও করেছিলাম।

লালী চাপা হাসিতে অস্থির হল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে অসম্বৃত শাড়ির আড়ালে ওর মেয়েশরীরের কথা ভেবে আমার শরীরে যৌবনের দুর্দান্ত লোভ গরগর করে উঠল। আর

দরজাবন্ধ ঘর। জানালার একটা পাশ খোলা। আবছা আলো এবং নির্জনতা। হঠাৎ আমি দুঃসাহসে বলে উঠলাম, তোর 'কথা আমি রাখছি। কিন্তু—

লালী ভুরু কুঁচকে তাকাল, বলল, কিন্তু কী রে?

লালী! ছোটবেলায় মুক্তকেশীর মন্দিরতলায় তুই বলেছিলি আমার সঙ্গে ভাব করবি।

হুঁ, বলেছিলাম।

লালীর কণ্ঠস্বরে নির্লিপ্ততা ছিল। আমার শরীর কাঁপছিল। উরু ভারি হয়ে উঠেছিল। নিজের ঘামের বিকট গন্ধ টের পাচ্ছিলাম। তারপরই হঠকারিতায় ওকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম।

লালী আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একই কণ্ঠস্বরে বলল, পাবি। আগে কথাটা বলে আয় বাবাকে। আমি এখানেই থাকছি। বাবা বাড়িতে আছে। গিয়ে স্ট্রেটকাট বলবি।

আমি বেরিয়ে গেলাম। ভারি শরীর টানতে-টানতে দয়াময়ের দোতলা বাড়ির গেটে পেঁছুলাম। আর তখনই মনে পড়ল সাপটার কথা। বিস্ময়কর ও ভিন্ন এক হঠকারিতা লালীর শরীরের চেয়ে সাপটির শরীরকে আমার চোখের পর্দায় সেঁটে দিল। দয়াময় সামনের দিকে দোতলার ব্যালকনিতে বসে বন্দুকের নল সাফ করছিলেন। বন্দুক দেখামাত্র জোরে চেঁচিয়ে ডাকলাম ওঁকে, জ্যাঠামশাই! সেই সাপটা বেরিয়েছে।

দয়াময় উঠে দাঁড়ালেন। ব্যস্তভাবে বললেন, চলো! যাচ্ছি।…

সাপটি সেদিনও অদৃশ্য হয়ে যায়। হাট করে খোলা আমার ঘরের দরজায় উঁকি মেরে লালীকেও অদৃশ্য দেখতে পাই। আর ঠিক যে ভঙ্গিতে দয়াময় সাপটির গতিরেখা তন্নতন্ন খুঁজছিলেন, আমিও একই ভঙ্গিতে আমার বিছানায় এবং মেঝেতে লালীর গতি-রেখা অন্বেষণ করেছিলাম। শুধু এটুকুই তফাৎ যে, দয়াময় সাপ-টির গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করেননি কিংবা করলেও পেতেন কি না সন্দেহ—আমি ঘরভরা লালীর গন্ধে কিছুক্ষণ আবিষ্ট ছিলাম। আর লালীর শরীরের গন্ধের সঙ্গে আমার শরীরের গন্ধও মিশে ছিল। ক্রমশ সেই মিশ্রিত গন্ধ উবে গেলে প্রচণ্ড উত্তেজনার পর

ঠাণ্ডা, হিম এক অবসাদ এসে আমাকে ছুঁল। আমি ভিজে পুতুলের মতো নেতিয়ে গেলাম।

সারাদুপুর বিছানায় শুয়ে সেদিন যতবার লালীর কথা ভাবতে যাই, ঝলমলে রোদে চেকনাই সবুজ আগাছার ঝাড়ের তলায় রহস্যময় ছায়ার পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত সুন্দর বিভীষিকাটি অবচেতনা থেকে হিসহিস শব্দে সাড়া দেয়। তার চেরা জিভ, নীল দুটি চোখ আমার চোখে প্রতিবিম্বিত হয়। প্রকৃতির নিজের হাতে আঁকা আলপনা দিয়ে সাজানো তার ফণাটি দুলতে থাকে। তাকে বলতে ইচ্ছে, তুমি এত সুন্দর! অথচ আমার মুখে কথা সরে না। আশ্চর্য নির্লিপ্ততায় তার দিকে তাকিয়ে থাকি। আমি তো জানি, তার সঙ্গে আমার একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমি তাকে মনে মনে আশ্বাস দিই, আর কোনদিন দয়াময় বা শুকুর সেখকে ডাকব না। তুমি বেঁচে থাকো। আমিও বেঁচে থাকি।

পঞ্চম ও শেষবার সাপটির সঙ্গে আমার দেখা হল এক বিকেল-বেলায়। সেদিন আকাশ ছিল নির্মেঘ। ফিকে লাল-হলুদ আলোয় নিসর্গকে দেখাচ্ছিল কনে-বউয়ের মতো সলজ্জ আর কোমল। বাগানের কোনায় কেয়াঝাড়ের গোড়ার খাঁজের ভেতর থেকে সে সবে মাটিতে নেমে আসছিল, সহজাত প্রবৃত্তিবশে আমি এক পা পিছিয়ে আসতেই সে ফণা তুলল। মাটিতে আমার পায়ের শব্দের স্পন্দন সে টের পেয়েছিল। কিন্তু আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেলে সে ফণা গুটিয়ে নিল। তারপর চলতে শুরু করল। ঘন ঘাসের ভেতর সে গা ঢাকা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে দয়াময়ের ডাক শুনতে পেলাম। দেখলাম উনি বাড়ির ভাঙা গেটের নিচে বাঁশের আগড় ঠেলে ভেতরে ঢুকছেন। বললেন, ওখানে কী করছ?

কিছু না। এমনি দাঁড়িয়ে আছি।

দয়াময় একটু হাসলেন। সাপ দেখছ নাকি? তোমার মাথায় আসলে—তো শোনো। সামনে রোববার লালীর বিয়ে। এই নাও—

দয়াময় আমার হাতে একটা সুন্দর খাম এগিয়ে দিলেন। তাতে প্রজাপতির ছবি আঁকা। কোনায় একটু হলুদ ছোপ। বললেন,

আসবে যেন। না—না, নেমন্তন্ন খেতে নয়, সব দেখাশনো করবে-টরবে। বলতে গেলে তুমি একরকম বাড়িরই ছেলে।

আমি চুপ করে থাকলাম। দয়াময় কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন। তাঁর ভুরু কুঞ্চিত। দৃষ্টি মাটির দিকে রেখে একটু কাসলেন। তারপর ধরা গলায় এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, ভবিতব্যের ওপর মানুষের হাত নেই। তোমার মায়ের বড় ইচ্ছে ছিল—আমারও। তো তুমি বেঁকে বসলে। আমি তো তোমাকে বাধ্য করতে পারি না—

বলেই মুখ তুললেন। চোখে চোখ পড়ামাত্র আমি আস্তে বললাম, জ্যাঠামশাই! আমি জানি লালীর এ বিয়েতে মত নেই।

দয়াময়ের মুখটা তখনই বদলে গেল। যেন আমার কথা বোঝেননি এমন ভঙ্গিতে বললেন, কোন বিয়েতে?

এই বিয়েতে।

দয়াময় নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বরে বললেন, দয়াসিঙ্গি যার জন্ম দিয়েছে, তার মতামত নিয়ে মাথা ঘামায় না।

একটা আবেগ—হয়তো প্রতিবাদেরই আবেগ, কিংবা হয়তো লালীকে বাঁচানোর জন্য একটা জোরালো তাগিদ আমাকে সাহসী করে দিল। বললাম, লালী শিক্ষিতা মেয়ে। তার মতামতের একটা মূল্য দেওয়া উচিত নয় কি জ্যাঠামশাই? যাকে সে পছন্দ করে না, তার সঙ্গে সে কী ভাবে ঘর করবে, ভেবে দেখা উচিত নয় কি?

দয়াময় চাপা গর্জন করে বললেন, হুম! তুমি যে এত লম্বা-চওড়া কথাবার্তা আওড়াচ্ছ, তার বেসিস কী? লালী তোমাকে বলেছে বুঝি?

মুখ নামিয়ে বললাম, হুঁ।

দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর দয়াময় বললেন, আমি যেমন জানতাম, তোমার মাও তেমনি জানতেন, লালীর সঙ্গে তোমার একটা সম্পর্ক ছিল। ঠিক এজন্যই আমি কথাটা তুলেছিলাম। কিন্তু তুমি—ইউ কাওয়ার্ড! আমার মেয়ের সর্বনাশ করে ছাড়লে! তারপর তুমি—

প্রায় আর্তনাদ করে বললাম, জ্যাঠামশাই! বিশ্বাস করুন,

আমি লালীর কোনও সর্বনাশ করিনি !

দয়াময় দ্রুত ঘুরে গেটের দিকে পা বাড়ালেন। কয়েকপা এগিয়ে পিছু ফিরলেন এবং আমার কাছে ফিরে এলেন। ভাঙা গলায় বললেন, তোমার একটা চাকরিবাকরি না জোটা পর্যন্ত কথাটা বলব না ভেবেছিলাম। তা ছাড়া আমার ইচ্ছে ছিল, লালীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে কথাটা বলার দরকারও হবে না। কিন্তু এখন মনে হল, বলার সময় হয়ে গেছে।

একটু অবাক হয়ে বললাম, কী কথা জ্যাঠামশাই ?

দয়াময় নির্দয়মুখে বললেন, তোমার পড়াশুনো আর সংসার খরচের জন্য তোমার মা এই বাস্তুজমি পুরোটাই আমার কাছে একরার-নামা ডিড করে দিয়ে গেছেন। পাঁচবছরে সুদসমেত টাকা ফেরত না দিলে এর মালিকানা আমার ওপর বর্তাবে। ডিডের মেয়াদ দু'বছর আগে শেষ হয়েছে।

আমি মনেমনে সাপটিকে ডাকছিলাম। এখন দয়ামযের হাতে বন্দুক নেই।

দয়াময় কেসে গলা ঝেড়ে বললেন, যাই হোক—আমি অত খারাপ লোক নই। আশা করব তুমি লালীর বিয়ের দিনে সকাল-সকাল যাবে। কাজকর্ম দেখাশুনো করবে। খুব দুঃখের সঙ্গে অপ্রিয় ব্যাপারটা তোমাকে বলতে হল—তুমিই বলিয়ে ছাড়লে। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, অন্তত তোমার মায়ের মুখ চেয়ে তোমাকে আমি বাড়ি থেকে উৎখাত করব না—অন্তত যতদিন তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারছ।

শেষ কথা বলে দয়াময় শান্তভাবে চলে গেলেন। গেটের বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরী আগড়টাও ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন।···

বছরতিনেক পরে একদিন সদর শহরের রাস্তায় মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় লালীর সঙ্গে। আমিই তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। আসলে আমি আকাশ-বাতাস আর সারা শহরটাকে প্রতিধ্বনিত করার মতো প্রচণ্ড জোরালো একটি চিৎকার তুলতে চেয়েছিলাম, লালী, তুমি মরোনি ? লালী, তুমি বলেছিলে 'মরামুখ দেখবে' !

লালীর কোলে একটা বাচ্চা ছিল। তার পাশে পাশে হেঁটে আসছিলেন রোগাটে গড়নের শ্যামবর্ণ এক ভদ্রলোক, পরনে ধুতি ও মটকার পাঞ্জাবি এবং তাঁর ঠোঁট খুবেই পুরু এবং তাঁর সামনের দাঁতের পাটি ঠেলে বেরুনো। অথচ ওই মুখে গাঢ় অমায়িক ও আলাপী ভাব ছিল।

লালীর আমাকে চিনতে সেকেন্ড দু-তিন দেরি হয়েছিল। চেনামাত্র সে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, বীরুদা, তুমি! দাড়ি রেখেছ কেন? সে খুব ব্যস্তভাবে তার সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। ...সেই বীরুদা গো—যার কথা তোমাকে প্রায়ই বলি!

আমরা দুটি ভদ্রলোক নমস্কার বিনিময় করি। বাচ্চাটির গাল টিপে আমি আদর করতে গেলে লালী তাকে আমার কোলে পোঁছে দিতে চেষ্টা করে।...তোমার মামা! বীরু মামা! কিন্তু বাচ্চাটি মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আর লালী খিলখিল করে হাসে।...বড্ড লাজুক—একেবারে বাবার স্বভাবটি পেয়েছে।

তারপর লালী অনর্গল কথা বলে। গ্রামের খবরাখবর দিতে থাকে। শেষে বলে, একদিনের জন্যও তো যেতে পারো বীরুদা। আর শোনো, তোমাদের বাড়িটা এখন পুরোটাই ফুলের বাগান! ও নিজের হাতে সব করেছে-টরেছে। দেখলে ভাববে কোথায় এলাম—চোখ জুড়লে যাবে তোমার—সত্যি!

ভাবলাম, ওকে সাপটার কথা বলি। আমার জানার ইচ্ছে হচ্ছিল, সাপটাকে ওরা দেখতে পায় কি না। কিন্তু সেই সময় লালীর স্বামী ভদ্রলোক, সেই স্কুলশিক্ষক চলমান একটা সাইকেল রিকশোকে 'রোখো', 'রোখো' বলে দাঁড় করান এবং লালীসহ ওতে উঠে বসেন। আমি দাঁড়িয়ে থাকি।' রিকশোটা গড়িয়ে চলার সময় লালী হাসিমুখে ঘুরে বলে যায়, একদিন যাবে যেন বীরুদা!

আর সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পাই, লালীর মুখের সেই পুরুষালি রুক্ষতা তো দেখলাম না! আমি দেখলাম সুন্দরী নারীর প্রসাধিত লাবণ্য আর কোমলতা। চিত্রিত সুন্দর বিভীষিকা—যাকে অন্তত বার পাঁচেক আমি নিসর্গের গাঢ় ছায়ায় আবিষ্কার করেছিলাম, এতদিনে কি তার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল? জানি না। আমি সত্যিই জানি না।...

দক্ষিণের জানালা এবং কাটা মুণ্ডুর গল্প

কাল রাতে বছরের প্রথম কালবোশেখি হানা দিয়েছিল। কৃপাসিন্ধু গিয়েছিল বেণীপুরে একটা বিবাদ মেটাতে। ফেরার পথে হঠাৎ ঝড়। ঝড়ের মধ্যে মোটর সাইকেল চালিয়ে আসার জেদ ও ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য ঢুকতে হয়েছিল দুনিগ্রামের বাউরি পাড়ায়। একে তো ওই প্রাকৃতিক হুলুস্থুল, তার মধ্যে দোগাছিয়ার খেপুবাবুর আবির্ভাব। ঘনা, মনা, ভ্যাঁটা, ঘোঁতন এইসব নামের গতরজীবী মানুষগুলোর তাড়ির নেশা কেটে খেপুবাবুকে কোথায় জায়গা দেয়, সে নিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ডাকাডাকি, লণ্ঠন জ্বালা, ডাকাত পড়ার ব্যাপার। শেষে কৃপাসিন্ধু ঘনার দাওয়ায় জায়গা পায়। মোটর সাইকেলটা দাওয়ার নিচে ভিজতে থাকে এবং বিদ্যুতের ঝিলিকে মুহুর্মুহু ঝিকমিকিয়ে ওঠে। তখন ঘনা বুদ্ধি করে একটা চট চাপিয়ে দেয়। ঘনার বাড়ির মেয়েরা ঘুমঘুম চোখে তাকিয়ে অবিশ্বাস্য খেপুবাবুকে দেখছিল।

মাঝরাত নাগাদ ঝড়টা থেমে যায়। টিপটিপিয়েতারপরও কিছুক্ষণ বৃষ্টি ঝরে। বৃষ্টি থামলে আধখানা চাঁদ ঝলমলিয়ে ওঠে। কৃপাসিন্ধুর মোটর সাইকেলের চাকা স্লিপ করছিল। পিচের চাঙড় ছেড়ে জায়গায়-জায়গায় গর্ত। অব্দুল কন্ট্রাক্টর এই পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা বানিয়ে দোতলা বাড়ি তুলেছে। কৃপাসিন্ধু বাকি রাস্তা আব্দুলের বাড়িটা লক্ষ্য করে একটা স্টিমরোলার চালিয়ে নিয়ে আসছিল।

সকালে নিজের হাতে মোটর সাইকেলটা সাফ করছিল কৃপাসিন্ধু। টিউবেল থেকে বালতি করে জল এনে ঢালছিল। কাঠি দিয়ে মাডগার্ড খোঁচাচ্ছিল। বারান্দা থেকে বড়দি রেবা বকাবকি করছিলেন, এভাবে কেন তুই রিস্ক নিস বল তো খেপু ? তোর অত শত্রু শুনি। কার কী মনে থাকে।

রেবা শহরের বধূ। ভাইয়ের বাড়ি এসেছেন বেড়াতে।

বাবা-মা বেঁচে নেই। থাকলে কৃপাসিন্ধুর এত গোঁয়ার্তুমি সাজত না বলে তাঁর ধারণা। বলছিলেন, ঘরের খেয়ে বনের মোষ ডাকানোর কী মানে হয়, তুই আমাকে বল খেপু! আর এখন পরিবেশ যা হয়েছে শুনতে পাই, তোর জন্য সবসময় অস্থির থাকি। রোজ নাকি খুনোখুনি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা। তোকে কবে থেকে বলছি, জমিজমা সব বেচে চলে আয় আমার ওখানে। বিজনেস কর।

থামের কাছে দাঁড়িয়ে কান করে শুনছিলেন পিসিমা চারুবালা। সুযোগ পেয়ে বললেন, আমিও তো একই কথা পইপই করে বলি। ও মাসে সাত বিঘে জমির ধান দিনদুপুরে জোর করে তুলে নিয়ে গেল। কী হল শেষ পর্যন্ত? মগের মুল্লুক পড়েছে আজকাল।

রেবা বাঁকা হেসে বললেন, হ্যাঁ রে, তুই নাকি বড় লিডার হয়েছিস! পারিসনি ধানগুলো উদ্ধার করতে? তবে তুই কিসের লিডার খেপু?

কাজ শেষ করে মোটর সাইকেলটার দিকে তাকিয়ে ছিল কৃপাসিন্ধু। আজ সকালে পৃথিবীর ঝলমলানির সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গেছে তার বাহনটা। রোদে ঝকমক করছে দুর্ধর্ষ গোঁয়ার যৌবন।

বড়দির সামনে এখনও ভদ্রতা করে সিগারেট খায় না কৃপাসিন্ধু। হাল্কা পায়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঁচু বারান্দায় উঠল সে। তারপর ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল।

দক্ষিণের জানালার পর্দা সরিয়ে উঁকি মেরে আছে তার স্ত্রী রত্না আর ছোট বোন ছায়া। কৃপাসিন্ধুর পায়ের শব্দে রত্না একবার ঘুরল। কিন্তু কিছু বলল না। যা দেখছিল, আবার দেখতে থাকল। কৃপাসিন্ধু সিগারেট ধরিয়ে বলল, কী?

ছায়া আস্তে বলল, ওখানে কী যেন হয়েছে দাদা! একগাদা লোক ভিড় করে কী দেখছে?

কোথায় রে?

বুড়োতলার নালার ধারে।

ছেড়ে দে। বলেও কৃপাসিন্ধু ওদের মাঝখান দিয়ে একবার দেখতে গেল।

এই জানালা থেকে বুড়োতলার নালা পরিষ্কার দেখা যায়। কয়েক টুকরো সবজি ক্ষেতের পর আগাছাভরা খানিকটা পোড়ো জমির কোনায় ফণিমনসার ঝোপের ভেতর বুড়োবাবার থান। তার পেছনে গভীর ওই নালাটা আসলে গ্রামের জলনিকাশী খাল। তার আঁকাবাঁকা গতি নিচু মাঠ পেরিয়ে নদী পর্যন্ত। বর্ষায় বানের জল আটকাতে ক'বছর আগে নদীর মুখে স্লুইস গেট বসানো হয়েছে। নালাটা অবরে-সবরে সেচের জলও মাঠকে যোগায়।

কৃপাসিন্ধু বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে রত্না চাপা গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

দেখে আসি।

রত্না ওর পেছন পেছন আসছিল। বলল, সবতাতেই তোমার যাওয়া চাই। মিছিমিছি—

রেবা বললেন, কী হয়েছে খেপু? অমন করে যাচ্ছিস কোথায়?

কৃপাসিন্ধু খিড়কির দরজা জোরে খুলে বেরিয়ে গেল। রত্না বলল, কোনও মানে হয়?

রেবা বললেন, হয়েছেটা কী বলবে তো?

বুড়োতলার ওখানে কী যেন হয়েছে। একগাদা লোক ভিড় করে দেখছে।

রেবা মুখ টিপে হাসলেন। বুঝেছি। এ আর নতুন কী? বরাবর যা হয়, তাই। এইজন্য তো বলি, পৃথিবীটা দেখতে দেখতে কত বদলে গেল, আর এই দোগাছিয়া যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গেল।

চারুবালা হাসতে হাসতে বললেন, তা ঠিক নয়। তুমি ছোট-বেলায় যেমন দেখেছ, তেমনটি কি আছে? আহা, আমিও তো তোমার মতো এ বাড়ির মেয়ে। বুড়োতলায় বাঘের ডাক শুনেছি, তখন তুমি কোথায়? তখন এত দালানকোঠাও ছিল না। ইলেক-ট্রিসিটি ছিল না। বাজার ছিল না। হাট বসত সপ্তায় দুটো দিন। আর এখন দেখ, দু'বেলা হাট বসছে চৌমাথায়। এদিকে সারাক্ষণ রাস্তায় ভিড়—ট্রাক, বাস, টেম্পো, রিকশো।

রেবা চোখ কটমটিয়ে বললেন, সে কথা নয়। আমি কী বলতে চাইছি, আর আপনি কী বলছেন!

দমে গিয়ে চারুবালা বললেন, বলো খুকু, শুনি।

চাপা গলায় রেবা বললেন, আজকাল তো আইন হয়েছে রে বাবা! অ্যাবর্সান যদি করাবি, টাউনে মাতৃসদনে যা। নয় তো হাজারটা নার্সিং হোম হয়েছে—পয়সা থাকলে। এখনও বুড়ো-তলার নালা? রেবা হাসতে লাগলেন!

লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে চারুবালা বললেন, ও। তাই?

বুড়োতলার নালার ধারে গ্রামের আঁতুড়ঘরের আবর্জনা ফেলার জায়গা আছে। চারদিকে কাঁটামাদার কেয়াঝোপ আর ফণিমনসার জঙ্গল। কখনও-সখনও সেখানে মৃতজাতক পুঁতে দিয়ে আসে গ্রামের ধাইমারা। কখনও-সখনও দেখা গেছে কুমারী মায়ের নাড়িছেঁড়া একটুকরো ভ্রূণও। কাঠ-কুড়ুনি মেয়েদের নজর এড়ানো কঠিন। গ্রামে রটতে দেরি হয় না। আর একদল মানুষও আছে, যারা তারিয়ে তারিয়ে নোংরা দেখতে পছন্দ করে। চলে এসে ভিড় করে দেখতে থাকে। পুরুষ হলে গোঁফের ওপর হাত, স্ত্রীলোক হলে নাকে আঁচল এবং বারবার মুখ ঘুরিয়ে থুথু ফেলার ঢঙ। তারপর কিছুদিন ধরে গোপন গোয়েন্দাগিরি। কুমারী এবং বিধবার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত। চারুবালারও এই বাতিক আছে। কিন্তু রেবা এখন বিয়ের পর থেকে দজ্জাল মেয়ে। কৃপাসিন্ধু অকুস্থলে চলে গেল কোন আক্কেলে? এক ফাঁকে চারুবালা রত্না বউমার ঘরে ঢুকে পড়লেন। তখনও ছায়া জানালায় উঁকি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। চারুবালা ভাইঝিকে ঠেলে বললেন, কই, সর তো দেখি, কী হয়েছে।...

কৃপাসিন্ধু হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল।

বুড়োতলার ওই নালা সম্পর্কে একটা বিভীষিকাময় অবচেতনা আছে দোগাছিয়ার। আজকাল আর কেউ ভূতপ্রেত মানে না। তবু ভূতের ভয়টা ওই অবচেতনাগত একটা বোধ। রাতে কখনও দক্ষিণের জানালা খুলে কৃপাসিন্ধুর মনে হয়েছে, যদি সত্যি কিছু থাকে! তখন যদি তাকে একা যেতে বলা হয় বুড়োতলার দিকে, সে বন্দুক নিয়েও পা বাড়াতে পারবে না। দিনদুপুরেও ছমছমে নির্জনতায় কেমন যেন দুর্জ্ঞেয় প্রাণীতে পরিণত হয় জায়গাটা। কাঁটামাদারের

গাছগুলো, কেয়া আর ফণিমনসার ঝোপগুলো রহস্যময় অসংখ্য চোখে যেন তাকিয়ে থাকে তার দিকে। নদীর দিক থেকে নিচু মাঠের ওপর দিয়ে হঠাৎ একটা বাতাস আসে ঘুরপাক খেতে খেতে বুড়োতলায় ঢুকেই তার হুলস্থুল যায় বেড়ে। খড়কুটো, ন্যাকড়াকানি, হলদে পাতার পোশাক পরে অশরীরীর নাচন। ফণিমনসার কাঁটায় সাপের খোলস পত পত করে ওড়ে। আসলে গ্রামের বহু জন্ম-মৃত্যু, রক্ত ও গোপন কান্নাকাটি, অতৃপ্ত বাসনা-কামনা এবং আত্মার অমরতা নিয়ে এই একটা ভূগোল।

ছেলেবেলায় কৃপাসিন্ধু বর্ষার সময় ওই নালার জলে একটা কাতলা মাছ ধরেছিল। ধরেছিল বলা ঠিক নয়, মাছটা হঠাৎ তার পায়ের কাছে লাফিয়ে পড়েছিল। বানের জল ঢুকছে নাকি দেখতে এসে এই অদ্ভুত ঘটনা। কিন্তু মাছটা খাওয়া হয়নি শেষ পর্যন্ত। ছ্যা ছ্যা, ফেলে দিয়ে আয় এক্ষুনি, এই বলে হাত নেড়ে মায়ের সে কী চিক্কুর! বুড়োতলার নালার মাছ ভদ্রলোকে খায় না। আঁতুড়ের আবর্জনাধোয়া জল। তার ওপর কত অসতীর ঘৃণ্য শরীরসত্রাব।

অথচ কৃপাসিন্ধু দেখেছে, ওই নালার কলমি আর শুসনি শাক তুলে নিয়ে যায় গ্রামের কুড়ুনি গরিবগুরবো মেয়েরা। শীতে পাঁক ঘেঁটে মাছ ধরে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জমাদার চাঁদঘড়ির শুওরের পাল নরম মাটি খুঁড়ে শেকড়বাকড় খোঁজে। এই বসন্তে নালার বুকে দূর্বাঘাসের চাবড়া। কণ্টিকারি, কুকুরশুঁকো, হাতিশুঁড়ো এইসব কতরকম গুল্ম। বদ্যিবুড়ি ঝুরন মেঝেন জড়িবুটির খোঁজে কাটারি হাতে কুঁজো হয়ে ঘুরে বেড়ায় নালার ভেতর। কখনও কাঁখে ঝুড়ি নিয়ে হাড়কুড়োনি কোনও ধাঙড়কন্যা উদাস চাউনিতে নালার বুকের দিকে চোখ রেখে হেঁটে যায়।

কাল রাতে বাড়ি ফিরে কৃপাসিন্ধু দক্ষিণের জানালার কাছে বসে সিগারেট টানছিল। একটু গরম পড়েছে। রাতের ঝড়ের পর দোগাছিয়া জুড়ে অন্ধকার ছিল। লোডশেডিং নয়। ঝড়ে কোথায় হয়তো বিদ্যুতের তার ছিঁড়েছে। খুঁটি উপড়েছে। প্রতি বছর এমনটা হয়।

জানালার পর্দা সরিয়ে যেন বিভীষিকাকেই খুঁজছিল কৃপা-

সিন্ধু। রত্না ততক্ষণে আবার ঘুমে কাঠ। ঝলমলে জ্যোৎস্নায় ভিজে নিসর্গ বুড়োতলার সীমানাঅব্দি রহস্যময় হাতছানির মতো, এবং হঠাৎ ওদিকে এক ঝলক আলো দেখে চমকে উঠেছিল কৃপাসিন্ধু। পরে ভেবেছিল ভুল দেখল নাকি। বুড়োতলার ওখানে আলো দেখার গল্প সে শুনে আসছে ছোটবেলা থেকে। এই হয়তো প্রথম সে দেখতে পেল। জানালাটা তক্ষুনি বন্ধ করে করে দিয়েছিল সে। ঠিক ভয় নয়, একটা অস্বস্তি। যদি অশরীরী আত্মা বলে কিছু সত্যিই থাকে ?

সকালে মোটর সাইকেল ধুতে ধুতে কথাটা মনে পড়ায় তার হাসি পাচ্ছিল। সে সাহসী ও জেদী মানুষ বলে এ তল্লাটে বিখ্যাত। রাতবিরেতে সে মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে যাতায়াত করতে ভয় পায় না। অথচ নিজের ঘরে ফিরে ওই দক্ষিণের জানালায় দাঁড়ালেই সে ভিতু গোবেচারা হয়ে যায়।...

কৃপাসিন্ধুকে দেখে ভিড়টা নড়েচড়ে গেল। খেপু, এস! বয়স্করা ডাকছিলেন। খেপুদা, দেখুন তো কী ব্যাপার! কম-বয়সীরা চেঁচিয়ে উঠল। কৃপাসিন্ধু বলল, কী হয়েছে! এমন করে কী দেখছ সব ?

হিনু কৃপাসিন্ধুর হাত ধরে নালার পাড়ে ওঠাল। বলল, দেখুন তো খেপুদা, ওটা কী ?

রাখহরি চক্কোত্তি নক কুঁচকে বললেন, আমি বলছি ওটা একটা কাটা মুণ্ডু। তবু খালি তক্ক।

কৃপাসিন্ধু বলল, কই ?

হিনু লাফ দিয়ে নালায় নেমে গেল। তারপর জিনিসটার কাছে গিয়ে বলল, দেখছেন খেপুদা ?

কৃপাসিন্ধু এতক্ষণে দেখতে পেল। কণ্টিকারির ঝাড়ের ভেতর চাঁদঘড়ির শুওরেরা বেপরোয়া খুর চালিয়ে মাটি উদোম করে দিয়েছে। কাত হয়ে গেছে কিছু কণ্টিকারি এবং উপড়েও গেছে কয়েকটা। তার মাঝখানে নরম কাদামাটিতে মাখামাখি কী একটা পড়ে আছে। একরাশ চুলের গোছার মতো জিনিসটা। খানিকটা রক্তও মেখে গেছে কালো কাদায়।

কৃপাসিন্ধু অবাক হল, এতক্ষণ ধরে এই সন্দেহজনক জিনিসটা এতগুলো লোক মিলে দেখছে এবং জল্পনা করছে। অথচ পরীক্ষা করার জন্য কেউ হাত লাগায়নি। সে পাশের ঝোপ থেকে একটা ডাল ভাঙতে গেল।

তাই দেখে হিনু ঝটপট পায়ের কাছ থেকে একটুকরো শুকনো কাঠ কুড়িয়ে নিল। নালার পাড় থেকে তার দাদা জগন চেঁচিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, অ্যাই হিনে! ছুঁবি না বলছি!

খেপুদার চেলা হিনু। খেপুদাকে দেখে সে এখন বেপরোয়া। কাঠটা দিয়ে জিনিসটা উল্টে দেবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু কাদার মধ্যে আটকে গেছে ওটা। জোরে চাপ দিতে দিতে সে বলল, প্রথম আমারই চোখে পড়েছিল, খেপুদা! একটা কুকুর মুখ ঢুকিয়ে টানাটানি করছিল দেখে—ইশ! এগুলো রক্ত না কী? উরে ব্বাস!

জিনিসটা উল্টে দিয়ে সে আঁতকে দু'পা পিছিয়ে গেল। রাখহরি চক্কোত্তি দমআটকানো গলায় বলে উঠলেন, বলেছিলাম কাটা মুন্ডু!

ডাল ভেঙে কৃপাসিন্ধু নালায় নামল। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার বুকের ভেতর ঠান্ডা হিম একটা ঢিল গড়িয়ে গেল। জিনিসটা যে সত্যিই মানুষের মাথা, তাতেকোনও ভুল নেই। মুখের চামড়া আর মাংস কামড়ে খেয়ে ফেলেছে কোনও জানোয়ার—হয়তো হিনুর দেখা কুকুরটাই। চোখ আর নাকের জায়গায় লাল গর্তে থলথলে জেলির মতো কী মেখে আছে। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করে কৃপাসিন্ধু আস্তে বলল, হুঁ।

নালার পাড় থেকে একজন-দু'জন করে সরে যাচ্ছে এবার। ব্যাপারটা গোলমেলে এবং থানা-পুলিশের এক্তিয়ারে এসে গেল টের পেয়েই কেটে পড়ছে একে-একে। রাখহরি চক্কোত্তি দোনামনা করছিলেন। বললেন, কী মনে হচ্ছে খেপু? মেল, না ফিমেল?

হিনু বলল, ফিমেল নয়। মেল। চুল দেখে বুঝতে পারছেন না?

জগন বলল, খুব হয়েছে। উঠে আসবি তো এবার?

হিনু গ্রাহ্য করল না। কাঠটা ফেলে দিয়ে বলল, খেপুদা, খুব

মিসট্রিয়াস ব্যাপার, না ?

কৃপাসিন্ধু ভারি শ্বাস ছেড়ে বলল, হিনু! তুই একবার থানায় যা না ভাই। আমি থাকছি। যাবার পথে পূর্ণ চৌকিদারকে বলে যাস।

হিনু চলে গেলে কৃপাসিন্ধু পাড়ে উঠে এল। কাঁটামাদারের গাছে দুটো কাক ওত পেতে বসে আছে। নালার বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে সেই কুকুরটাই জিভ চাটছে। কৃপাসিন্ধু ডালটা তুলে কুকুরটাকে শাসিয়ে বলল, যাঃ! ভাগ! কুকুরটা তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। তখন দুটো উৎসাহী ছেলে ঢিল কুড়িয়ে তাড়া করতে গেল তাকে। কৃপাসিন্ধু সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানতে থাকল।

চক্কোত্তি ছাড়া সব প্রবীণই কেটে পড়েছেন। জগনও রাগী মুখে চলে গেল। জনাকতক তরুণ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তারা একবার কাটা মুন্ডুটার দিকে একবার কৃপাসিন্ধুর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। চক্কোত্তি কৃপাসিন্ধুর কাছ ঘেঁষে এলেন। চাপা স্বরে বললেন, কিছু বুঝলে খেপু ?

কৃপাসিন্ধু একটু হাসল। কী বুঝব ? যা বোঝবার, পুলিশ এসে বুঝুক।

না—মানে আমি বলছি কী, চেনা-টেনা মনে হয় কী না ?

কৃপাসিন্ধু আস্তে মাথা দুলিয়ে বলল, না।

চক্কোত্তি থুথু ফেলে বললেন, খুঁজলে বডিটা পাওয়া যাবে। হয়তো নালাতেই কোথাও পুঁতে রেখেছে। শুধু একটাই মিসট্রি, মুন্ডুটা পুঁতল না কেন ? একেবারে টাটকা মুন্ডু লক্ষ্য করেছ ? হয়তো কাল রাত্তিরেই—

কৃপাসিন্ধু চমকে উঠে তাকাল চক্কোত্তির দিকে। কাল রাতে এখানেই কি একঝলক টর্চের আলো দেখেছিল ?

চক্কোত্তি কষ্ট করে একটু হাসলেন।…দোগাছিয়ারই কেউ হবে। কী বলো খেপু ?

বুড়োতলার থানের পেছন থেকে আবার একটা ভিড় আসছে। সামনে পূর্ণ চৌকিদার নীল উর্দিপরা। মাথায় পাগড়ী বাঁধতে বাঁধতে আসছে এবং বগলে আটকানো লাঠি।

কৃপাসিন্ধু বঝতে পারছিল, পুলিশ এসে গেলে এই বুড়োতলা

জুড়ে তখন মানুষের হাট বসে যাবে। যারা কেটে পড়েছে, তারাও আবার আসবে। দোগাছিয়ায় খুনখারাপি আজকাল প্রায়ই হয়। বুড়োতলার নালায় কাটামুণ্ডু পড়ে থাকার ব্যাপারটাও নতুন হত না, যদি ওটা কাচ্চাবাচ্চার মুণ্ডু হত।...

রাখহরি চক্কোত্তি বহুদর্শী বিচক্ষণ মানুষ। তাঁর অনুমানই ঠিক হল। বুড়োতলার নালা যেখানে নিচু মাঠে শেষ বাঁক নিয়েছে, সেখানে এক বাজপড়া অশত্থ। নালার বুকে আঁকড়ে ধরে আছে গাছটার শেকড়বাকড়। তার কাছে দুর্বাঘাসের চাবড়া বসানো ছিল, কণ্টিকারির ঝোপসুদ্ধ। এ তল্লাটে শেয়ালবংশ অনেকদিন আগেই লুপ্ত। তা না হলে তারা ঠিকই টের পেত। বডিটা যে রাতের ঝড়বৃষ্টির আগে পোঁতা হয়েছিল, তার প্রমাণ মিলেছে। এ বসন্তকালে বাজপড়া অশ্বত্থও কচি চিকণ পাতায় সেজেগুজে দাঁড়িয়ে ছিল। রাতের ঝড়টা হিংস্র হাতে যথেচ্ছ পাতা ছিঁড়ে তাকে ছন্নছাড়া করতে চেয়েছিল। দুর্বার চাবড়ার ওপর লালচে রঙের একরাশ পাতা পড়ে ছিল। বডিটা টুকরো-টুকরো করে কেটে বস্তায় ভরে পুঁতে রেখেছিল। শুধু বোঝা যায় না, মুণ্ডুটা অত দূরে নিয়ে গিয়ে, ফেলল কেন? বংকু দারোগা খি খি করে হেসে বলছিলেন, কাউরে প্রেজেণ্টশান দিতে লইয়া যাখতেছিল। শ্যাষে সাহস হয় নাই। ফেলিয়া পলাইয়া গেছে।

চক্কোত্তির মতে, তাও হতে পারে। বুড়োতলার থানের কাছে এসে ভয়টয় পেয়ে কাটামুণ্ডুটা দমাস করে ফেলে পালিয়ে গেছে। জায়গাটা তো চিরকাল ভূতের বাথান। এমনও হতে পারে, যার মুণ্ডু সেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

সারাটা দিন বাজারে, বারোয়ারিতলায়, ভানু ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে, রিকশোর স্ট্যাণ্ডে এই রহস্য নিয়ে আলোচনা চলেছে। রাখহরি চক্কোত্তি সবখানে একবার করে ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছেন। প্রাইমারি স্কুলের অবসরভোগী শিক্ষক। দুই মেয়ের বিয়ে দিতে পেরেছেন। ছেলে দুর্গাপুর কারখানায় চাকরি পেয়েছে। চিঠি কিংবা মানি অর্ডারের আশায় ডাকঘরে সকালবেলা গিয়ে বসে থাকেন। তারপর প্রায় সারাটা দিন এবং রাত দশটা

অব্দি এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরির নেশা। সবতাতে নাক-গলানে মানুষ।

দোগাছিয়ার কেউ নিপাত্তা হয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না এত শিগগির। কত লোক কাজেকর্মে নানা জায়গায় গেছে। কেউ গেছে আত্মীয়বাড়ি বেড়াতে। কিন্তু ভেতর-ভেতর উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তিতে সেইসব বাড়ির লোকেরা অস্থির।

কৃপাসিন্ধু গুম হয়ে আছে। এদিন আর কোনও কাজে মন নেই। পঞ্চায়েত অফিসেও যায়নি। সেক্রেটারি কাদের আলি এসে কাগজপত্র সই করিয়ে নিয়ে গেল। বিকেলে সদ্গোপপাড়ায় একটা বিবাদ ফয়সালার কথা ছিল। সেটা আগামীকাল হবে, বলে পাঠিয়েছে। আজ সারাক্ষণ কৃপাসিন্ধু দক্ষিণের জানালা খুলে সেখানে চেয়ার পেতে বসে আছে। সিগারেটের পর সিগারেট খাচ্ছে। দুপুরে ভাল করে খেতে পারেনি। খালি গা ঘিনঘিনে ভাব। বমি করতে পারলে বেঁচে যেত।

রত্না বড় ননদের সঙ্গে কাদের বাড়ি গেছে। রেবা শ্বশুরবাড়ি থেকে এলেই এরকম। কৃপাসিন্ধু জানে, বড়দি গ্রামের বাড়ি-বাড়ি নাগরিক জেল্লা দেখাতে যায়। বাড়িটা আজ ভীষণ স্তব্ধ যেন। চারুবালার সাড়া নেই। ছায়া হয়তো বি ডি ওর কোয়ার্টারে আড্ডা দিতে গেছে। বি ডি ওর বউ কৃপাসিন্ধুর দূর সম্পর্কের বোন, এটা সম্প্রতি আবিষ্কৃত ঘটনা। তারপর থেকে ছায়াকে আর আটকানো চলে না। নইলে বোনের চলাফেরা সম্পর্কে কৃপাসিন্ধুর কড়াকড়ি ছিল এতদিন।

বুড়োতলার নালার দিকটায় তাকিয়ে সিগারেট টানছিল কৃপাসিন্ধু। রাতের ঝড়বৃষ্টির পর সারাদিন ঝলমলে রোদ। বৃষ্টি-ধোয়া নিসর্গ খুব প্রাণবন্ত। তার ওপর ঝড়ের নখের আঁচড়ের মতো বিভীষিকার ছায়া কুটিকুটি আভাস ফুটে বেরুচ্ছে মাঝেমাঝে। রোদ যত ক্ষয়ে যাচ্ছে, তত স্পষ্ট হচ্ছে ওই বিভীষিকার শরীর।

রোদ একেবারে মুছে গেলে কৃপাসিন্ধু জানালাটা বন্ধ করে দিল। তারপর মনে পড়ল, বিদ্যুৎ নেই। ট্রান্সমিটারে নাকি বাজ পড়েছিল। বিদ্যুৎ আসতে এক সপ্তার ধাক্কা। পিসিমা, আলো!

বলে কৃপাসিন্ধু আবার বসে পড়ল। শরীরের ভেতর থেকে ধস-ছাড়ার মতো অনেককিছু ধসে গেছে যেন। মাথার ভেতরটাও শূন্য লাগছে।

চারুবালা চুপচাপ লণ্ঠন রেখে গেলেন। তারপর বারান্দার তাক থেকে শাঁখটা নিয়ে ফুঁ দিলেন। গোয়ালঘরের দিকে রাখাল ছেলে-টার চিৎকার শোনা গেল, গিন্নিমা! আলো!

কৃপাসিন্ধু একটা কাটা মুণ্ডুর কথা ভাবছিল। আজ সকালে-রটা নয়,অন্য একটা। ছেলেবেলায় দোগাছিয়া স্কুলের পেছনের মাঠে সেবার ম্যাজিকের তাঁবুর ভেতর একটাঅভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাঁবুটা ছিল ছোট্ট। ভেতরে কোনও স্টেজ ছিল না। কালো প্যাণ্ট কোট আর সাদা শার্ট-পরা ম্যাজিশিয়ান এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক দেখাচ্ছিল। শেষ খেলাটা ছিল কাটা মুণ্ডুর কথা বলা।

কোণায় একদা কাঠের টব। দুজন সহকারী কালো কাপড়ে পর্দার মতো ঘিরে রেখেছিল টবটা। পেছনে ম্যাজিশিয়ান দাঁড়িয়ে। সে অনর্গল কথা বলছিল কাদা মুণ্ডু সম্পর্কে। তারপর পর্দা সরিয়ে নিয়ে সহকারীরা চলে যেতেই কৃপাসিন্ধু অবাক। টবের ওপর সত্যি একটা মুণ্ডু। গলার কাছে চাপচাপ রক্ত। অথচ মুণ্ডুটা জীবন্ত। মুচকি হাসি তার ঠোঁটে। মাঝেমাঝে ভুরু তুলে চোখদুটোও নাচাচ্ছে।

ম্যাজিশিয়ান একটা শাদা হাড় মুণ্ডুটার মাথায় ঠেকিয়ে বলল, এবার কাটা মুণ্ডু কথা বলবে। মা-সকল, বাবা-সকল, ভাইভগ্নী-সকল, খোকাখুকুরা! একবার জোরসে হাততালি দাও—জোরসে!

হাততালির পর ম্যাজিশিয়ান বলল, কাটা মুণ্ডু! তোর নাম কী?

কৃপাসিন্ধুর এখনও স্পষ্ট মনে আছে কাটা মুণ্ডুটাকে, অবিকল কানে ঢুকে আছে তার কণ্ঠস্বরও। কেমন গোঙিয়ে ওঠা, ঘড়ঘড়ে এবং নাকি তার কণ্ঠস্বর। শুনে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল কৃপাসিন্ধুর। কাটা মুণ্ডু বলল, ঘ্যংঘায়াম!

ম্যাজিশিয়ান দাঁত কিড়মিড় করে বলল, স্পষ্ট করে বল কাটা মুণ্ডু! কী নাম তোর?

কাটা মুণ্ডু আবার বলল, ঘ্যংঘায়াম।

ম্যাজিশিয়ান হাসতে হাসতে বলল, বুঝলেন কিছু? কাটা মুণ্ডু বলছে তার নাম গঙ্গারাম। তো ওরে বাবা গঙ্গারাম, তোর দেশ কোথায়?

কাটা মুণ্ডু বলল, কাঁটিহাঁড়!

ভয় পাওয়ার ভঙ্গী করে ম্যাজিশিয়ান দুপা পিছিয়ে বলল, ওরে বাবা! কাটি হাড় বলছে নাকি? শুনছেন আপনারা? হাড় কাটার কথা বলছে। ও বাবা গঙ্গারাম, কলকাতায় হাড়কাটার গলি আছে শুনেছি। এ আবার কেমন হাড় কাটাকাটি বাবা? কার হাড় কাটবে মানিক?

তাঁবুর ভেতর হাসির হল্লা। শুধু কৃপাসিন্ধু কাঠ হয়ে তাকিয়ে ছিল।

কাটা মুণ্ডু গোঙানো কণ্ঠস্বরে বলল ফের, কাঁটিহাঁড়! কাঁটিহাঁড়।

ম্যাজিশিয়ান চেঁচিয়ে উঠল, উরে ব্বাস! কাটিহার বলছে গো! বুঝতে পারছেন তো আপনারা? বিহার মুলুকের সেই কাটিহার। তো বাবা কাটিহারের শ্রীমান গঙ্গারাম, তোমার মুণ্ডুটি কাটল কে?

কাটা মুণ্ডু বলল, ঘঁড়েশ ভোঁস।

ম্যাজিশিয়ান একটু ঝুঁকে শোনার ভঙ্গী করছিল। চমকে ওঠার ভান করে সোজা হয়ে চাপা গলায় বলল, সর্বনাশ! কী নাম বলল যেন—

কাটা মুণ্ডু বেজার মুখে ফের উচ্চারণ করল, ঘঁড়েশ ভোঁস।

ম্যাজিশয়ান চোখ বড়ো করে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, ওরে বাবা! এ যে গণেশ বোস বলছে। গণেশ বোস যে আমারই নাম। আমায় ফাঁসিতে চড়তে হবে যে! এক্ষুনি পুলিশবাবুরা যদি জানতে পারেন, প্রোফেসর গণেশ বোস কাটিহারের গঙ্গারামের মুণ্ডু কেটেছে, তাহলেই হয়েছে। কাজেই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা করে কাটা মুণ্ডুটা লুকিয়ে ফেলা যাক।

সহকারীরা দৌড়ে এসে কালো কাপড়টা ঘিরে ধরল কাটা মুণ্ডুর চারপাশে। তারপর খেলা শেষ।

এই খেলাটা মাঝে মাঝে খেলত নিজের সঙ্গে কৃপাসিন্ধু।

বুড়োতলার থানে নির্জনে দাঁড়িয়ে প্রোফেসর গণেশ বোসের গলায় বলত, কাটা মুণ্ড, তোর নাম কী?

ঘংঘারাম।

তোর দেশ কোথায়?

কাঁটিহাঁড়।

কে তোর মুণ্ডু কাটল?

কৃপাসিন্ধু মুচকি হেসে বলত, খেঁপু। তারপর হি হি করে এমন হাসত সে হাফপেণ্টুল খুলে যেত বোতাম ছিঁড়ে। নিজের ডাকনাম খেপুটা সে অবোধ বয়স থেকে শোনার ফলে সহজভাবেই নিয়েছিল। এ বয়সেও কেউ তাকে কৃপাসিন্ধু বলে ডাকলে অচেনা লাগে। খেপু আর কৃপাসিন্ধুকে সে কিছুতেই মেলাতে পারে না।···

সর্বাণী খিড়কির ঘাটের ধারে ঘাসের ওপর নকশাকাটা এক-টুকরো চটের আসন বিছিয়ে বই পড়ছিল। বিকেলবেলাটাতে এই-টুকুই তার বিলাস। এটাকে পুকুর বলতে ইচ্ছে করে না. আয়তনে নেহাত ডোবাই। কিন্তু পুকুরের সব লক্ষণ এই জল-টুকুর আছে। মধ্যিখানে একঝাঁক লাল শালুক আছে। কিছু সবুজ পানারিপাতা সাজানো আছে এখানে-ওখানে সরু সরু শাদা ফুলের ফুটকি নিয়ে। ওপারে কোনার দিকে একদঙ্গল কলমি শাক শরতে বেগুনি ছোপ লাগা সাদা ফুল দিতে শুরু করেছিল। এখন বসন্তেও কিছু টিকে আছে। বীরেশ্বরের হামলায় মাঝে মাঝে ফর্দাফাঁই হয়ে যায় কলমিলতার সৌন্দর্য। শাক খেতে খুব ভালবাসে সে। মাঝেমাঝে বলে. খানিকটা শুসনি শাকের লতা এনে ফেলে দেব। সর্বাণী শাসায়. বুড়োতলার নালা থেকে তো? এনেই দেখো না, কী করি। সর্বাণী দোগাছিয়ারই মেয়ে। সে বুড়োতলার নালার অনেক রহস্য জানে।

প্রাথমিক স্কুলের মাস্টার বীরেশ্বরের পৈতৃক সম্পত্তি বলতে এই মাটির বাড়িটা আর পেছনের জলাটুকু। সর্বাণীর তাগিদে তিন পাড়ে কাঁটাবেড়ায় ঘিরে সামান্য এক সবজিক্ষেত আর কিছু ফুল-গাছ হয়েছে। এদিকটার ঘাটের পাশে কলাগাছ মাথা তুলেছে। এই

প্রথম মোচা এসেছে একটাতে। সর্বাণী বই পড়তে পড়তে মাঝে-মাঝে মুখ তুলে মোচাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। রোদ মুছে এলে সে বই রেখে কোমরে আঁচল জড়িয়ে সবজিক্ষেত আর ফুলগাছে জল দিতে যায়। বীরেশ্বর টিনের ঝারি এনে দিয়েছে শহর থেকে। কোনো কোনোদিন কুনাইপাড়া বাউরিপাড়া হাড়িপাড়ার মেয়েরা কেউকেউ দরখাস্ত লেখাতে আসে। বীরেশ্বরকে না পেলে সর্বাণী আছে। সর্বাণীর হাত থেকে জলের ঝারিটা কেড়ে নেয়। ভদ্রলোকের মেয়ের কি এই কাজ বাবুদিদি? আমনি দরখাস্ত নেকুন, আমি জল দিচ্ছি আমনার বাগানে।

সর্বাণী তাদের মুখে তার প্রিয় বাগানটুকুর প্রশংসা শুনতে চায়। গাছপালা ফুলফল আর মাটির রহস্য হয়তো তার চেয়ে ওরাই বেশি জানে। বেগুনে পোকা লাগলে কী করতে হয়, তারাই তাকে বাতলে দিয়ে যায়। কোনার দিকে কালোর বউ একটা কাক-তাড়ুয়া বানিয়ে দিয়ে গেছে। বীরেশ্বরের ছেঁড়া পাঞ্জাবি সেটার গায়ে। মাথাটা একটা কেলে হাঁড়ির, তাতে চুন দিয়ে চোখমুখ আঁকা। কালোর বউ মুখে আঁচল চেপে হাসি ঢেকে বলেছিল, থাকো তুমি সাক্ষাৎ মাস্টের মশাইটি হয়ে। সর্বাণীও হেসে অস্থির। বীরেশ্বর বাড়ি ফিরলে বলেছিল, দেখ গে তোমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছি বাগানে। শুনে বীরেশ্বর দেখতে গিয়েছিল টর্চ নিয়ে।

কাল রাতের ঝড়ে কাকতাড়ুয়াটা পড়ে গিয়েছিল। সকালে আবার খাড়া করে দিয়েছে সর্বাণী। কাল রাতের ঝড়টা যা সাংঘাতিক গেছে, সর্বাণী খুব ভয় পেয়েছিল। পুজোর সময় চালের খড় ফেলে বীরেশ্বর টালি চাপিয়েছে। টালির চালের ওপর পেছনের নিমগাছের ডাল আছড়ে পড়ছিল। আর কী সব অদ্ভুত ভাঙচুরের শব্দ। এমন রাতে আবার হারুর মায়ের জ্বর। শুতে আসেনি সর্বাণীর কাছে।

সকালে উঠোন জুড়ে খড়কুটো ছেঁড়াপাতা ডালপালা পাখির বাসা—সে এক আবর্জনা। সাফ করতে ক্লান্তির একশেষ। দুপুরটা ঘুমিয়েই কাটিয়েছে সর্বাণী। তারপর কুকার জেবলে চা করে বই আর চটের আসন হাতে ঘাটে এসেছে। এদিকটায় তার মন

পড়ে থাকে।

ডোবার জল থেকে রোদ মুছে আসছিল। জলমাকড়সাগুলো তর তর করে অসম্ভব গতিতে জলের ওপর ছুটে বেড়াচ্ছিল। দিনশেষের এই সময়টাতে কেমন ঘোর-ধরা আচ্ছন্ন একটা ভাব এসে যায়। বইয়ের পাতায় মন বসে না আর। কোথায় বাছুরের গলায় ঘণ্টা বাজে। গাইগরু হাম্বা করে ডেকে ওঠে। কেউ তই তই বলে হাঁসগুলোকে ডাকতে থাকে বেনেদীঘির জলে—এত দূরথেকেও কানেভেসে আসে। মাথার ওপর দিয়েপাখি উড়ে যায়। মাঝেমাঝে পিচ রাস্তার দিকে মোটরগাড়ির হর্নের শব্দ। তারপর চাপা গরগর গর্জন মিলিয়ে যায় ক্রমশ। আকাশে শেষবেলায় একটা প্লেন। সর্বাণী প্লেন দেখতে দেখতে সিংহবাহিনীর মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজল।

বাইরে কেউ কড়া নেড়ে ডাকছিল। সর্বাণী আসন গুটিয়ে উঠে পড়ল। বীরেশ্বরের গলা নয়। তার ফেরার কথা আগামীকাল অথবা পরশু। আজ আর বাগানে জল দেবার দরকার নেই। রাতের বৃষ্টিটা যথেষ্টই। সর্বাণী বারান্দায় আসন আর বইটা রেখে দরজা খুলতে গেল।

রাখহরি চক্কোত্তি ঢুকেই চাপা স্বরে বললেন, বীরু ফেরেনি?

সর্বাণী একটু অবাক হয়ে বলল, না। ওদের তো আজ অফিস কনফারেন্স। তারপর ডেপুটেশনে যাবে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। কেন জ্যাঠামশাই?

এমনি। চক্কোত্তি হাসলেন।

আপনি বসুন জ্যাঠামশাই!

সর্বাণী সেই আসনটা বারান্দায়পেতে দিলেচক্কোত্তি পা ঝুলিয়ে বসলেন। বইটা একবার পাতা উলটিয়ে দেখে রেখে দিলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, আজ সারাটা দিন মনটা খুব অস্থির, সাবি! বুড়োতলার নালায়—

সর্বাণী দ্রুত বলল, ও হ্যাঁ। মোনা বলছিল, ডেডবডি পেয়েছে একটা। কার জ্যাঠামশাই?

সেটাই তো রহস্য। চক্কোত্তি গলার ভেতর বললেন। বললাম না মনে শান্তি নেই সারাটা দিন?

চেনা যাচ্ছে না ?

না। চক্কোত্তি একটা হাত কাটারির কোপ মারার ভঙ্গীতে নেড়ে বললেন। পিস বাই পিস কেটেছে।

কিন্তু কাপড়চোপড় জ্যাঠামশাই ? কাপড় নেই পরনে ?

উঁহু। নেকেড করে কেটেছে। চক্কোত্তি করুণ হাসলেন। কী বর্বর রসিকতা দেখ সাবি, মুন্ডুটা কেটে অন্য জায়গায় ফেলে পালিয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, কাউকে প্রেজেণ্ট করতে যাচ্ছিল,। ভয় পেয়ে ফেলে পালিয়েছে।

সর্বাণী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, দেখছ, মোনা আমাকে এসব কিচ্ছু বলে নি। আচ্ছা জ্যাঠামশাই, কাটা মাথাটা দেখে মুখটা তো চেনা যাবে ? তাই না ?

চক্কোত্তি ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, যাবে কী করে আর ? কুকুরে খুবলে সব খেয়ে ফেলেছে। রায়েদের হিনু সকালে ওখানে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পায়।

সর্বাণী চুপ করে রইল। একটু পরে চক্কোত্তি বললেন, পুলিশের যা কাজ ! কাটা মুন্ডু আর বডি টাউনের মর্গে চালান করে দিয়েছে। কালকের দিনটা নাকি রেখে দেবে। কেউ শনাক্ত যদি করে, করবে। তবে আমার ধারণা, শনাক্ত দুঃসাধ্য।

সর্বাণী আস্তে বলল, আপনি দেখেছেন ?

দেখেছেন কী বলছ ? আগাগোড়া আমিই তো গাইড করে—চক্কোত্তি আবার শ্বাস ছেড়ে থেমে গেলেন। পা দুটো নাচাতে থাকলেন।

সর্বাণী বলল, আপনি একটু বসুন জ্যাঠামশাই। চা করি।

সে লণ্ঠন জেলে বারান্দায় একটু তফাতে রাখল। তারপর রান্নাঘরে চা করতে গেল। চক্কোত্তিকে চা খাওয়ানোর মানে হয় না। কিন্তু কিছুক্ষণ মানুষের সঙ্গ হঠাৎ প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে সর্বাণীর। কুকার জ্বালানোর সময় তার হাত কাঁপছিল। বীরেশ্বর কলকাতায় প্রাথমিক শিক্ষকদের সম্মেলনে গেছে। আগামীকাল বা পরশু বিকেলের মধ্যে তার ফেরার কথা। তাছাড়া সে তো একা যায় নি। এলাকা থেকে একদল প্রতিনিধি নিয়ে গেছে। সর্বাণী টের পাচ্ছিল, তবু খুব ভেতরদিক থেকে একটা উদ্বেগ যেন আঙুল

বাড়িয়ে দিচ্ছে—হয়তো চক্কোত্তিজ্যাঠার এমন করে এসে বীরেশ্বরের কথা জিগ্যেস করাটাই কাল হয়েছে। আগুনের নীল শিখা দপদপ করছে। বুকের ভেতরও ওই রকম একটা শব্দ। বীরেশ্বরের এখানে অনেক শত্রু। দোগাছিয়ায় সে ক্রমশ কোণঠাসা এবং এক-ঘরে হয়ে পড়ছে। গত শীতে ক্ষেতমজুর সমিতি করে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। তা ছাড়া ভাগচাষীদের কৃষক সমিতি মাঠ থেকে ধান তুলে বারোয়ারি খামারে উঠিয়েছিল। পুলিশ যায় নি। কিন্তু সর্বাণী জানে, বীরেশ্বরই এর পেছনে ছিল। তার মাঝেমাঝে মনে হয়েছে, নিজের জমি নেই বলেই কি বীরেশ্বরের এত রাগ জমিওলা মানুষ-দের ওপর? বীরেশ্বরকে কিছু বলতে গেলেই বলে, তুমি তো জানো আমি কী। তুমি কি জানো না ইচ্ছে করে আগুনের সঙ্গে ঘর বাঁধতে এসেছ? সর্বাণী ওর বলার ভঙ্গি দেখে শেষে হেসে ফেলে। থাক, আর নিজের সম্পর্কে বড়াই করতে হবে না। সর্বাণী একথা মুখে বললেও ভালই জানে, বীরেশ্বর সত্যিই একটা আগুন। আগুন বলেই তো রাতারাতি তার ঘর করতে আসার সাহস পেয়েছিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে চক্কোত্তি বললেন, বীরুর জন্য ভাবনা হয়। খামোকা লোকের সঙ্গে ঝামেলা করে বেড়ায়। যাদের জন্য এসব করে বেড়াচ্ছে, তারা কি ওকে দুঃসময়ে দেখতে আসবে ভাবছ? দোগাছিয়ার লোককে এখনও চেনেনি ও। যে পাতে বসে খাবে, সেই পাতে বসেই উল্টে চোখ রাঙাবে।

সর্বাণীর মনে হল স্বামীকে সমর্থন করা উচিত। একটু হেসে বলল, সময়টা এখন বদলে গেছে না জ্যাঠামশাই? নিজেদের স্বার্থ সবাই বুঝে নিতে শিখে গেছে। চোখ রাঙানোর কথা বলছেন —আমার মনে হয়, লোকে জানে কে সত্যিকার বন্ধু আর কে সত্যিকার শত্রু।

চক্কোত্তি চুপচাপ চা খেতে থাকলেন। মাখন কোবরেজ ছিলেন তাঁর ছোটবেলা থেকে বন্ধু। তার মেয়ের সঙ্গে তর্ক করার প্রবৃত্তি হয় না। কোবরেজের মৃত্যুর পর অসহায় বিধবা আর এই মেয়ের দেখাশোনা করার কেউ ছিল না। সর্বাণী কায়েতের ছেলেকে রাতা-রাতি বিয়ে করে বসেছিল, সেই দুঃখে আর লজ্জায় বিধবা ধুলি-

য়ানে ভাইয়ের কাছে চলে গেলেন তো গেলেন, আর খবর নেই। এদিকে মেয়েরও এমন শক্ত প্রাণ, ভুলেও মায়ের নাম মুখে আনে না। অবশ্য রতনে রতন চেনে বলে কথা আছে। যেমন গোঁয়ারগোবিন্দ বীরেশ্বর, তেমনি—তা কেন, তারও এককাঠি সরেস এই মেয়ে। গ্রামের এক টেরে এই নিরিবিলি জায়গায় একা দিব্যি থাকতে পারে। বীরেশ্বরেরও এতে কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। যেইমান কে তেইসান। চক্কোত্তির নাকের ডগা বেঁকে গেল।

মজার কথা, খেপুই বিয়ে করতে চেয়েছিল সাবিকে। খেপুর সঙ্গে বিয়ে হলে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারত মেয়েটা। তার মাকেও লজ্জায় পড়ে পালাতে হত না পরান্নের প্রত্যাশী হয়ে। খেপুও তেজী ছেলে—বীরুর জুটি বললেও চলে। কিন্তু তত বেশি গোঁয়ার নয়। বোঝালে বোঝে এবং স্বভাবে অত্যন্ত ভদ্র। চক্কোতি দুজনকেই প্রাইমারিতে পড়িয়েছেন। পড়া না পারলে দুজনের মাথায় চাঁটু লাগিয়ে দিয়েছেন।

তারপরেও তো ওদের মধ্যে ভাব ছিল দেখেছেন। খেপু কলেজে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিল। জোতজমিওলা বাড়ির ছেলে। পড়াশোনায় তত মনছিল না। বীরুকে বাধ্য হয়ে মন দিতে হয়েছিল। বি এ পাশ করে মাস্টারিটা জুটিয়ে বিটিও পড়ে নিয়েছে। শেষে পলিটিকস ওকে খেল। খেপুরে যা সাজে, বীরুর কি সাজে?

চক্কোত্তি তেতোমুখ করে বললেন, উঠি সাবি।

সর্বাণী দরজা অব্দি এগিয়ে দিতে গেল দরজা বন্ধ করার জন্য। নইলে তার শরীরটার কেমন হঠাৎ ধসছাড়া অবস্থা। চক্কোত্তিজ্যাঠা এমন করে এসে বীরেশ্বরের কথা জিগ্যেস করলেন!

আজ বাড়িটাও খুব নির্জন আর স্তব্ধ লাগছে সর্বাণীর। আজও কি মাঝরাতে আবার ঝড় আসবে? কালবোশেখির ঝড়ের যেন সেটাই নিয়ম। একবার এলে পর-পর কয়েকটা দিন একই সময়ে আসে।

কিন্তু এখন আকাশভরা তারা! বিশ্বাস হয় না আবার ঝড় আসবে।…

সকালে কৃপাসিন্ধু বেরুবে ভাবছিল। বিলেপাড়ার কাছে

নদীর বাঁধে আজ মাটি পড়বে। অনেক হাঁটাহাঁটির পর মেরামতের টাকা মঞ্জুর হয়েছে জেলা পরিষদ থেকে। বারান্দায় মোটর সাই-কেলের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, আলপথে গাড়ি চালিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

ঘরে কাগড় বদলাতে ঢুকলে রত্না বলল, কোথায় বেরুচ্ছ শুনি?

একটু চটে গেল কৃপাসিন্ধু।...তোমার কী হয়েছে কাল থেকে। আঁচলের আড়ালে পিদিম করবে নাকি?

মুখের ভাষা শোনো!

জানই তো চাষাড়ে মানুষ। কাদামাটি ঘেঁটে বেড়াই! কৃপাসিন্ধু লুঙি ছেড়ে প্যাণ্ট পায়ে ঢোকাল। তারপর শার্টটা টেনে নিয়ে ফের বলল, তোমার এত চিত্তচাঞ্চল্য কেন বুঝতে পারছি না কিন্তু।

রত্না আস্তে বলল, চিত্তচাঞ্চল্য তো তোমারই দেখছি। পরশু অত রাতে ঝড়ের পর ফিরে এলে কোত্থেকে। সারারাত ওই জানালার ধারে বসে কাটালে। কাল সারাটা দিন—তারপর এ রাতেও যতবার ঘুম ভেঙেছে, দেখি ওখানে বসে আছ জানালা খুলে। খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছ। কেন?

কৃপাসিন্ধু একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, খুনখারাপি দেখে মন খারাপ। তুমি দেখলে—

থামো! খুনখারাপি কখনও দেখনি? আমি সব জানি।

কী জানো তুমি? কৃপাসিন্ধু বেল্ট আঁটতে আঁটতে গলার ভেতর বলল।

রত্না ঠোঁট কামড়ে কথা খুঁজছিল। একটু পরে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, ঝড়ের রাতে তুমি কোথায় ছিলে?

কৃপাসিন্ধু অবাক হয়ে তাকাল।...কেন—বেণীপুরে।

কক্ষনো না। রত্না হিসহিস করে উঠল।...তুমি ওই মেয়েটার কাছে ছিলে।

মেয়েটা? কোন মেয়েটা বলো তো?

বীরুবাবুর বউয়ের ওখানে ছিলে তুমি। রত্নার গলা কাঁপছিল। বীরুবাবু নেই—আমি খবর নিয়েছি। তুমি আবার ওখানে নাক গলাচ্ছ, তাও জেনেছি।

রত্না কেঁদে ফেলল। কৃপাসিন্ধু অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে

থাকার পর হাসতে লাগল। আশ্চর্য তোমার ইমাজিনেশান, মাইরি! একটা কথা বলি শোনো—খেপু এঁটোকাটা খায় না কারুর।

কৃপাসিন্ধু জোরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মোটর সাইকেলটাও তেমনি জোরে উঠোনে নামিয়ে নিয়ে গেল। উঠোনেই-স্টার্ট দিল। সদর দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে যাবার সময় বাড়িটাকে প্রচণ্ড কাঁপিয়ে দিয়ে গেল সে।

পূর্ণ চৌকিদার আসছিল পিচ রাস্তা থেকে। সেলাম দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে কৃপাসিন্ধু মোটর সাইকেল থামিয়ে বলল, কী রে পূর্ণ?

আজ্ঞে, বড়বাবু জরুরি তলব দিয়েছেন।

কী ব্যাপার?

আজ্ঞে, কেলেঙ্কারি। পূর্ণ করুণ মুখ করে বলল। স্লুইস-গেটের কাছে রক্ত মাখা জামাকাপড় পাওয়া গেছে। দুটো সেণ্ডেল জুতোসুদ্ধু। আমনি একটু চলুন স্যার।...

থানার বারান্দায় বড়বাবু বঙ্কুবিহারী নন্দী বসে ছিলেন। প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর কাগজের মোড়কে রক্তমাখা কাপড় আর সেণ্ডেল। খুলে বললেন, দ্যাহেন কাণ্ডটা।

কৃপাসিন্ধু দেখতে দেখতে বলল, ধুতি পাঞ্জাবি মনে হচ্ছে।

হঃ। বঙ্কুবাবু বললেন। মার্ডার হইছে স্লুইসগ্যাটের ওহানে। বডিটারে কাটছে। কাটিয়া একখানে পুঁতছে। আর হ্যাডটারে লইয়া—

কৃপাসিন্ধু আস্তে বলল, কার?

মেজবাবু সত্যচরণ পাণ্ডে বললেন, বীরেশ্বরবাবুর।

কৃপাসিন্ধু নিষ্পলক চোখে তাকাল। বলল, বীরুর! কিন্তু সে তো শুনেছি কলকাতায় আছে। কনফারেন্স না কী হচ্ছে ওদের। কৃপাসিন্ধু শ্বাস ছেড়ে ফের বলল ফের, কে আইডেণ্টিফাই করল?

বঙ্কুবাবু বললেন, ওনার ওয়াইফ।

পাণ্ডেবাবু বললেন, রূপপুরের এক টিচার ভদ্রলোকও গিয়েছিলেন বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে। উনিই আজ ভোরের বাসে ফিরে বীরেশ্বরবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন। বীরেশ্বরবাবু নাকি কনফারেন্সে ঝগড়া করে গত পরশু দুপুরে চলে এসেছেন।

কৃপাসিন্ধু গলার ভেতর বলল, হুঁ।

পাণ্ডেবাবু বললেন, মেয়েদের একটা ইনটুইশান থাকে, বুঝলেন না? তাছাড়া দিস ওয়াজ কোয়াইট এক্সপেক্টেড—যা শুরু করেছিলেন ভদ্রলোক।

বঙ্কুবাবু চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, দুপুর মানে ধরেন, এসপ্ল্যানেডে বাস ছাড়ছে দুইটার পরে। ওমাসে আমি আইলাম না? দোগাছিয়া আইতে রাইত নয়টা-টয়টা। অত দেরি হওনের কথা না। হক্কল পথ খালি প্যাসেঞ্জার ওঠায়, খালি প্যাসেঞ্জার ওঠায়। বাপ রে বাপ! য্যান ছ্যাকড়া গাড়ি।

কৃপাসিন্ধু বলল, বাস থেকে বীরুকে নিশ্চয় কেউ নামতে দেখেছিল?

পাণ্ডেবাবু বললেন, ইনভেস্টিগেশানে জানা যাবে।

বঙ্কুবাবু বললেন, আপনারে ডাকছিলাম, কীভাবে কী করন যায়। আপনি হইলেন গা এরিয়ার লিডার। আপনারে না জিগাইয়া কিছু করুম না। খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগলেন বড়বাবু। এরকম হাসি হাসতে না জানলেই বিপদ।

যা ভাল বোঝেন, করুন। কৃপাসিন্ধু উঠে দাঁড়াল। খুনীরা ধরা পড়ুক, সেটাই আমি চাইব। তবে একটা অনুরোধ বড়বাবু; প্লিজ যেন নির্দোষ লোককে কষ্ট দেবেন না।

কৃপাসিন্ধু মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় গেল। একটু থামল। তারপর সোজা বাজার পেরিয়ে গিয়ে ডাইনে আগাছাভরা জমিটার ওপর সংকীর্ণ পায়ে চলা রাস্তায় এগিয়ে গেল। কে তাকে দেখছে বা দেখছে না, গ্রাহ্য করছিল না সে। বুড়োতলার নালার সেই পুরনো বিভীষিকা তার পেছনে। আসলে পালিয়ে কোথাও যেন লুকোতেই চাইছিল কৃপাসিন্ধু।

কিন্তু বীরেশ্বরের বাড়ির দরজায় তালা দেখে সে মোটর সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে দিল।···

চক্কোত্তি দুবার এসেছিলেন। তৃতীয়বার এলেন সন্ধ্যার মুখে। রেবা চড়া গলায় দোগাছিয়ার মুণ্ডুপাত করছিলেন। তর্কটা ছায়ার সঙ্গে। ছায়া বলে ফেলেছিল, তোমাদের টাউনেও কি কম!

সন্ধ্যায় মেয়েরা বেরুতে পারে না—তার বেলা ? চক্কোতি আসায় ছায়া বেঁচে গেল। রেবা পড়লেন পিসিমাকে নিয়ে। চারুবালা বিব্রতমুখে বললেন, আহা, আমি কি তাই বলছি খুকু ?

চক্কোতি বললেন, খেপু ফিরেছে নাকি ? তারপর মোটর সাই-কেলটা দেখতে পেয়ে ডাকলেন, অ খেপু !

রত্না বেরিয়ে এসে ঘোমাটা টেনে মৃদু স্বরে বলল, শরীর খারাপ। শুয়ে আছেন।

চক্কোত্তির গতিবিধি সর্বত্র অবাধ। চটি ফটফটিয়ে বারান্দায় উঠে সোজা ঘরে ঢুকে গেলেন ডাকতে ডাকতে। কৃপাসিন্ধু খাটে শুয়ে ছিল। উঠে বসে বিরক্তি চেপে বলল, আসুন জ্যাঠামশাই। তারপর লণ্ঠনের দম তুলে আলো বাড়িয়ে দিল। ফের বলল, বসুন।

চক্কোতি দক্ষিণের জানালার ধারে চেয়ার দেখে বসতে গেলেন। বললেন, অ। তোমার এখান থেকে বুড়োতলা অব্দি নজর হয় দেখছি।

চক্কোত্তি বসলে কৃপাসিন্ধু বলল, বলুন।

আমি জানতাম। চক্কোত্তি শ্বাসের মধ্যে বললেন। জানতাম কাটা মুণ্ডুটা বীরুরই হবে।

কৃপাসিন্ধু আস্তে বলল, কিছু দেখেছিলেন নাকি ?

চক্কোত্তি একটু হাসলেন।...আজ শুক্কুরবার। গত বুধবার রাত তখন নটা-টটা হবে, গোপালের চায়ের দোকানে বসে আছি। কলকাতার বাসটা এসে একটু থেমেই চলে গেল। ওখানটাতে অন্ধকার ছিল। কে একজন নেমেছিল। হনহন করে চলে গেল। মনে হল, বীরু। গোপাল বলল, বীরু কেন হবে ? তার ফেরার কথা শুক্কুরবার।

গোপাল বলল !

গোপাল বলল। চক্কোত্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকে বললেন।... গোপালই গণ্ডগোলে ফেলে দিয়েছিল আমাকে। নইলে আমি বীরুকে ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম। ধাঁধাটা কাটছিল না তবু। আসলে গোপালই—

কৃপাসিন্ধু গলার ভেতর বলল, হুঁ।

চক্কোত্তি একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, তোমার সাত বিঘে,তারকের দশ বিঘে, আব্দুল ঠিকেদারের তিন বিঘে, হলধরের পাঁচ বিঘে—আরও যেন কার-কার জমির ধান জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বর্গাদাররা বারোয়ারিতলায় খামার করেছিল। বীরুই এসব করিয়েছিল। পুলিশ মজা দেখছিল দূরে দাঁড়িয়ে।

কৃপাসিন্ধু চাপা ও রুক্ষ স্বরে বলল, কী আজেবাজে বলছেন!

চক্কোত্তি একই সুরে বললেন, বর্গারেকর্ডের বছরও বীরু নিজে মাঠে মাঠে ঘুরে জে এল আর ও'র সঙ্গে—

আপনি থামুন তো।

চক্কোত্তি অনড়-অটল থেকে বললেন, বুধবার রাতে গোপালের ওখানে আরও ক'জনা বসে ছিল। আমি বীরুর নাম করার পরই তারা উঠে গিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি, বীরুর পেছনে সব-সময় ওত পেতে বেড়াচ্ছিল খুনীরা তবে দোষ আমারই খেপু। কেন আমার পোড়া মুখে বীরুর নামটা বেরিয়ে গেল তখন—আমি তো স্পষ্ট করে তাকে চিনতে পারিনি? আমি 'বীরু না কি' না বললে ওরা ছুটে যেত না। ওকে কিডন্যাপ্‌ড্‌ করে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে ঢোক গিলে থেমে গেলেন চক্কোত্তি।

কৃপাসিন্ধু চক্কোত্তির সামনেই সিগারেট খায়। পাঠশালার গুরুমশাই ছিলেন, তবু। কাঁপা কাঁপা হাতে বালিশের পাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করছিল সে। সিগারেট জেবলে দেখল, চক্কোত্তি চোখ মুছছেন। সে ধোঁয়ার মধ্যে বলল, চা খান জ্যাঠামশাই।

ইচ্ছে করছে না বাবা। ভাঙা গলায় রাখহরি চক্কোত্তি বললেন। যতবার ভাবছি, বীরুর মাথাটা কোথায় নিয়ে আসছিল ওরা, ততবার খালি মনে হচ্ছে, মাখনের হতভাগী মেয়েটা কি সইতে পারত? যত গোঁয়ার হোক, মেয়েছেলের মন বাবা খেপু, বড় কোমল।

কৃপাসিন্ধু সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তাহলে নালায় ফেলল কেন মাথাটা?

ভয়ে। বীরুর আত্মা এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল। বলে চক্কোত্তি উঠলেন। আরও কিছু বলবেন ভাবলেন। তারপর কয়েক পা

এগিয়ে দরজার কাছে গিয়ে ঘুরলেন হঠাৎ। বললেন সাবির জন্য যত কষ্ট নইলে—

চক্কোত্তি পর্দা তুলে বেরিয়ে গেলে কৃপাসিন্ধু আপনমনে বলল, কষ্ট তো সে যেচে নিয়েছিল।···

অনেক রাতে, রত্না ঘুম ভেঙে টের পেল কৃপাসিন্ধু বিছানায় নেই। তারপর দেখল দক্ষিণের জানালা খোলা। বাইরে কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নার একটা ফিকে হলুদ ফালি বুকে নিয়ে বসে আছে কৃপাসিন্ধু। রত্না কিছু বলল না। অন্যপাশে ঘুরে চোখ বুজল।

বুধবার রাত থেকে এক বিভীষিকার সঙ্গে লড়াই চলছে কৃপাসিন্ধুর। বুড়োতলার নালায় অসংখ্য জন্ম-মৃত্যুর রক্ত আর আর অনেক চোখের জলে ভেজা গ্রামীণ অবচেতনার ঐতিহ্যগত খুব পুরনো ওই বিভীষিকার অনেক চেহারা। বুধবার রাত থেকে সে কাটা মুণ্ডুর রূপ নিয়েছে।

কাটা মুণ্ডু, তোমার নাম কী?

বীরু।

কাটা মুণ্ডু, তোমার দেশ কোথায়?

দোগাছিয়া।

কাটা মুণ্ডু তোমাকে কাটল কে?

খেপু।

কৃপাসিন্ধু বোবাধরা গলায় বলে, খেপু না, খেপু না। তারক হলধর আব্দুল কৃপাসিন্ধু···

সরাইখানা

মেহগিনিতলায় গোলাপি ওত পেতে বসেছিল। শাড়ির আড়ালে বগলদাবা একটা ছাগলছানা, কুচকুচে কালো। এ বয়সে বড্ড বেশি ছটফটে। কিন্তু যে-গোলাপি আজ সকালেও তার জন্য মায়ের আদর নকল করেছে, সেই গোলাপির হাতে এখন নিষ্ঠুরতা। নিষ্পলক চোখের তারা কোণঠাসা করে শাদারঙের মোটরগাড়িটা দেখছিল, দূরে। গাড়িটা, শাদা রঙের গতিশীল জিনিসটা সবুজ মাঠের পারিপার্শ্বিকে প্রচণ্ড চোখে পড়ে। যত কাছে আসে, গোলাপির সঙ্গে তার একটা হিংস্রতার কার্য-কারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কাছাকাছি এসে পড়তেই সে ছাগলছানাটা গড়িয়ে ফেলার ভঙ্গিতে সামনে ছুঁড়ে দেয়। ব্রেকের বিচ্ছিরি শব্দ হয়, তারপর শাদা মোটরগাড়িটা এসব কিছুই নয়, এমন একটা ভাব দেখিয়ে ছিটকে চলে। আর গোলাপির গলা শিবতলার ছোট্ট বাজার ভিড়-ভাট্টা ছিঁড়েখুঁড়ে গনগনে নীল আকাশে নখের আঁচড় কাটতে থাকে, মেরে দিলে গো! জানে মেরে দিলে গো! বাটপাড় হারামি গাড়িওলা গো! এর সঙ্গে পোঁচের পর পোঁচ কুচুটে কান্না দিন-দুপুরের ঝলমলে বাজার জায়গাকে শোকে কালো করার চেষ্টা।

অমনি অ্যাকশন শুরু। একটা দঙ্গল বাজারের দিকে হৈ রৈ মার মার কাট কাট তুলকালাম জুড়ে দেয়। তদুপরি বাম্প। বাম্প ডিঙিয়ে চলা মরিয়া বেচারা গাড়িটার, ঝকঝকে শাদা গতিশীল জিনিসটার সামনে, খানিকটা তফাতে ফটাস ফটাস আওয়াজ দিতে দিতে অন্তত খানতিনেক কাঠের বেঞ্চি পড়ে। সড়ক দফতরের খালি একটা পিচের ড্রামও ঢন ঢন করে গড়িয়ে আসে। বেঞ্চিগুলো অবশ্য চায়ের দোকানের। জাতীয় মহাসড়কের এখানটাতে ঐতিহ্য-সম্মত ব্যারিকেড।

কাজেই গাড়িটা থেমে যায়। চারদিক ঘিরে মারমূর্তি ছেলেছোকরার দল, নেতার নাম কালী। আর থ্যাঁতলানো রক্তাক্ত ছানাটি বুকে নিয়ে এবার দৌড়ে আসছে শোকাকুলা গোলাপি,

মুখের বিলাপে হিংসুটে খিস্তি। চেরা চোখে ঝরঝরিয়ে জল। শাড়ি রক্তে মাখামাখি।

গাড়িচালানো যুবকের চোখে সানগ্লাস। সেটা খুলে ঘটনার ব্যাখ্যা দেবার জন্য মুখ খুলতেই হুঙ্কার, সেই সঙ্গে গাড়িটারও পেটে লাথি, ভড়কে গিয়ে পার্স বের করে। টুকটুকে ফর্সা গোল-গাল পুতুল চেহারা, গর্দানে থলথলে মাংস বচ্চনছাঁটের আড়ালে বেরিয়ে পড়ছিল, কারণ দুপুরবেলায় আজ হাওয়াটা খুবঝাঁপালো। পাশে তার সঙ্গিনী, তারও চোখে সানগ্লাস। ফুরফুরে চুল উড়ছিল। কালীর দলের যারা তার পাশে, তারা সুগন্ধে জ্বালা-পোড়া হচ্ছিল, কিঞ্চিৎ ভাজা-ভাজাও। ফলেওইদিক থেকে হাঁকরানি উঠল, টাকা দ্যাখায়! টাকা! বাটপাড়ি করে···ইঃ! মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্ত্তি মেরে···এই শুনে যুবতীর গাল লাল এবং ইংরেজিতে আধো-আধো বলে, ব্ল্যাকমেলিং! ডোণ্ট বদার অ্যাবাউট মানি, প্লি-ই-ই-জ!

যুবকটি শক্ত মুখে তার পাশের দলটিকে বলে, কত দিতে হবে?

দলটি হাঁকে, গোলাপি! তখন গোলাপি তার বুকেধরা রক্তাক্ত ছোট্ট প্রাণীটিকে দেখিয়ে চিলচ্যাঁচানিতে বলে তুমরাই বিচের করো। ইটা বড হত। খাসি হত। খাসি হলে ই বাজারে কা রেট হয়, হিসেব করো!

কালীর দল একগলায় হাঁকে, হাজার হয়। পাঁচশোতে রফা।

যুবকটি ভিড়ে 'ভদ্রলোক' খুঁজতে চেষ্টা করে। কিছু-কিছু চোখে পড়ে, এদিকে-ওদিকে, তবে তফাতে। সে তাঁদের ডাকবে ভাবছিল। কিন্তু মুখগুলো পাষাণখোদাই। পেছনে একটা বাস কানফোঁড় আওয়াজ দিচ্ছে। তার পেছনে ট্রাক, টেম্পো। বাসের কন্ডাক্টার জ্যামের কারণ খুঁজতে এসে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, কী ঝুটঝামেলা করেন সার? সেটেল করে লিন না। যুবকের সঙ্গিনী ফের বলে ওঠে, ডোণ্ট বদার অ্যাবাউট মানি! এবার কথাগুলো ফোঁপানিতে ভিজে। সুতরাং পাঁচখানি একশো এগিয়ে দেয় তার প্রেমিক।

কালী গম্ভীর ডাকে, গোলাপি। এবার সে ঈষৎ শালীন হয়

গাড়িওলা সম্পর্কে। বলে, সার যা দিচ্ছেন, লিয়ে লে। তখন গোলাপি নোটগুলো অনিচ্ছার ভঙ্গিতে নেয়। কান্নাটা ছিল। ওদিকে ব্যারিকেডও উঠতে শুরু করেছে। টিনের ড্রাম ঢনঢন করতে করতে সরে যাচ্ছে। শাদা মোটরগাড়িটা ছাড়া পেয়ে প্রথমে আস্তে পরে দ্বিতীয় বাম্প ডিঙিয়ে আচমকা পিছলে চলে। গতিটি রুষ্ট দেখায়। বুঝে গেছে গট-আপ কেস। আর কালীর দল কেমন গম্ভীর, হাসা উচিত ছিল এবার। স্বাভাবিকই ছিল। কালী প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেছে আসলে। পাঁ-চ-শো দিয়ে দিল? সত্যিই দিয়ে দিল! কালীর দলও মুখ তাকাতাকি করে।

পানবিড়ির দোকানের মোজাম্মেল হ্যা হ্যা করে হাসছিল। তার সামনে দিয়ে যাবার সময় গোলাপি মুখ ঝামটা দেয়, এত হাসি কিসের রে? যার গেল, তার গেল। তোদের কী?

এই কথায় কাপট্যের সঙ্গে কিছু সত্যিকার শোকও ছিল। আহা রে! আজ সকালেও সবুজ ঘাসের ওপর কালো ছাগলটানাটার প্রজাপতি-নাচ দেখেছিল। বটতলার পেছনে গভীর নয়ানজুলির বুকে বাঁধ। ওপারে উঁচু টাঁড় জমি। সেখানে সারবন্দি কয়েকটা ছোট মাটির ঘরের একটি গোলাপিবালার। সামনে একটুকরো করে খটখটে ন্যাড়া উঠোন। সেখানে কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। গোলাপিকে ফিরতে দেখে যে-যার কাজে হাত লাগায়।

গোলাপি লাল-কালো মাংসের দলাটা নয়ানজুলির খাদের জলে ছুঁড়ে ফেলে। এবার সে গম্ভীর, শক্ত মুখ। কারণ একটু পরেই একটা হ্যাপা-সামলাতে হবে। টাকার অঙ্কটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে। সেও খুব অবাক হয়েছিল। চলতে চলতে আনমনে ভাবছিল, গাড়িওলা বাবুরা এত টাকা কোথায় পায়? খোলামকুচি টাকা? সঙ্গে একটা মেয়ে ছিল! এতগুলো টাকা দেওয়ার সেও একটা কারণ হয়তো। বাবুরা, গাড়িওলা বাবুরা মেয়ে নিয়ে স্ফূর্তি ওড়াতে যায়, কালীর কাছেই শুনেছিল। বোঝা যাচ্ছে, কথাটা খুবই সত্যি। নোটগুলো ব্লাউসের ভেতর থেকে ছোট্ট অর্ধবৃত্তাকার পার্স বের করে কাঁপা-কাঁপা হাতে গুঁজে দেয় গোলাপি।

একটু পরে এসে নয়ানজুলির বাঁধের যে দিকটাতে

গভীর জল, রক্তমাখা কাপড় ধুতে গোলাপি হুড়মুড়িয়ে নেমে যাবে।...

এই ধান্দাটা প্রথম মাথায় আসে গত বর্ষার এক বিকেলবেলায়। গোলাপির দুটো হাঁস ছিল। নয়ানজুলির জলে দিনমান চরত। কী খেয়ালে একটা হাঁস উঠে গিয়ে আত্মহত্যা করে। গাড়িটির মালিক ছিলেন এক প্রৌঢ় মারোয়াড়ি। হয়তো জীবহত্যার পাপের কারণের চেয়ে বড় এক কারণ ছিল সামনে রথযাত্রার ভিড়। নিজে থেকে কুড়ি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কালীর দল এসে পড়ে। গোলাপিরও বুদ্ধি খুলে যায়। পঞ্চাশ বলে চিলচিৎকার ছাড়তে ছাড়তে শেষে মোটরগাড়ির পেটে কালীর দলের লাথি, এবং ভয়-কাতুরে থলথলে মাংসের প্রকাণ্ড পিণ্ডটি তিরিশ ওগরায়। সন্ধ্যায় সেদিন গোলাপির ঘরে ফিস্টি হয়েছিল। লালু নিজের পয়সায় একটা বোতলও এনেছিল। গোলাপি হাঁসটার ন্যায্য দামবাবদ পনের পায়। তবে বৃষ্টির সন্ধ্যায় একলা মেয়ে গোলাপির সেই প্রথম শক্ত মাটি আবিষ্কার, যেখানে দাঁড়িয়ে সে জোর লড়তে পারে।

মাসখানেক পরে সেই আত্মহত্যাকারীর সঙ্গিনীটিকে ইচ্ছে করেই গোলাপি নিষ্ঠুর মুখে একটা নীলরঙের মোটরগাড়ির সামনে ফেলে দেয়।

শিবতলার বাজারে বর্ষা থেকে শরৎকাল জাতীয় মহাসড়কের দশা শোচনীয় ফর্দাফাঁই। আর গোলাপির গলাটাও বড্ড বেশি খর। এই দুর্ঘটনার গাড়ির বাবুটি ছিলেন রাগী মারকুটে চেহারার লোক। পরনে লাল শার্ট, শাদা প্যাণ্ট।

তর্কাতর্কি করতে করতে বেরুনোর চেষ্টাতেই জানলার কাচ ভাঙল, তার সঙ্গে চোয়ালে কালীর ঘুসি। ভিড়ের বাবুরা বেগতিক বুঝে পঞ্চাশে রফার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

লালশার্টপরা বাবু মাইল পাঁচেক এগিয়ে থানায় বলতে গিয়ে উল্টে ধমক খান। তাছাড়া ডায়রি লেখার লোকও নাকি ছিল না। তবে বাবুটির জেদ ছিল। কলকাতায় ফিরে একটা কিছু করেন এবং থানা থেকে এক দারোগাবাবু আসেন তদন্তে। সেখানেই শেষ।

কালীর বাবা হরিনাথের একটি ধাবা আছে শিবতলার মোড়ের কাছে। জাতীয় সড়ক বা মহাসড়ক যখন, তখন দূরপাল্লার মাল-বোঝাই ট্রাক চলাচল স্বাভাবিক। মধ্যযুগের সরাইখানাগুলোর চেহারা-চরিত্র ধাবায় বর্তেছে। এখন শুধু তফাত, বণিক-সওদাগরের দল শহরে-গঞ্জে গদিতেই আঁটো হয়ে বসে থাকেন। উট-গাধা-খচ্চরের কারাভাঁর বদলে ট্রাক-টেম্পোর ঝাঁক গড়িয়ে চলে। চলতে চলতে ক্লান্ত চালক আর তাদের সঙ্গীরা হরিনাথের ধাবায় জিরেন খেয়ে যায়। জিরেন খাওয়া মানেই নানারকমের খাওয়া, ভাত-রুটি-মাংস-মদ এবং মেয়েমানুষও। গোলাপির মা ফুরনকেও হরিনাথ পাতে তুলে দিত। ফুরনের মতো মেয়ে হয় না। কোনকিছুতে না বলতে জানত না, অথবা বলতে পারতই না। হরিনাথ তাকে দিয়ে চোলাই তৈরি করাত। ফুরনের রাঁধুনিপ্রতিভার তুলনা ছিল না।

কিন্তু ফুরন অকালে পুড়েছে চিতের আগুনে। হরিনাথের পুড়তে দেরি হচ্ছে। এখনও পাষাণ-পাথর মানুষ। থানার বাবুরা, আবগারি বাবুরা, পার্টির বাবুরা সবাই তাকে নমস্কার করেন। মধুর হেসে বলেন, খবর কী, হরিবাবু? হরিনাথও শিবতলায় ক্রমে ক্রমে বাবু হয়েছে। তার একটাই ভীষণ দুঃখ, কালীটা মানুষ হল না। মেজাজে থাকলে বলে, তুই আমার ব্যাটা না, শালা। বেরো বেজম্মা, চলে যা!

কালীরও মেজাজ হয় কোনও-কোনও সময়ে। বলে, শালা, বাবা আছ, আছ। আর একটা কথা বললে ঘেঁটি ধরে খালে ফেলে দোব।

হরিনাথ ফুরনের গার্জেন ছিল, সেই স্বত্ববলে গোলাপিবালারও গার্জেন। তাকে পাতে দেবার সাধ কালীর হুঙ্কারে ক্রমশ ঘুচে গেছে। তবে ফুরন ছিল এক, তার পেটের মেয়ে গোলাপি আরেক প্রাণী। হরিনাথ ভেবেই পায় না, কেন ওই কালকুট্টি বাঁকামুখীর নাম ফুরন গোলাপিবালা রেখেছিল! গো-লা-পি-বা-লা! হরিনাথ তার ধাবার সামনে দাঁড়িয়ে কুচুটে দৃষ্টিতে টাঁড় জমির ছোট্ট বসতি-টিকে দেখে। তখন গোলাপি উঠোনে দাঁড়িয়ে বিকেলের রোদে চুল শুকোচ্ছিল। শুধু ওই চুলই আছে, আর কী? ওতেই কালী হারামজাদা মজে গেল, এইরকম সন্দেহ হয় হরিনাথের। এসব

সময় গোলাপি এসে মরা মায়ের লাইনে বরাবরকার মতো বাবা ডাকলে হরিনাথ তাকে থাপ্পড় মারবেই মারবে, তাতে কালী তাকে নয়ানজুলির জলে ফেলে তো, তাও ফেলুক ! আর সহ্য হয় না ।

ওই টাঁড়ের ওপর হরিনাথের চোলাই তৈরির ডেরা, কাঁটাগুল্মের ভেতর চালাঘর। সামনে কয়েকটি বছরেই ঝাঁপালো হয়ে ওঠা আকাশমণির আড়াল। এই ফুলেল তরু ঝটপট বেড়ে ওঠে। হরিনাথ বনসৃজন প্রকল্পের ব্যাপারটা বুঝেছিল. পাষাণ নিরামিষ মূর্তির মানুষ হলেও বুদ্ধির দীপ্তি তার কাজকর্মে ঝলমলায়। শুধু গোলাপির বেলায় দীপ্তি প্রতিহত হল। কালীর জন্য, একান্তই কালীর জন্য ! হরিনাথ কতবার আভাসে বলেছে, ওরে গাধা, রামপাঁঠা ! আমি মলে সকলই তোর। এই ধাবা. একতলা বাড়ি, পয়সাকড়ি। কখনও জড়িয়ে-মড়িয়ে মাতালদশায় বলেছে. কালী। তোর এই বাবাকে শালারা আড়ালে বলে জাতনাশা হোরে। তুই যদি বাবার ব্যাটা হবি. বড় জাতের মেয়ে উঠিয়ে আন. দেখি। যাঃ ! নিয়ে আয়, দেখি তোর মুরোদ। হুঁঃ, তুই বড় বীর হয়েছিস শুনি। কর দেখি এই কাজটা. তবে বুঝি।...আর যদি বলিস. বাবা ! তুমি এনে দাও, দেখি। বল্, মুখ ফুটে বল্। তাও পারি।

শেষে টাঁড়ের দিকে আঙুল তুলে বলে. তাই বলে ওই ফুরনের মেয়ে যদি এসংসারে আসে. জ্বালিয়ে দোব ! পেটরোল এনে জ্বালিয়ে দোব। হুই দ্যাখ, রতনবাবুর পাম্প। দেখছিস ?'

কালী তার মাতাল বাবার জামার কলার খামচে ধরে বলেছিল. ফের যদি এই কথা শুনি, বাবা-টাবা মানব না। শালা নেমকহারাম।

খাটিয়া থেকে সর্দারজিদের একজন উঠে গিয়ে ছাড়িয়ে দেয়। না গেলেও কালী ছেড়ে দিত। বাবার সঙ্গে এর বেশি লড়তে তার বাধে। লোকেরা আড়ালে হাসাহাসি করবে, এটা একটা কারণ। আরেকটা কারণ অবশ্য আছে। ধাবা ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর। এই মহাসড়কে অনেক ধাবা আছে কালী দেখেছে ধাবাওলাদের খুন হয়ে পড়ে থাকার ঘটনা আকছার ঘটে। হরিনাথের কিছু ঘটলে তার ঘাড়েই দায়টা পড়বে। ভাবতেই কেমন কষ্ট হয় কালীর। গা ঘুলোয়। তার নেমকহারাম বাবাটা বুঝেও বোঝে না, তাকে কে আড়াল থেকে সবসময় গার্ড

দিচ্ছে। এও বোঝে না, কালী শিবতলা থেকে সরে গেলেই চাঁদুবাবুর দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কালীর দল শিবতলা বাজার দখলে রেখেছে তিন বছর ধরে। ফলে হরিনাথকে আর একটা পয়সাও বাড়তি খোয়াতে হয় না। আবগারি, থানা, পার্টির বাবুদের কথা আলাদা। আর চাঁদুবাবুর দলের খাঁকতির বহর কত ছিল, হরিনাথ জানে। জেনেও ভুলে থাকে। সেই জামার কলার ধরার দিন কালী কেন আস্তে নেমকহারাম বলে চলে গিয়েছিল, মাতাল হরিনাথ বোঝেনি, এ একটা দুঃখ কালীর।...

লম্বা উঁচু টাঁড় জমিটার শেষদিকটায় সাবেকি শিবতলা গ্রাম। নিচের সমতলে পঞ্চায়েতের কৃৎকৌশলের তৈরি রাস্তা, যেটি বাজারগামী। লাল হয়ে আছে সুরকি গুঁড়োয়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে গোলাপি রাস্তাটি পেরোয়। সামনে চাঁদুবাবুর বাড়ির গেট। ভেতরে ফুলবাগিচার সৌন্দর্য। চোখে চোখ পড়তেই চাঁদুবাবুর ভুরু কুঁচকে যায়। গলার ভেতর বলেন, কী রে?

গোলাপি একটু হাসে। বাবুর কাছে এলাম। রাখলে রাখুন, মারলে মরুন।

কালীর ফাঁদ ভেবে একটু দোনামনায় পড়ে যান চাঁদুবাবু। বলেন, জার্মান! শোন তো কী বলে। জার্মান বাইরের বারান্দায় তাঁর মোটরসাইকেল সাফ করছিল। করতে করতে মুখ ঘুরিয়ে দেখে সেও অবাক।

গোলাপি বলে, গেট খুলে দিবি না কি রে? এমন করে তাকাচ্ছে, যেন আমি এক ভূত না টাঁড়ের পেত্নী।

জার্মান খ্যা খ্যা হাসে এবার। জানেন বাবুদা? গোলাপি আজ পাঁচশো টাকা আদায় করে ছেড়েছে। এইটুকুন একটা ছাগলের বাচ্চা। পারে মাইরি!

উঠে এসে গেটটা অবশ্য খুলে দেয়। গোলাপি ঘন্টাখানেকের মধ্যে বড় খবর হয়েছে। চাঁদুবাবু খবর এবং ফাঁদ, এ দুয়ের মধ্যে জেরবার। কারণ ফুরন আর তার মেয়ে এক নয়। জার্মানটা আবার গেটও খুলে দিল। শেষে ঠিক করেন, ফাঁদ তো ফাঁদই। বাজিয়ে দেখা যাক। বারান্দার চেয়ারে হেলান দিয়ে বলেন, কী? কালী কেড়ে

নিয়েছে তো ? তোর মা চিনত বাপব্যাটাকে। তুই চিনিসনি! এতে আমি কী করব, বল ?

গোলাপি ফিসফিসয়ে বলে, গোলামকে দিয়ে খবর পঠিয়েছে, সন্ধেবেলা ফিস্টি করতে আসবে। বাবুর কাছে এই নোট চারখানা রাখতে এলাম। নৈলে পরে হারামির পাল সবগুলানই খচ্চা করিয়ে ছাড়বে। কালী কিচ্ছু বলবে না, জানেন বাবু ? বলতে পারবেই না।

চাঁদুবাবু ফাঁদ পরীক্ষার ছলে বলেন, থাপ্পড় খাবি। কালী তোর বডিগার্ড !

বুঝলেন না! গোলাপি মুখটা করুণ করে বলে। হারামির পাল মাতাল হলে কালী সামলাতেই পারে না। পাঁচখানা লোটই খচ্চা না করিয়ে ছাড়বে না। আর কালীকে তখন কিছু বলতে গেলেই বলবে, ছেড়ে দে! সে ফুঁপিয়ে ওঠে। নাক মুছে বলে, ইদিকে যার গেল তার গেল। এইটুকুন থেকে পেলেপুষে এতবড়টা করলাম। দুটো বিয়োলে। মুখবাগে তাকাতে পারছি না, বাবু গো !

সে ছাগলটির কথা বলছিল। চাঁদুবাবু হাসেন এতক্ষণে। বলেন, টাকা যে রাখতে এলি, না হয় রাখলাম। সন্ধ্যাবেলার আসরে শুওরের বাচ্চাগুলোকে সমলাবি কেমন করে ? যদি বলে, পুরোটাই ঝাড়। যদি তোকে—

গোলাপি ততক্ষণে তার বুকের কাছ থেকে ছোট্ট পার্সটি বের করেছে। চারখানা একশো হাতে গুঁজে দিতেই বাবু চুপ। জার্মান আবার মোটরসাইকেলে ন্যাকড়া-কানি প্রয়োগ করছে। মুখ ঘুরিয়ে গম্ভীর তাকায়। গোলাপি ভিজে চোখ কটমটিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে, এই ছোঁড়াটাকে সামলান বাবু। ওদের কানে গেলেই আমার শতেক খোয়ার হবে।

জার্মান বলে, আরে না না! তোর মাথাখারাপ ? আদায়-কাঁচ-কলায় সম্পক্ক।

একথা বলার কারণ, সে বুঝেছিল বাবু ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। কালীকে টিট করার জন্য বাবু কত তাল করে বেড়াচ্ছেন, সে সবই জানে! বিশেষ কথা, সে বাবুর বডিগার্ড। বাবু ঘুম

থেকে উঠে ফের ঘুমুতে ঘরে ঢোকা পর্যন্ত যা-যা করেন, যেখানে-যেখানে যাতায়াত, কথাবার্তা, সকলই তার চেতনায় থাকবন্দি সাজানো আছে।

শুধু এই খবরটা তার জানার উপায় ছিল না যে, এই গোলাপির মা ফুরনও বাবুর কাছে টাকাকড়ি লুকোতে আসত। কারণ তখন সে ছিল হাফপেন্টুলান পরা বালক। কাজেই ফুরনের মেয়ে হয়েও কালীকে লুকিয়ে কালীরই শত্রুপক্ষের লিডারের কাছে টাকা রাখতে এসেছে, এই ঘটনা তাকে ভড়কে দিয়েছিল।

গোলাপি পাখির পায়ে চলে গেলে চন্দ্রকান্ত ওরফে চাঁদুবাবু খিকখিক করে হাসেন। বুঝলি জার্মান? কালীহারামির সঙ্গে গোলাপির একটা কিছু বেধেছে। গন্ধ পাচ্ছি। বাধুক! গোলাপি ফুরন নয়। ফুরনকে দেখিসনি তুই?

দেখেছি। জার্মান আনমনাহয়ে বলে। কষ্ট পেয়ে মরেছিল, তাও শুনেছি।

হুঁ, হোরে ওকে ধাবায় ভাড়া খাটাত। চাঁদুবাবু মহাপুরুষের গলায় হরিনাথের পাপের বৃত্তান্ত শোনাতে থাকেন। শেষে শ্বাস ছেড়ে জ্ঞানীর গলায় বলেন, হোরেরও সেই দশা হবে রে, দেখে নিস। আগে কেলোর একটা ব্যবস্থা করতে দে, তারপর দেখবি।

জার্মান আস্তে বলে, কবে তাকে অ্যাদ্দিন···খালি আপনি—

চাঁদুবাবু থামিয়ে দেন। ধুস্ শালা! খালি এক কথা তোর··· সবসময়। আগে-পরে ভাবিস না।

ভাবাভাবির কী আছে?

বডিগার্ডের চ্যালেঞ্জ শুনে বাবু ফের হাসেন। ওরে! মেড়া লড়ে খুঁটির জোরে। কালীর খুঁটির কথা ভাবিস না। খালি ওই কথা।

কালীর খুঁটির কথা মনে পড়ায় হঠাৎ-রুষ্ট বডিগার্ড চুপ করে যায়! ঠিকই বলেছেন বাবু। সে ভাবতে থাকে। বড় বড় খুঁটি ধরেছে কালী। থানার দারোগা-পুলিশও তার দিকে পা বাড়াতে ভয় পায়। এমন কি ওই খুঁটির কারণেই বাবুর দল থেকে তার প্রিয় বন্ধুরা একজন-দু'জন করে খসে কালীর পায়ের তলার জড়ো হল! কিন্তু জার্মান এক বাপের জন্মো। বাবু তাকে এইটুকু বয়স

থেকে মানুষ করেছেন। বাবু তাকে দয়া করে ঠাঁই না দিলে তাকে রিকশো চালিয়ে খেতে হত। কারণ তার বাবা ছিল এক রিকশো-ওলা তার চেয়ে বড় কথা, তারাপুরের মাঠে এক সন্ধ্যাবেলায় বাবুর ওপর হামলা ঠেকিয়েছিল জার্মান, দুখানা বোম ঝাড়তেই আত-তায়ীরা নিপাত্তা হয়ে যায় এবং বাবু বাড়িফিরে কাঁদেন আর তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আজ থেকে তুই আমার মায়ের পেটের ভাই-রে ! দাদা ডাকবি। বাবু তখন মাতাল বটে, কান্নাটা ছিল ভয়ের। বাবু পৃথিবীর বিপজ্জনক বলতে শুধু একটি জিনিসই বোঝেন, তা হল নিজের মরণ। জার্মান কিন্তু নিজের মরণকে ভয় পায় না। এজন্যই কালী. কালীর দল কেন, এলাকার সমস্ত খুনে আর বোম-বাজরাই জার্মানকে ভয় পায়, জার্ম্যানের নিজের সিদ্ধান্ত এরকম।…

গোলাপি লাল রাস্তাটি পাখির পায়ে ডিঙিয়ে কেয়াঝাড়ের টাঁড়ের ঢালে উঠে আপন মনে হাসছিল। সে জানত, চাঁদুবাবু টাকাগুলো রাখবেন। তার মাও এমনি করে বাবুর কাছে টাকা জমা রাখত। মায়ের মরার পর বাবুই গোপনে তাকে ডেকে পাঠিয়ে চল্লিশটে টাকা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোর মায়ের টাকা।

সেই থেকে চাঁদুবাবুকে সে মনে-মনে শেষ আশ্রয় গণ্য করে। কালী তাকে নিজের বাবার হাত থেকে ‘গাড’ দিলেও দলের ছোঁড়া-দের প্রতি বড্ড নরম। তাই বলে এমন নরম নয় যে, দলের কেউ গোলাপিকে ছুঁতে হাত বাড়ালে চুপ করে থাকবে বা বলবে, ছেড়ে দে ! টাকাকড়ির বেলায় যেমন বলেছিল।

এটাই কালীর অপছন্দের একটা দিক গোলাপির কাছে। বাদ-বাকি সবই পছন্দ। কালী ইচ্ছে করলেই তাকে শুতে ডাকতে পারে, ডাকে না। একবার গোলাপি কয়েক ঢোক চোলাই গিলতে বাধ্য হয়েছিল কালীর জেদে। প্রথমে অপছন্দের ব্যাপার হলেও পরে খুব মজা পেয়েছিল এবং সিনেমার নাচন নাচার খুব ইচ্ছেও চাগিয়ে উঠেছিল। শেষে কিছু না পেয়ে চাঁদের আলোয় কালীকে হঠকারী উন্মাদনাবশে টানতে গিয়েই ধমক খেল। অ্যাই ছুঁড়ি। তোর নেশা হয়েছে। ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়। এই বলে কড়া হুকুমের সঙ্গে হাসতে হাসতে বলেছিল,তোকে কে লেবে ? তাতে গোলাপিপ্রথমে রেগেযায়,

শেষে নেশা কমলে একলা ঘরে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল, লজ্জায় পরিতাপে। সকলের সামনে কী কেলেংকারি করে বসেছে। সত্যিই তো সে কালীকে প্রেম বিলোতে চায়নি। আর তোকে কে লেবে? দুঃখে মাথা ভাঙতে ইচ্ছে করে। কালী তার 'গাড'। কিন্তু কালী তার প্রেমিক নয় সেটা পরে জানল। ফলে সেও কালীর প্রেমিকা নয়। যাকে অবশেষে প্রেমিক হিসেবে তার পছন্দ হল সে কালীর ভয়ে কাছ ঘেঁষতে পারে না। কালী জানলে তাকে শিবতলা বাজার থেকে হয়তো ছুঁড়ে ফেলবে, এই তার ভয়। কারণ সে বোকার মতো ভাবে, কালী গোলাপিকে 'গাড' দেয় বলেই গোলাপি কালীর সঙ্গে শোয়। গোলাপি ঠারে-ঠোরে কতবার তার বিস্কুট পাউরুটির দোকানে বসে খাঁটি প্রেম বোঝাতে চেষ্টা করেছে, বুঝেছে প্রেম ষোলআনা পাওয়ার চান্স আছে এখানে। কিন্তু ওই ভয়। বড্ড ভিতু আর বোকা ওই হান্নাদা—হরেন।···

টাঁড়ের মাথায় যে-কয়েক ঘর বসতি, তার বাসিন্দারা কেউ কেউ রিকশো চালায়। কেউ কেউ ট্রাক-টেম্পোর মজুর। হরির চোলাই কারখানারও কর্মী-কর্মিনীআছে তাদের মধ্যে। ধাবার জিরেনখাওয়া ড্রাইভারদের খাদ্যদ্রব্য নারী শরীরও এই বসতি-জাত। বিকেল থেকে সেই শরীরগুলোর সাজগোজের ঘটা পড়ে যায়। বাঁকা চোখে তাদের ব্যাপার-স্যাপার দেখতে গিয়েই গোলাপি শোনে, নয়ানজুলির ওপারে মহাসড়কের ধারে একটা কান্নাকাটি হচ্ছে, যেখানে কালীর বাবার ধাবা। দিনের শেষ আলোয় থোক-থোক ভিড়ও চোখে পড়ে। মানুষ চাপা পড়ল নাকি, এই ভেবে গোলাপি পা পাড়ায়। বাঁধ থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে সোয়াগিকে সবে উঠতে দেখে বলে, একসিডেং নাকি রে? হারামি ডাইভারগুলান দিনে তারা দেখছে। আমার অমন সোন্দর দুধের ছানাটা!

সোয়াগি, ফ্রকপরা বালিকা ফুঁপিয়ে উঠে বলে, কালীদার বাবা গো!

খুশিতে গোলাপি লাফ দিতে দিতে নামে বাঁধে। চাপা পড়েছে তো? বেশ হয়েছে। বেদের মরন সাপের হাতে!

সোয়াগি ফোঁসফোঁস করে বলে, না গো গোলাপিদি! এমনি মরেছে। চ্যারে বসে ছিল। হঠাৎ পড়ে গেছে। ডাক্তার এসে বললে,

ইস্টোক।

গোলাপি থমকে দাঁড়ায়। ঠিক করতে পারে না, খুশি হবে না দুঃখিত হবে। বাবার ধাবায় কালী এবার বসবে, নাকি সত্যিই বসবে না, যেমন বলেছিল, 'ধাবা না ভাগাড়, শালা! ইচ্ছে করে, দিই বোম মেরে উড়িয়ে। আমার বাবাটা এক ঢ্যামনা!' ধাবায় যদি বসে, কালী কি বদলে যাবে? হরিনাথ হয়ে উঠবে? ধাবা চালাতে হলে তা তাকে হতেই হবে, যতই বড়-বড় কথা মুখে ঝাড়ুক।

ধাবাকে বড় ভয় গোলাপির, সেই ফ্রকপরা বয়স থেকেই। মায়ের অনেকটাই মনে পড়ে যায়। এও মনে পড়ে, মা তাকে কীভাবে মুর্গিবাচ্চার মতো আগলে রাখত। মরণকালেও বলেছিল, গোপ-গাঁয়ে পালিয়ে যাস। সেখানে তোর বাবা থাকে।

কিন্তু খানকি হয়েও স্বামীর নাম বলেনি, এমন ধর্মভয়! অথবা বলতে গিয়ে মরণ গলা চেপে ধরেছিল। অ্যঁক আওয়াজ উঠেছিল, এবং খেঁচুনি, স্পষ্ট মনে পড়ে।

হিম, গম্ভীর গোলাপি ধাবায় যায়। সবে খাটিয়ায় উঠেছে হরিনাথ পাশে টেম্পো তৈরি। টাঁড়ের খানকিরা চেরাগলায় সুর ধরে শোনার মতো একটা কান্না কাঁদছে। খাটিয়ার ফুলের ভেতর হরিনাথের মুখ দেখে মনে হয়, মরেনি। ওই পাষাণ মুখ মরার পরও একই থেকে গেল। খাটিয়ায় কালীর দল কাঁধ লাগাতেই প্রথমে গোলাপির মনে হয়, এত ফুল এল কোত্থেকে এবং শেষে হরধ্বনি, খানকিদের শোকের চূড়ান্ত চ্যাঁচানি, এসবের ধাক্কা খেয়েই গোলাপি চিক্কুর ছাড়ল, নিজের অবশে, ও বাবা—আ-আ! বাবা গো—ও-ও!

কিংবা ফুরনের আত্মা মেয়ের আত্মায় খুঁচিয়ে দিয়েছিল। খোঁচা খেয়ে একটা অনেকদিনের চাপা যন্ত্রণা শরৎকালের দিনশেষে বেরিয়ে গেল। গোলাপির কান্না আর থামতে চায় না। কেঁদে বড় সুখ এতদিনে।···

বাবা মরার ঘণ্টা তিনেক আগে কালী মনে খুব জোর দিয়ে কামনা করেছিল, বাবাটা মরে যাক। মরলেই যখের ধনের মালিক

হবে এবং একটা শাদা মোটরগাড়ি কিনবে। চোখে সানগ্লাস, পাশে সেন্টমাখানো মেয়েছেলে। জাতীয় মহাসড়কে স্বপ্নকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে দূর থেকে দূরে। পার্সের ভেতর অগুনতি নোট।

তিন ঘণ্টা পরে সত্যিই বাবা মরে অবাক করেছিল তাকে। আরও অবাক, যখের ধনটা নিছক মায়া। তিন মাইল দূরের গ্রামীণ ব্যাংকের একটা পাসবইতে হাজার দুয়েক টাকা, ধাবার ক্যাশবাক্সোতে শ'দেড়েক, আর বস্তায় চালডাল আলু কুমড়ো এইসব। দুতিনটে দিনেই কালী বুঝে ফেলে, একতালা দু-ঘরের বাড়িই হরিনাথের জীবনের সব কড়ির রূপান্তর। সংলগ্ন ধাবা ঘরটা দরমা বাতা, টালি, বাঁশের খুঁটি এসব জিনিসে তৈরি। কয়েকটা কাঠের বেঞ্চ, খানকতক খাটিয়া। বস্তুত হোটেল, চোলাই ও মেয়েমানুষ পরিবেশনের কারণে প্রাচীনযুগের সরাইখানাই বটে। কেউ বলে ধাবা, বেশি বলে 'ঠেক।' শেষে কালী ভাবছিল বেচে দেবে পছন্দসই কাউকে এবং চাঁদুবাবুর মতো ট্যাকসো আদায় করবে মাঝে-সাঝে।

কিন্তু চারদিনের দিন সকালবেলায় কানে এল, চা-সন্দেশের দোকানের যশোদা হোটেল খুলবে, তার মানেই 'ঠেক', এবং কালী ঠাণ্ডা মাথায় বাবার ধাবায় বসে হুকুম পাঠাল যশোদার কাছে, যেখানে আছ, সেখানেই থাকো। পা বাড়ালে ঝাড় খাবে। যশোদা জিভ কেটে বলেছিল, ই কী কথা, ই কী কথা? যা আছে, তাই নিয়েই ঝামেলা ওসব উড়ো কথা কারা রটাচ্ছে বলো দিকিনি?

টাঁড়ের খানকিরা খুশি হয়েছিল। তাদের ধারণা, পাষাণ হোরেবাবুর চাইতে কেলো ছোঁড়াটা কম বুঝদার, তাছাড়া জ্যান্ত মানুষ। আর অমন কাঠখোদাই চেহারার সৌন্দর্য, ভিড়ের ভেতর চোখে পড়ার যোগ্য, বুকে পেলে নারীজীবন বর্তে যেত। কিন্তু পোড়াকপাল, নারীজীবন বলতে যেসবভাল জিনিস বোঝায়, তাদের মধ্যে আর ছিঁটেফোঁটাও নেই। পাষাণ যখটাকে নাকি নিজের পেটটাকে শাপমন্যি করবে, ঠিক করা কঠিন। টাঁড়ের কঠিন গুল্মকণ্টকিত বুকে দূর দূর থেকে কত নারীজীবন এসেছে, ছিবড়ে হয়ে নেতিয়ে পঞ্চভূতে মিশে গেছে, জাতীয় মহাসড়কের এমন টান, টাঁড় থেকে ছিটকে এসে পড়তেই হবে। এ সড়ক এক অজগর

সাপ।

আর কালীও দিনে দিনে বুঝতে পারছিল, বউ ছেড়ে চব্বিশঘণ্টা রাস্তায় চলা জীবন যাদের, তাদের এই ঠেক দরকার, তার চেয়ে আরও দরকার মেয়েমানুষ। তবেই মাথা ঠান্ডা থাকবে, স্টিয়ারিং ধরা হাত বেগড়বাঁই করবে না। এভাবে ক্রমে ক্রমে কালীর আত্মায় আসলে হরির আত্মা ঢুকে পড়ছিল, একপা দুপা তিনপা করে, চতুর প্রাণীর পায়ে। অথবা যেভাবে সাপ ঢোকে। ফলে কালীর ক্রমশ চোখে পড়ছিল, তার বাবা পুরোদস্তুর একটা বড় সংসার গড়ে তুলেছিল, একটা পরিবার বলা চলে। এই বড় জিনিসটার মালিক এখন সে, কালীনাথ। শিগগির তাকে বাবু ডাক শুরু হয়ে যাবে, ঠিক তার বাবারই মতো। কালী সবদিক সমঝে চলছিল। বিশু, কেতো, লোটন, কানু, গ্যাঁদা এইসব নামের পৌনে পাঁচ ফুট থেকে ছ ফুট উচ্চতার বিপজ্জনক দ্বিপদ প্রাণীগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে শিবতলা বাজারে ঘুরত, এখন ধাবায় কেন্দ্রীভূত। কালী এতদিনে মাটি পেয়েছে অথবা নিয়েছে যখন, তখনও তাদেরও এটা মাটি পাওয়ার ঘটনা। হরির রেখে যাওয়া ধাবা দেখতে দেখতে একটা জমকালো চেহারা পেয়ে যায়। জেল্লা বাড়তে থাকে দিনে দিনে। এবার কালীর ইচ্ছে, নিজেই একটা গ্যারেজ গড়বে।

গোলাপি প্রথম প্রথম ভাবত, ঢঙ। কালী তার এত চেনা, হরিতে কালীর রূপান্তর কল্পনায় ছিল না। দু সপ্তা'র মধ্যে গোলাপির চোখে ব্যাপারটা খাঁটি দেখায়। একতিল মেকি নয়, এ কালী সত্যিই হরি। গোলাপি তারপর ভড়কে যায়। সতর্ক হতে থাকে, এই বুঝি কখন ধাবা থেকে রাতের ডাক আসবে!

বিস্কুটওলা হরেনের কাছে ভয়ের কথাটা, ঠারেঠোরে প্রেমের কথা তোলার পুরনো ভঙ্গিতেই একদিন তোলে গোলাপি। বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিল আসলে। ও হনাদা, বড্ড ভয় লাগে! এই বলে সূত্রপাত হয় কথাটার।

হরেন মিটি মিটি হেসে বলে, ক্যানে? তুমার ভয় কিসের অ্যাদ্দিনে? কালী তো তুমার গাড।

কালী বাবার টাটে বসল।

বাবার টাটে ছেলে বসবে না তো কি তুমি বসবে? হরেন

খুবই হাসে।

গোলাপি রাগ করে বলে, হেসো না তো! ইদিকে আমার যা হবার হচ্ছে।

হচ্ছেটা কী শুনি, বলো।

গোলাপি আস্তে বলে, কালীর বাবা আমার মাকে খানকি করেছিল। আমি খানকি হবো, বলো তুমি?

ও। এই কথা? হরেন গুম হয়ে যায়। একটু পরে কেমন হাসে সে। বলে, টাকাগুলান কী কল্লে? অতগুলান টাকা! কালী শালারা কেড়ে না নিয়ে থাকলে—সে হঠাৎ চুপ করে!

টাকার খবর ক্যানে? গোলাপী খুব অবাক হয়েছিল।

গম্ভীর হরেন বলে, ছাগলটা বেচেখুচে দাও। আরও অনেক টাকা হবে।

তা'পরে?

টাউনে-ফাউনে চলে যাও। হরেন তেতো মুখে পরামর্শ দেয়। ই শালা শিবতলায় মানুষ থাকে? আমারই মাঝেমাঝে মনে হয় কী পালিয়ে বাঁচি। কিন্তু সাধ্যি নাই। বাবা-মা, নাবালক ভাইগুলান, উদিকে তুমার বোনটার বিয়ে দিলাম তো জ্বালাপোড়া খেয়ে ফেরত এল।

হরেন খুব অন্তরঙ্গ হয়েছিল এই সাতসকালে। সবে হেমন্তের হলদে আভা লেগেছে চারপাশে। হাওয়ার গরম ঝাঁঝটা নেই। বরং মধুর হিম। মানুষজনও এসময় কম। বাজারের শেষমুড়োয় তার এই ঘুপচি দোকান, বিশতিরিশ টাকাও পুঁজি নয়। পেছন দিক-টায় মাটির ঘর, খড়ের চালের ফুটো ঢেকে রিলিফের তেরপল চাপানো। এই উঁচু তল্লাটে বানবন্যা হয় না, তবু রিলিফের জিনিসপত্র কীভাবে এসে পৌঁছয়। ধাপবন্দি ধানখেতের পর দূরে নাবাল মাটিতে অথৈ জল এখনও, সেটাই কারণ হতে পারে এই সরকারি করুণার। তাছাড়া পার্টির বাবুরা আছেন। শিবতলা গ্রামেই এম এল এ বাবুর পৈতৃক ভিটে।

সব শুনে আস্তে করে শ্বাস ছাড়ে গোলাপি। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে বলে, আচ্ছা হন্নাদা! গোপীনাথপুর কোথা গো, চেনো?

গোপীনাথপুর? হরেন ভেবেচিন্তে বলে, ক্যানে? এক গোপ-

নাথপুর শুনেছি সেই নলহাটির কাছে। আরেকটা হল তুমার ঢিপেডাঙ্গা-গোপীনাথপুর। সেও অনেক দূর। গোলাপি চলে যাচ্ছে দেখে সে বলে, ক্যানে উ কথা?

গোলাপি বলে, এমনি।

আনমনা, শেষে হঠকারিতায় কালীর ধাবার দিকে যায় সে। অন্যমুড়োয় ধাবা। পুরনো সড়কের ধনুক-বাঁকা অংশটা এখন পোড়ো। সড়ক সোজা হয়েছে যেখানে, তার লাগোয়া ধাবা. পোড়ো সড়কে তিনটে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কলকব্জা বিগড়ে গেলে ওখানেই রতনবাবুর গ্যারেজের লোকেরা সারাতে আসে। ওখানেই খানকিদের পাতে পরিবেশন করত হরিনাথ। তাকাতে ঘেন্না করে গোলাপির। কালীও তাই করে চলেছে। ভাবতে গিয়ে কষ্ট হয়, সেই কালী!

ধাবার পেছনে সড়ক আইনবাঁচিয়ে হরিনাথের ঝকমকে একতলা বাড়ি নয়ানজুলিতে সরু বাঁধ এখানেও। টাঁড়ে যাওয়ার বাঁধ আর এই বাঁধের মাঝখানের জলাটা সড়ক দফতরের ইজারা দেওয়া ফিশারিজ কোঅপারেটিভের অনেকগুলো জলার একটুকরো। এই টুকরোর উৎপাদন অনেকটাই হরির ধাবায় যেত, কালীর দলের প্রতি সেলামিস্বরূপ। বাঁধ পেরিয়ে যেতে যেতে গোলাপি আনমনে ভাবছিল, কালীর ধাবায় এবার মাছগুলো পুরোটাই যাচ্ছে কি না। হেমন্তের শুরুতে এই সদ্য সকালে চৌকো জলটা করুণ চোখে তাকিয়ে আছে মনে হয়। পাকা ঘাট বানিয়ে গেছে হরি। ধাপে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছিল কালীনাথ, পরনে ডোরাকাটা পাজামা আর গেঞ্জি। একদলা ফেনা মুখ থেকে ফেলে ভুরু কুঁচকে বলে কী রে? খুব সতীসাবিত্তিরি হয়েছিস। দেখা দিস না।

গোলাপি নরম হাসে। তুমি এখন বাবু হয়েছ, তোমাকেই দেখতে পাই না।

কালী ঘাটের জলে মুখ ধোয়। তারপর ভিজে মুখে বলে, কদিন থেকে তোর কথা ভাবছিলাম।

সে বাড়ি ঢুকছিল। গোলাপি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ধক করে উঠেছিল বুকের ভেতরটা। যেচে পড়ে বাঘের গুহায় ঢুকতে এল! তাকে দাঁড়াতে দেখে কালী বলে, আয় কথা আছে।

গোলাপি কাঁপতে কাঁপতে বাড়িটাতে ঢোকে। চৌকাঠে একটু ঠোক্করও লাগে পায়ে। রবার স্লিপারের একটা ফিতে ছিঁড়ে যায় এত সহজেই। উঠোনে গিয়ে স্লিপার দুটো খুলে হাতে নেয় সে। বারান্দায় কালী তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বলে টাকাগুলোন কী করলি ?

সেই হরেনের মতোই কথা ! টাকার খবর। গোলাপি আল-গোছে নিচের ঠোঁট কামড়ে বলে, তুমার কি টাকার অভাব ? ভারি তো পাঁচখানা লোট। পেট নাই, পরনে কিছু দোব না—হুঃ ! সাধআহ্লাদও থাকতে নাই মানুষের ! যেখানে যাই, খালি এককথা, টাকাগুলোন কী করলি···টাকাগুলোন কী কল্লি !

কালী একটু হাসে। শাড়ি কিনেছিস দেখছি। চেহারা খুলে গেছে, মাইরি ! বলে গম্ভীর হয় হঠাৎ। আমার ধাবায় লক্ষিশালা পানসিগারেট বেচত। ঘেঁটি ধরে তাড়িয়ে দিয়েছি, জানিস ?

গোলাপি লক্ষ করেনি। অবাক হওয়ার ভান করে বলে, ক্যানে ?

শালা চাঁদুবাবুর লোক ছিল। কালী চুল আঁচড়ায় চিরুনি দিয়ে। আমার বাবাটাকে তো জানিস, সাপ চিনত না, বিষেল না না ঢোঁড়া। তুই ধাবায় পানসিগারেটের দোকান দে। বেশি পুঁজি লাগে না। কত আছে হাতে ?

গোলাপি ঢোক গিলে শুকনো গলায় বলে, ব্যাংকের লোঙে ছাগল কিনেছি। শোধ দিতে হল না ?

লোনটা পাইয়ে দিয়েছিল কালীই। তবে পার্টির বাবুরা বলে-ছিলেন, শোধের জন্য ভাববার কিছু নেই। কালীও তাই ভেবে রেখেছিল। এমন কথা শুনে সে চটে যায়। বলে, আমাকে না জানিয়ে শোধ দিতে গেলি ? তোকে মাইরি···মেয়েছেলে না হলে ···দাঁড়া ! খবর নিচ্ছি, লোন শুধেছিস না কী করেছিস।

সে ঘরে ঢুকে প্যান্ট পরতে থাকে। গোলাপি উঠোনে শক্ত কাঠের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধাবায় পানসিগারেটের দোকানের প্রস্তাবটা সে মনে মনে বাজিয়ে দেখছিল। বিপজ্জনক দিকটাও চোখে পড়ছিল। সেজেগুজে ঘর থেকে বেরিয়ে কালী দরজায় তালা আঁটে। তখন গোলাপি বাঁকা হেসে বলে, তুমি এখন ধাবার মালিক হয়েছ। গরজ তুমারই। তুমি পুঁজি দাও।

কালীও হাসে। তবে বাঁকা নয়, সিধে। বলে, ব্যাংকের লোন শুধেছিস। এখন ছাগল তোর। আবার একখানা অ্যাকসিডেন করে দে। তেমন গাড়ি হলে হাজার পেয়ে যাবি।

ওরে আমায়! ছটফটিয়ে ওঠে গোলাপি। জন্মের পর একটা ছানা মরেহেজে গিয়ে ওই একটা ছিল। এখন মা-ছাগলটার জন্য তার মনে মমতার সাগর। বলে, বলেছ ভাল! নিজের পালা জিনিস হলে কষ্টটা বুঝতে।

কালী থাপ্পড় তোলে। চালাকি? পালা জিনিস, খুব কষ্ট হয়, না? ই কালীর চোখ সব দিকে জানিস?

গোলাপির মুখ নামিয়ে আঙুলে আঁচলের খুঁট জড়ায়।

কালী বলে, বাবা মরার দিন চাঁদুশালার বাড়ি গিয়েছিলি।

গোলাপি তাকায়। বুকের ভেতর ধড়াস করে শব্দ। এমনি করে একটার পর একটা থাপ্পড় খেতে যেচে এল, কী বোকামি!

তোর পায়ে সুরকির রঙ দেখেছিলাম। কালী গলার ভেতর বলে। আমার বাবাটা ছিল গাধা। তোর মায়র পায়ে সুরকির রঙ লেগে থাকত। আমি দেখেছি। মায়ের লাইন ধরেছিস।

গোলাপি ফুঁপিয়ে ওঠে। একটা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কালীর মুখটা দেখে ভয়ে থেমে যায়।

কালী পা বাড়িয়ে বলে, ট্যাঁড়ে ক্যানে, ইশিবতলা বাজারে থাকত হলে কালীর অডার মানতে হবে। তুই আমার ধাবায় পানসিগারেটের দোকান দিবি। তোর পানিশমেং। তারপরও যদি পায়ে সুরকির রঙ দেখি—

গোলাপি হাহাকারের মতো বলে, তুমার ধাবা। তুমি করে দাও দোকান।

তোর পানিশমেং। আঙুল তোলে কালী। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। সদরদরজায় তালা আঁটার সময় গোলাপি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ানো, ভেতরে কান্নার চাপ। বাঁধে গিয়ে কালী ফের বলে, পানিশমেং। ছাগলটার অ্যাকসিডেং কর। দোকানের পুঁজি পাইয়ে দোব।

গোলাপি ডুকরে কাঁদে এবার। তা পরে বলবে খানকি হ।

কালী ঘুরে তার আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে-শরীর জরিপ

করার ভঙ্গিতে দেখে নিয়ে হঠাৎ হাসে। তোকে কে লেবে? বলেই চলে যায় ধাবার দিকে। সেই পুরনো কথা, তোকে কে লেবে?' গোলাপি কাঁদতে থাকে।...

এবারকার গাড়িটার রঙ ছিল লাল টুককুকে। এদিন শিবতলা বাজারে হাটবারও ছিল! কালীর দল ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৈরি হয়েই ছিল। মেহগিনিতলায় গোলাপি, তার কালো ছাগলটা হাঁটুর পাশে মুখ তুলে পাতা খাচ্ছে, গোলাপির হাতে পাতাভরা একটা ছোট্ট ডাল। বাম্পের আগেই ব্রেককষার তীক্ষ্ম শব্দ ফলে তৈরি দলটা হই হই করে তেড়ে এল। পাবলিক প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। পরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে দৌড়ে এল। কালীর দল থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রক্তাক্ত জিনিসটা মানুষ। একটা মেয়েমানুষ। ফুরনের মেয়ে গোলাপিবালা।

ছাগলটা মেহগিনি ছায়ায় আপনমনে পাতা চিবুচ্ছে। লাল টুকটুকে মোটরগাড়ি বুড়োবুড়ি যুবতী কাচ্চাবাচ্চা সমেত একটা পরিবারে ঠাসা। ড্রাইভারকে টেনে নামিয়ে প্যাঁদানো চলত; কিন্তু জাতীয় সড়কে ছাগল পড়ার বদলে গোলাপি পড়াটা কালীর দলকে ধাঁধায় ফেলেছিল। এছাড়া গাড়ির ভেতরে ভয়ার্ত স্ত্রীলোক আর শিশুর কান্না। পাবলিক চেঁচিয়ে উঠেছিল, মার! মার! জ্বালিয়ে দে! কালীর দলের বিশু দু হাত তুলে গর্জায়, চোপ শালারা! চো-ও-প! সে বুঝতে পেরেছিল. অ্যাকসিডেং নয়।

কালীর কাছে খবর গেলে সে ফোঁস করে শুধু একটি শ্বাস ছাড়ে। আজকাল তার মুখে হরির পাষাণ মুখের ছাপ, এবং সেই রাত্রেধাবায় ড্রাইভারদের পাতে যেমাংস পরিবেশিত হয়, তা বস্তুত একটি ছাগলের। গোলাপি মহকুমা শহরের মর্গে তখনও শুয়ে আছে, সেলাইকরা মাংস। এতদিনে প্রকৃতই বেওয়ারিশ। কারণ কালী আর তার গার্ড নয়। কে তোকে লেবে, গোলাপি?...

অপরিচিতা

কনকনে শীতের সন্ধ্যায় খেয়ানৌকোতে নদী পেরিয়ে যদি শোনা যায়, গঞ্জ থেকে শেষ বাস এইমাত্র ছেড়ে গেছি, তখন বেপরোয়া হয়ে একটা কিছু করতে ইচ্ছে হয়। শচীশ কিছু করার আগে সামনে যে চায়ির দোকানটা দেখল, সেখানেই সটান গিয়ে ঢুকল।

ঘাটের মাথায় ছোট্ট একটা বাজার বলে বিদ্যুতের ঝলমলানি আছে। কিন্তু প্রচণ্ড হিমে সবকিছুতে কেমন একটা আচ্ছন্নতা, একটা নিঝুম ভাব। অল্পসল্প লোকজন এ-দোকান সে-দোকানে পুটুলির মতো বসে আছে। কথাবার্তা বলছে কিনা বোঝা যায় না।

চায়ের দোকানটার বাইরে খানিকটা চটের ছাউনি, তলায় বাঁশ-বাতার বেঞ্চি। ভেতরেও সংকীর্ণ কুঠুরিতে আড়াআড়ি দুটো বেঞ্চি সে দুটোই সত্যিকার বেঞ্চি। কারণ দুটোই কাঠের তৈরি। শচীশকে ঢুকতে কুঁজো হতে হলো। তবে ভেতরটায় যথেষ্ট ওম, যা সে আশা করেছিল।

জনা তিন সাধারণ চেহারা ও পোশাকের গ্রাম্য লোক পাগুলো বেঞ্চিতে তুলে বসে চা খাচ্ছিল। শচীশকে দেখে তারা সমীহ করে পা নামাল। অথবা এটাই গ্রাম-গঞ্জের মানুষজনের ভদ্রতা। কেতা-দুরস্ত আফিসার চেহারার লোক দেখলেও অবশ্য এমন করা হয়, শচীশ দেখেছে।

চাওয়ালাকে বলার দরকার ছিল না। এমন ঠান্ডা-হিম সন্ধ্যায় গরম চা হাতে পেয়ে কেউ ফিরিয়ে দেবে না, সে জানে। তবে যত্ন করে ধুয়ে কাপ প্লেট বের করে চা দিল শচীশকে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে শচীশ লক্ষ্য করল, লোকগুলো আড়চোখে তাকে দেখছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলাও বন্ধ করেছে। শচীশের মনে হলো, তাকে কি এখানকার পরিবেশে মানাচ্ছে না, অথবা হোমরাচোমরা

দেখাচ্ছে? কিছু বলা উচিত ভেবে সে বলল, এখানে হোটেল-ফোটেল কিছু আছে?

জবাবটা চাওয়ালা দিল। আছে স্যার! ওই যে দেখছেন মধুর হোটেল।

রাত্তিরে থাকার জায়গা পাওয়া যায়?

এবার চারজন লোকই একসঙ্গে হাসবার চেষ্টা করল। একজন বলল, আজ্ঞে, এ কি আপনাদের টাউন পেয়েছেন? হোটেল মানে দিনসবরে গিয়ে ঢুকলে খাওয়াদাওয়াটা করা যায়, এই পর্যন্ত। রাত্তিরে খেতে হলে আগে-ভাগে মধুকে বলতে হবে।

চাওয়ালা বলল, স্যারের আসা হচ্ছে কোত্থেকে?

শচীশ আনমনে বলল, তারাতলায় গিয়েছিলাম। এসে শুনলাম লাস্ট বাস ছেড়ে গেছে।

স্যার কি ব্লক অফিসের লোক?

নাঃ। শচীশ সিগারেট বের করে বলল কেন?

চাওয়ালা হাসল। তাহলে রিকশো করে চলে যেতে পারতেন। ভাড়া বেশি চাইত, এই যা।

শচীশ এককথায় বলল, আমি বহরমপুরে থাকি।

সমিস্যে। বলে চাওয়ালা চায়ের উনুনে হাত দুটো সেঁকতে থাকল। তার ভঙ্গীটা এমন, যেন সে শচীশের জন্য একটা কিছু ভাবছে বা ভেবে কূল পাচ্ছে না।

আগের লোকটি বলল, খেতে হলে মধুকে অর্ডার দিয়ে আসা ভাল। বোধ করি, বললে পরে থাকার ব্যবস্থাও করে দেবে। তবে পয়সার লোভ বড্ড বেশি।

সে খি খি করে জাড়কাতুরে হাসি হাসল। আর ঠিক এই সময় হঠাৎ-খুবই আচমকা শচীশের মনে পড়ে গেল তারাপদর কথা।

এই তো সেই বাবুগঞ্জ! বাবুগঞ্জে তারাপদর বাড়ি। কলেজে সহপাঠী ছিল শচীশের। সাদাসিধে গোবেচারা ধরনের মুখচোরা ছেলে ছিল। দুবছর পরে কলেজ ছেড়ে দেয়। কেন দেয়, কী ঘটেছিল, শচীশের জানা নেই। সে প্রায়ই শচীশকে বাবুগঞ্জে তাদের বাড়ি বেড়াতে আসার জন্য অনুরোধ করত। শচীশের আসা হয়নি।

তার জীবনটাও তো বদলে গিয়েছিল।

একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে শচীশ বলল, আচ্ছা. এখানে তারাপদ নামে কেউ আছে ?

চাওয়ালাই বলল. দুজন আছে স্যার ! একজন হলো তারাপদ মিস্তিরি, আরেকজন তারাপদ মজুমদার কোন তারাপদর কথা বলছেন ? এ বলে আমায় দ্যাখ্, ও বলে আমায় দ্যাখ্। দুই-ই সমান।

বেঞ্চির লোকেরা ফের হাসবার চেষ্টা করল। আসলে এত বেশি ঠাণ্ডায় তাদের অভ্যাসজনিত গল্পগুজবের এবং যখন তখন হেসে ওঠার চেষ্টা বৃথা। চায়ের দোকানে তারা আড্ডা জমাতেই তো আসে। এদিন বিকালে থেকেই শীতের মতিগতি খারাপ। দিনে উত্তরে হাওয়াটা বেড়ে গিয়েছিলে। সেই যেন সব ঠান্ডা ঝোঁটিয়ে জড়ো করে এই গঞ্জে রেখে গেছে। ঘাটের মাথায় পাকুড় গাছের তলায় এতক্ষণে আগুন জ্বালিয়ে একদঙ্গল লোক গোল হয়ে বসল।

তারাপদ মিস্তিরি নিশ্চয় নয়, শচীশ দ্রুত সিদ্ধান্ত করল। কলেজে পড়তে গিয়েছিল যে, দেশের অবস্থা অনুসারে তার মিস্তিরি পদবি হওয়া উচিত নয়। মজুমদারই হবে। এই ভেবে সে উঠে দাঁড়াল। বলল, তারপদ মজুমদারের বাড়িটা কোথায় ?

বেঞ্চির একজন বলল, বরঞ্চ একটা রিকশো করে যান। গঞ্জের একেবারে শেষ মাথায়। তাছাড়া ওদিকটাতে এখনও ইলেকট্রিরি যায়নি। আঁধারে রাস্তা ঠিক করতে পারবেন না। তার চেয়ে বড় কথা, তারু মজুমদারের ব্যাপার।

রিকশোওয়ালারা যাবেই না। একে ঠাণ্ডা, তার ওপর রাস্তা নাকি ভীষণ খারাপ। কিন্তু শচীশ মরিয়া হয়েই আছে। একটা কিছু করতেই হবে। গ্রামগঞ্জে একটা লম্বা শীতের রাত শুধু সোয়েটার গায়ে কাটানোর কথা ভাবতে তার আতঙ্ক হচ্ছে। পাঁচটা টাকা দিতে চাইলে একজন দোনামনা করে রাজি হলো।

কিন্তু সত্যিই রাস্তা বেজায় খারাপ। কবে ইটের খোয়া পড়েছিল। এখন খানাখন্দে বিচ্ছির অবস্থা। টিমটিমে বাতির আলোয় আবছা যেটুকু দেখা যাচ্ছিল, শচীশ বুঝল কেন ওরা এ রাস্তায়

আসতে নারাজ। রিকশোওয়ালা সিট থেকে নেমে কুঁজো হয়ে টানছে। শচীশ তার দশা দেখে নিজের বিবেককে চাঁটি মারতে থাকল। মানুষ হয়ে মানুষকে গায়ের জোরে বয়ে নিয়ে যাওয়া নিশ্চয় বড্ড খারাপ কাজ। তবে সাইকেল রিকশো যেহেতু যন্ত্রের মধ্যে পড়ে, অত কিছু খারাপ লাগে না। কিন্তু এখন যা ঘটছে, তা সত্যিই একটা সামাজিক অপরাধ এবং সেই অপরাধ করছে শচীশ! একটা বাঁকের মুখে সে বলে উঠল, ওহে! রোখো. রোখো! বরং আমি হেঁটে যাই, তুমি এখানে রিকশো রেখে আমাকে শুধু বাড়িটা চিনিয়ে দিয়ে এসো।

রিকশোওয়ালা নিশ্চয় ভাবল, বাবু তার টাকা মেরে দেবার মতলবে আছেন। সে কানই করল না শচীশের কথায়। শুধু বলল, বসে থাকুন না। ওই তো এসে পড়েছি।

দুধারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। সামনে একটু দূরে আলো দেখা যাচ্ছিল। আলোর কাছাকাছি গিয়ে রিকশোওয়ালা হাঁকল, বড়বাবু নাকি? এই দেখুন, আপনাদের বাড়ি সওয়ারি এনেছি!

জীর্ণ একতলা একটা বাড়ির বারান্দায় লণ্ঠন জেবলে এক বৃদ্ধ কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে ছিলেন। খুব ব্যস্ত হয়ে নেমে এলেন থপথপিয়ে। এক হাতে ছড়ি, অন্য হাতে সেই লণ্ঠনটা। উঁচু করে তুলে শচীশকে দেখতে দেখতে সহাস্যে বললেন. সেই কখন থেকে বসে আছি আসবে-আসবে করে। তারু বলে গেছে, যদি কাজে আটকে ফিরতে না পারে, তোমার কোনো অসুবিধে যেন না হয়।

শচীশ রিকশো থেকে নেমে কিটব্যাগটা নামিয়ে রিকশোওয়ালাকে কথামতো একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়েই চমকে উঠেছিল। ব্যাপারটা কী?

বৃদ্ধ রিকশোওয়ালাকে চেনার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু সে যেন কী একটা আঁচ করে কেটে পড়ল, বৃদ্ধ বললেন, ওকে টাকা দিলে নাকি, বাবা? ঠিক করেনি। তারুর বলা আছে সব।

শচীশ এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মরিয়া হয়ে গেল। লম্বা একটা শীতের রাত্তির? খাওয়া না জুটুক, শরীর ঢাকা দিয়ে শোয়াটাই জরুরি। সে বৃদ্ধের পায়ের ধুলো নিল। আশীর্বাদ পেয়ে আস্তে বলল, লাস্ট বাস এখানে কখন পৌঁছয়?

বৃদ্ধ বললেন, কটা বাজে এখন ?

পৌনে সাতটা।

তাহলে আসার সময় হয়ে এল। তুমি বোধ করি আগের ট্রিপে ? বৃদ্ধ পা বাড়িয়ে বললেন। এস বাবা, ভেতরে এস। ঠান্ডাটা আজ যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেল।

বারান্দায় উঠে শচীশ দেখল, ঘরের দরজায় এক যুবতী বড় বড় চোখে তাকে দেখছে। ঘোমটা খোঁপায় আটকে গেছে। শচীশ একটু হেসে বলল, নমস্কার।

বৃদ্ধ বললেন, বউমা ? শিগগির আগে একটু চা-ফা-করে দাও। ঠান্ডায় বাবা আমার খুব কষ্ট পেয়েছে।

তারাপদ মজুমদারের বউ খোঁপায় আটকে পড়া ঘোমটাটা মাথায় টেনে দ্রুত ভেতরে চলে গেল। শচীশ দেখল, ঘরের ভেতর একধারে একটা তক্তাপোশে বিছানা পাতা, নতুন বেডকভার। মাঝখানে একটা টেবিলে, চারটে নড়বড়ে পুরনো চেয়ার। টেবিলে নকশাদার প্ল্যাস্টিকের কভার। একটা অ্যাশট্রেও রাখা আছে। কার আসার কথা আছে আজ ?

বৃদ্ধ বললেন, একেবারে তক্তাপোশে উঠে বোসো বাবা ! কম্বল রাখা আছে। মুড়ি দিয়ে বসো। চা-ফা খেয়ে নাও। তারপরে জল গরম করে দিচ্ছে খন। হাতমুখ ধুয়ে নেবে। উঁহু, সংকোচ কোরো না। তারুর বন্ধু তুমি,আমাদের আপনজন। বসো, বসো।

বাইরের দরজা এঁটে দিয়ে টেবিলে হেরিকেন রেখে বৃদ্ধ ভেতরে চলে গেলেন। শচীশ এবার একটু উদ্বিগ্ন হলো। সাতটার বাসটা এসে আর এ রাত্তিরে যাচ্ছে না। সেটার ভেতর কুঁকড়ে বসে ঘণ্টা দশেক সময় কাটানো কি তেমন কঠিন হত ? কিংবা সেই হোটেলওয়ালা মধুকে বলে একটা ব্যবস্থা করাও নিশ্চয় যেত।

তার চেয়ে বড় কথা, স্মৃতি শত্রুতা করছে না তো ? তার সহপাঠী তারাপদর বাড়ি সত্যিই কি এই বাবুগঞ্জে ছিল-নাকি অন্য কোনো গঞ্জে ? এ জেলায় নদনদীর তীরে গঞ্জযুক্ত নাম অনেক আছে।

তা কেন ? শচীশ একটু নড়ে বসল। এই তারপদ সেই তার-

পদই বটে এবং এমন হতে পারে, আজ তার কোনো এক বন্ধুর আসার কথা আছে। তারাপদর বন্ধু শচীশ ছাড়া আর যে ছিল না বা নেই, এমন তো হতে পারে না?

অতএব তারাপদর সেই প্রতীক্ষিত বন্ধু যদি এসেই পড়ে, এবং তারাপদও এসে পড়ে, বরং দারুণ হাসাহাসির ব্যাপার হবে। প্রচণ্ড জমেও যাবে। শুধু একটাই উদ্বেগ থেকে যাচ্ছে, প্রতীক্ষিত লোকটি আগে এসে পড়লে শচীশের ভাগ্যে কী ঘটবে—এবং যদি তারাপদ দৈবাৎ না ফিরতে পারে?

শচীশ প্রতারক হয়ে উঠবে, এবং···

শিউরে উঠল শচীশ। ঠিক করল, বরং তার চেয়ে এখনই সব কথা বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে খুলে বলা উচিত। তারপর গতিক বুঝলে চলে যাবে। অগত্যা সেই বাসটার ভেতর, কিংবা মধুর হোটেলে ব্যবস্থা করে নেবে। সে বৃদ্ধের ফেরার প্রতীক্ষায় বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ভেতর থেকে প্রচণ্ড কাসির শব্দ ভেসে এল। শ্লেষ্মাজড়িত কাসি। শুনতে যেমন বিরক্তিকর, তেমনি কষ্টকরও। শচীশের একটা সিগারেট টানতে ইচ্ছে করছিল। সিগারেট তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। কিন্তু হঠাৎ তারাপদর বাবা এসে পড়বেন ভেবে সে ইতস্তত করছিল। বাইরের পৃথিবীতে একটা প্রচণ্ড হিমনিঝুম নৈঃশব্দ্য—এত বেশি নৈঃশব্দ্য, যেন গাঢ় থকথকে পাঁক, খাবলে তোলা যায়। তারাপদর সেই বন্ধু এলে শচীশ মুহূর্তে টের পেয়ে যাবে এবং তৈরি হবে একটা দ্রুত মীমাংসার জন্য। সে কান করে আছে।

আপনার চা।

শচীশ তাকিয়েই ছিল। তারাপদর বউ ভেতরের দরজা থেকে এগিয়ে এসে টেবিলে তার দিকে চায়ের কাপ-প্লেট রাখছে, এটা পর্দায় ঘটা একটা চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মতো—যার বাইরে সে যেন এক দর্শক। শচীশ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে হাসবার চেষ্টা করল।

তারাপদর বউ ফের আস্তে বলল, জল গরম করা আছে। হাত-মুখ ধুয়ে নেবেন।

সে চলে যাচ্ছিল। শচীশ ডাকল, শুনুন। তখন ঘুরে দাঁড়াল।

শচীশ বলল, আপনার শ্বশুরমশাই কোথায় গেলেন ?

তারপদর বউ মুখটা একটু নামিয়ে বলল, শরীর খারাপ করছে। হাঁপানির রুগী। কতবার বারণ করলাম, অমন করে বাইরে বসবেন না ঠাণ্ডায়। কিন্তু নিজের ছেলেকে এমন—মরুক গে, আমি কী করব ?

শচীশ চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বলল, ক্ষমা করবেন। এই ঠাণ্ডায় গরম চা ফেলে চলে যেতে ইচ্ছে করছে না। নৈলে চলেই যেতাম।

তারাপদর বউ কথাটা শুনে চমকে উঠে বলল, চলে যেতেন ? কেন ? আপনার অসুবিধে হচ্ছে ?

শচীশ কষ্ট করে হাসল।…একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে আর কী !

তারাপদর বউ ভুরু কুঁচকে তাকাল। কিসের গণ্ডগোল ? আপনারা যার প্রতীক্ষা করছিলেন, সে আমি নই !

কেন যেন, এ কথায় একটু হাসল তারাপদর বউ। বলল, বুঝলাম না !

আপনার স্বামী যার আসার কথা বলেছিলেন সে আমি নই—অন্য কেউ। শচীশ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল। আসলে তারাপদ নামে আমার এক বন্ধু আছে। এখানেই তার বাড়ি-সবই ঠিক। কিন্তু আমি আমার সেই বন্ধু তারাপদর বাড়ি দৈবাৎ এসে পড়েছি। লাস্ট বাস ফেল করে হঠাৎ—

ভেতর থেকে বৃদ্ধের শ্লেষ্মা জড়ানো গলার ডাক ভেসে এল, বউমা ! বউমা !

তারাপদর বউ দ্রুত ভেতরে চলে গেল।

শচীশ দ্রুত চা গিলতে থাকল। তারপর টেবিলে খালি কাপ-প্লেট রেখে সিগারেট ধরাল। এখন সে অনেকটা নিশ্চিন্ত। এই ভুল বোঝাবুঝির জন্য লম্বা চওড়া একটা ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। আবার সেই মরিয়াপনা তাকে পেয়ে বসেছে। চায়ের দোকানের লোকটা ঠিক আভাসই দিয়েছিল, 'তারু মজুমদারের ব্যাপার !' ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে।

তারাপদর বউয়ের ফিরতে মিনিট পাঁচেক দেরি হলো। শচীশ

বলল, আমার নাম শচীশ। তারাপদকে বললে নিশ্চয় চিনতে পারবে।

আপনি চলে যাবেন কেন? তারাপদর বউ গায়ের চাদরের একটা খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল। লাস্ট বাসটা এলে ভেতরের বারান্দা থেকে দেখা যায়। আলো পড়ে তো! এখনও আসেনি!

শচীশ বলল, কিন্তু আপনার শ্বশুরমশাই বলছিলেন, ও আজ না ফিরতেও পারে!

তাতে কী হয়েছে? তারাপদর বউ মুখ তুলে একটু হাসল। ভদ্রলোকের বাড়ি ভদ্রলোক এসেছেন—ঠাণ্ডার রাত্তির। চলে যাবেন কেন?

শচীশ দ্বিধাজড়ানো গলায় বলল, আমাকে তো আপনারা আর কখনও দ্যাখেননি! তারাপদ এসে পড়লে অবশ্য অন্য কথা। না এলে বাড়িতে একজন অচেনা লোককে আশ্রয় দেওয়া!

তারাপদর বউ এবার একটু শব্দ করে হেসে ফেলল। আপনি কি চোর না ডাকাত? ঠিক আছে, যদি তাই হোন, এ বাড়িতে ডাকাতি করার মতো কী আছে? গরিব মানুষ আমরা কষ্টেসিষ্টে সংসার চালাই। কী? রাগ করলেন?

বলেই সে কান পাতল। বলল, বাসটা এলো মনে হচ্ছে। এক মিনিট—দেখে আসছি!

সে ভেতরে চলে গেল। এবার শচীশের মনে অন্য একটা ভাবনা এসে পড়ল। যদি সে বাসে তারাপদ মজুমদার আসে এবং সে শচীশের সহপাঠী তারপদ না হয়, কী ঘটতে পারে? তারাপদ মজুমদারের বউটি বেশ ভাল। মনখোলা স্বভাবের মেয়ে। হয়তো দারিদ্র্য অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে সরল করে, কিছু ভাল গুণও দেয়—যদিও দারিদ্র্য কদাচ কাম্য হতে পারে না মানুষের।

এখন কথা হলো, এই তারাপদ মজুমদার লোকটি কেমন? যার বাবাকে তার কোন বন্ধু আসবে বলে বাইরের বারান্দায় ঠাণ্ডায় অপেক্ষা করতে হয়, সে কি তার এই বউয়ের মতো সাদা সিধে সরল মানুষ? মনে তো হয় না। নাকি তার বন্ধু আসার মধ্যে কোনো পারিবারিক রহস্য জড়িয়ে আছে? কে সেই বন্ধু? সে

কেন আসবে ?

শচীশকে উত্যক্ত করছিল এইসব প্রশ্ন। এমন সময় তারাপদর বউ ফিরে এল। বলল, বাস এসেছে। দেখুন আসে নাকি। তবে আসবে বলে মনে হয় না।

কেন ?

আপনার বন্ধুকে আপনি চেনেন না ?

না—মানে, অনেক বছর দেখা হয়নি।

যখন দেখা হত, তখন কেমন ছিল ?

ভীষণ ভাল ছেলে। লাজুক, গোবেচারা—

আঃ ! থামুন তো ! তারাপদর বউ শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলে উঠল। বন্ধু তো ! প্রশংসা করা স্বাভাবিক।

শচীশ একটু অবাক হয়ে বলল, বিশ্বাস করুন। ওর মতো ভাল ছেলে কলেজে একজনও ছিল না !

কলেজে ? তারাপদর বউ ভুরু কুঁচকে তাকাল। কলেজে পড়েছিল নাকি ?

শচীশ গুম হয়ে বলল, তাহলে হয়তো আমারই ভুল হচ্ছে কোথায়।

কিসের ভুল ?

হয়তো আমার বন্ধু তারাপদ আর আপনার স্বামী একই লোক নয় !

কক্ষণো নয়।

তারাপদর বউ এমন জোর দিয়ে কথাটা বলল যে শচীশ চমকে উঠল। বলল, কেন এ কথা মনে হলো আপনার ?

কেন মনে হলো, যদি এ বাসেইফেরে, হাতে-নাতে বুঝতে পারবেন কোন কলেজে পাস।

শচীশ একটু ভয় পেয়ে বলল, তাহলে প্লিজ আমায় যেতে দিন ! বাইচান্স গণ্ডগোলটা ঘটে গেছে আর কী !

বলে সে কিটব্যাগ তুলে উঠে দাঁড়াল। তারাপদর বউ হাসি চেপে বলল, আপনি তো আচ্ছা ভীতু মানুষ ! একটা মাতাল-ছাতাল লোককে ভয় পাওয়ার কী আছে ?

আছে। শচীশ কাঁচুমাচু মুখে বলল। মাতাল মানুষকে তো

কিছু বুঝিয়ে বলা যাবে না ! চেঁচামেচি গণ্ডগোল বাধিয়ে দিতে পারেন। প্লিজ ! ভেবে দেখুন ব্যাপারটা।

ভেবেছি। আপনি বসুন। তারাপদর বউ শক্ত গলায় বলল, আমি ভদ্রঘরের মেয়ে। ভাগ্যের দোষে না হয়, এই নরকে এসে জুটেছি। আমি মানুষ চিনি। এই শীতের রাত্তিরে আপনাকে যেতে দিলে অকল্যাণ হবে জানেন না ? তাছাড়া মানুষ অচেনা জায়গায় শীতের রাত্তিরে বন্ধুর বাড়ি খুঁজতে কেন আসে, জানি না ? আপনি বসুন।

শচীশ অগত্যা বসল। তারপর বলল, আচ্ছা, আপনার স্বামীর ফোটো নেই ঘরে ? একবার দেখলে বুঝতে পারব, ভুল হয়েছে না কী !

তারাপদর বউ হেসে অস্থির হলো।···সত্যি আপনি বড্ড ভীতু মানুষ। বললাম না আমার স্বামী আপনার সেই বন্ধু নয় ? আপনি যেই হোন, রাত্তিরটা থেকে যান। তবু ভয় পাচ্ছেন কেন ?

শচীশ বলল, ঠিক আছে। ভয় পাব না। আপনি আমার মাথা বাঁচাবেন, কিছু যদি ঘটে !

কিচ্ছু ঘটবে না। মানুষের বাড়ি মানুষ আশ্রয় নিতে এসেছে —আসবেই তো। বিপদ-আপদে মানুষ মানুষের কাছেই আসে।

আপনার শ্বশুরমশাইয়ের কী অবস্থা এখন ? সাড়া পাচ্ছি না !

ওঁকে হাঁপানির ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছি। রাত্তিতে তো কিছু খাননা। ঘুমিয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে।

শচীশ আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, একটা কথা। আপনার স্বামীর কোনো বন্ধুর আসার কথা ছিল। কে তিনি ?

কে জানে ? বলে তো কোথাকার কোন বড়লোকের ছেলে। বিশ্বাস হয় না। যে যেমন, তার বন্ধুও তেমন হবে। তারাপদর বউ চাপা স্বরে এবং বাঁকা মুখে বলল। এমন বড়লোক বন্ধুকে মাঝে মাঝে আনে বলেই বলছি। কেন আনে, তাও জানি !

শচীশ গম্ভীর চালে বলল, ছিঃ ! পতিনিন্দা করতে নেই !

আমি ওসব মানিনে। বলে সে বাইরের দরজা খুলে উঁকি দিল। বাইরের হিম ও নৈঃশব্দ্য তার চারদিক দিয়ে ঘরের ভেতর

গলিয়ে পড়ল। ঘন অন্ধকারে কোনো মানুষজনের সাড়াও নেই। ঘুরে দরজা এ'টে দিয়ে শান্ত একটু হেসে বলল, ও আসছে না। এলে এতক্ষণ এসে যেত। তবে আগে থেকেই সাড়া পেতেন। মাতলামি করে গান গাইতে গাইতে আসত! পেছনে একপাল খে'কি কুকুর!

হাসিটাতে পাগলামির ছাপ আছে, শচীশের মনে হলো। সিগারেটের ধোঁয়ার রিঙ তৈরির ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, আপনার স্বামী কী করেন?

কী করবে? কে দেবে ওকে কাজ? ফ্যা ফ্যা করে ঘোরে। খালি ধান্দাবাজি। বলুন না, এই যে আপনাকে বিশ্বাস করে ঠাঁই দিলাম, এবার যদি আপনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, আর আপনার মুখ দেখব, না ছায়া মাড়াব?

ঠিক, ঠিক। শচীশ সায় দিয়ে মাথা নাড়ল।

বাবা—মানে আমার শ্বশুরমশাইয়ের কথা বলছি, শুধু বাবার মুখ চেয়ে ও'কে সবাই ক্ষমা করেছে এত দিন। ওর মতো মানুষের যে এমন ছেলে হবে—নাঃ! আঁচে জ লবসানো আছে। পরে কথা হবে। আপনি জামাকাপড় বদলে নিন। বারান্দায় হাতমুখ ধোবেন। জল দিচ্ছি।

ভেতরে চলে গেল তারাপদর বউ। শচীশ পোশাক বদলাল না। কী দরকার? রাত্তিরের ব্যাপার। কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা হলো যেন। পৃথিবীতে কত বসতি, কত বাড়ি, বাড়ির ভেতর কত মানুষজন। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, ভেতরে কোথায় কোন বাড়িতে কী ঘটছে। জানা যায় না, কে কেমনভাবে বে'চে আছে।…

খাওয়ার আয়োজন দেখে শচীশ ফের ভড়কে গিয়েছিল। তারাপদ মজুমদারের কোনো বড়লোক বন্ধুর বরাদ্দ খাওয়া. অনাহূত একটা উটকো লোকের মতো শচীশ এসে খেয়ে ফেলল! মুখে তুলতে গিয়ে খালি মনে হচ্ছিল এই খাওয়াটা একটা চুরিচামারির মতো। কিন্তু তারাপদর বউয়ের অনবরত তাড়া, শাসানি, কখনও জোর করে পাতে তুলে দেওয়া। শেষে চোখে ঝিলিক তুলে রান্নার

জন্য প্রশংসা দাবি। শচীশের সন্দেহ হচ্ছিল, মেয়েটির মাথায় ছিট আছে নাকি। সে একজন অচেনা লোক। অথচ এমন আপন করে নিল! পরে মনে হলো, ছিট নয়—এর মধ্যে যেন একটা প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপার আছে। মাতাল, ধান্দাবাজ স্বামীর বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল ঝাড়া। তাছাড়া ওই যে বলল, কেন মাঝে মাঝে বড়লোক বন্ধু আনে। একটা কদর্য ঘটনার আভাস যেন।

আঁচিয়ে সোজা হতেই একটা ছোট্ট তোয়ালে পর্যন্ত এগিয়ে দিল হাত মুছতে। শচীশ হেরিকেনের হলদে আলোয় বাড়ির ভেতরটা দেখে নিয়েছে। উঠোনে কিছু ঝুপসি গাছ—হয়তো ফুল-ফলের। দেয়ালে পলেস্তারা খসে পড়েছে। শ্যাওলা ধরে গেছে। একসময় নিশ্চয় সচ্ছলতা ছিল। এখন সব ক্ষয়ে গিয়ে একটা পোড়ো বাড়ির চেহারা বেরিয়ে এসেছে। শচীশ আস্তে বলল, আপনি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ুন। বড্ড ঠান্ডা। আমার জন্য আর ব্যস্ত হবেন না।

তারাপদর বউ এক গ্লাস জল বাইরের ঘরের সেই টেবিলে রেখে ঢাকা দিয়ে একটু হাসল।…আপনার বাড়ি বহরমপুর টাউনে বললেন। কোন পাড়ায়?

গোরাবাজারে।

গোরাবাজারে! তারাপদর বউ মুহূর্তে ঝলমলিয়ে উঠল। আমি গোরাবাজারের মেয়ে। নিমতলার ওখানে চঞ্চলা ফার্মেসি—তার পাশেই আমরা থাকতাম। বাবা মারা গেলেন। মা চলে গেলেন দুর্গাপুরে দাদার কাছে। সেই যাওয়া-আসা শেষ। আচ্ছা, বাড়ি-টাতে এখন নতুন ভাড়াটে এসেছে, না খালি আছে?

শচীশ সিগারেটে টান দিয়ে বলল, লক্ষ্য করিনি। আমি থাকি বড়াল লেনে—মেসে!

বুঝেছি। রামবাবুর মেসে তো? দোতলায়। নিচে গোঁসাই-জির গানের স্কুল। কী? ঠিক বলেছি না?

শচীশ ওর চোখে চোখ রেখে বলল, আপনার নামটা এখনও জানা হলো না।

পর্ণা। রামজাঠাকেই জিগ্যেস করবেন। কী বলে শুনবেন। শুধু উনি কেন, পাড়ার সব্বাই-সব্বাই চেনে আমাকে।

তারাপদর বউ পর্ণার চেহারায় এখন আলো। চেয়ারে বসে পড়ল। অসংখ্য কথা বলার ইচ্ছে মুখের রেখায় ঠিকরে উঠেছে। শচীশ বলল, আপনার বিয়ে হয়েছে কত দিন ?

পর্ণা বলল, তিন বছর হয়ে এল প্রায়। মা যতদিন ছিলেন, যেতাম। তারপর এক বছর আর যাওয়াই হয় না। ভাবি, একবার যাই, চেনা লোকেদের তো অভাব নেই। কারুর বাড়ি খাই-না-খাই, চেনা মাটিতে কিছুক্ষণ হেঁটে তো আসি। কত কথা মনে পড়ে। সে ছোট্ট করে একটা শ্বাস ফেলল।

যান না কেন ? শচীশ জানতে চাইল।

পর্ণা আঙুল খুঁটতে খুঁটতে মুখ নামিয়ে একটু হাসল।··· যাই না। গেলে হয়তো কষ্ট পাব। থাক্।

দাদার কাছে দুর্গাপুরে নিশ্চয় যান ?

নাঃ। কে নিয়ে যাবে ? একটা চিঠি লিখে একমাস-দুমাস পরে উত্তর। মায়ের শরীরও তো ভাল না। বলে মুখ তুলল পর্ণা। আপনি রামবাবুর মেসে থাকেন কেন ? আপনার বাড়ি বুঝি বাইরে ?

হ্যাঁ। গ্রামে।

ওখানে কী করেন ? চাকরি ? কী চাকরি ?

বড্ড বাজে চাকরি। শচীশ হাসল। জেলা পঞ্চায়েত অফিসের কাজ। প্রায়ই বাইরে গিয়ে এমনি করে বাস ফেল করি, আর—

আর ?

কত মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়ে যায়। শচীশ ধোঁয়ার মধ্যে বলল। তবে এবার যেমনটা হলো আর কখনও হয়নি। দারুণ নাটকীয় ব্যাপার বলতে গেলে। তবে আমি খালি ভাবছি, সকালে আপনার শ্বশুরমশাই কীভাবে ব্যাপারটা নেবেন ? আপনি কোনো ঝামেলায় পড়বেন না তো ?

পর্ণা শক্ত মুখে বলল, কিসের ঝামেলা ? বলব, বহরমপুর থেকে আমার পিসতুতো দাদা এসেছিল। শ্বশুরমশাইকে বুঝিয়ে দিলেই বুঝবেন। উনি মাটির মানুষ। যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন ! তারপর যেদিকে চোখ যাবে, চলে যাব।

প্রায় আটটা বাজতে চলল। আপনি খেয়ে নিন।

পর্ণা কান করল না। বলল, একটা কথা জিগ্যেস করছি-রাগ করবেন না তো ?

না, না। বলুন ?

আপনি মেসে থাকেন কেন ? গিন্নিকে নিয়ে এসে বাসা ভাড়া করে—

শচীশ দ্রুত বলল, কী মুশকিল ! আমার এখনও গিন্নিটিন্নি হয়নি।

ওমা ! সে কী ?

কেন ? এতে অবাক হওয়ার কী আছে ? শচীশ হাল্কা গলায় বলল। একটু আগেই তো বললেন, স্বামী বেচারাকে ফেলে যেদিকে চোখ যায়, কেটে পড়বেন। আমি গিন্নি জোটালে সেই গিন্নিও হয়তো তাই বলবে। ঝুটঝামেলা !

শচীশ হাসতে লাগল। পর্ণাও একটু হেসে ফেলল, তবে হাসিটা চেষ্টাকৃত। বলল, কার সঙ্গে কার তুলনা ! আপনি ওকে চেনেন না, তাই বলছেন। হাড়মাস কালি হয়ে গেল দিনে দিনে। বাঁচতেই ইচ্ছে করে না আর।

চেষ্টাকৃত হাসিটা তারপরই বদলে গেল। গলার স্বরটা ভেঙে গেল এবং চোখের কোণা দিয়ে জলের ফোঁটাও উপচে এল। শচীশ একটু বিব্রত হয়ে বলল, বুঝতে পারছি। কিন্তু মানিয়ে চলা ছাড়া উপায় কী ? এই দেখুন না, আমার অবস্থাও কতকটা তাই। যে চাকরিটা করছি, যে অবস্থার মধ্যে কাটাতে হচ্ছে, তা বলার নয়। অথচ কী করব ? এভাবেই লড়াই করে টিকে থাকতে হবে।

পর্ণা হঠাৎ উঠে গেল। শচীশ ভাবল, কাঁদতে গেল হয়তো। মেয়েটা সত্যি বড় কষ্টে আছে। শহরে বড় হওয়া মেয়ে এই নিঝুম গ্রামগঞ্জের পরিবেশে এসে পড়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, স্বামী লোকটি মাতাল ফন্দিবাজ গোছের এবং কী জঘন্য, বড়লোক বন্ধু আনে নিজের স্ত্রীকে টোপ হিসেবে কাজে লাগাতে। দাদাও মাঝে মাঝে নিয়ে যায় না যে ঠাঁই বদল হয়ে একঘেয়েমিটা ঘুচবে।

কিন্তু না, কাঁদতে যায়নি। আশ্বস্ত হলো শচীশ। মশারি আনতে গিয়েছিল। দিব্যি ঝলমলে চেহারা। বলল, ভুলে গিয়েছিলাম। মশারিটা খাটিয়ে নিন। মশা কামড়াবে। আর এই

দরজাটা ভেতর থেকে আটকে দিন। সকালে চা-ফা- খেয়ে যাবেন কিন্তু। এ বাড়িতে ভাল মানুষ, ভদ্রলোক তো আসে না। দয়া করে এসেছেন—আমার ভাগ্য।...

অচেনা জায়গায় অন্য পরিবেশে ঘুম হয় না শচীশের। কিন্তু শীতকালের একটা লম্বা রাত্তির কাটাতে যে ওমটুকু চেয়েছিল, প্রাণভরে পেয়েছে। সেই একটি অচেনা মেয়ের যথেষ্ট যত্ন-আত্তিও। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আতিথ্য তাকে বিব্রত করছিল। তাছাড়া সে ত্রাণকর্তা মহাপুরুষ নয় যে, এমন একটা মেয়েকে উদ্ধারের চেষ্টা করবে, তার ক্ষমতাই বা কতটুকু? অথচ একটা কিছু করা উচিত যেন। একটা মেয়ে বড় কষ্টে কাটাচ্ছে। মাতাল ফন্দিবাজ স্বামী!

কী করা উচিত, তাই নিয়ে ভাবতে ভাবতেই রাত্তির কেটে গেল। ভোর পাঁচটায় যে বাসটা গঞ্জের ঘাট থেকে ছেড়ে যায়, সেটাই আগের সন্ধ্যা সাতটায় শহর থেকে পেঁাছে অপেক্ষা করে। সাড়ে চারটে বাজে ঘড়িতে। জোর করে উঠে পড়ল শচীশ। চা-ফা খেয়ে যেতে বলেছিল তারাপদ মজুমদারের বউ। কী দরকার? মনে-মনে বেশ খানিকটা জড়িয়ে গেছে শচীশ। আরও বেশি জড়িয়ে যাবে চা-ফা খেতে গেলে। প্রেমট্রেম? ছিঃ! তা কেন? মেয়েদের সঙ্গে—পর্ণার মতো মেয়ের সঙ্গে অন্যরকম কোনো সম্পর্ক কি গড়ে উঠতে পারে না? 'পিসতুতো দাদার' কথা বলছিল।

কিটব্যাগ ঝটপট গুছিয়ে নিয়ে সাবধানে বাইরের দরজা খুলে সে বেরুল। দরজা তেমনি নিঃশব্দে বাইরে থেকে টেনে দিল। সাদা. চাপ চাপ কুয়াশার সঙ্গে রাতের খাবলা-খাবলা অন্ধকার জট পাকিয়ে পৃথিবীকে দুর্বোধ্য করে রেখেছে। আর কী হিম, কী হিংস্র শীতলতা! খানাখন্দে মাঝে মাঝে আছাড় খেতে-খেতে পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে শচীশ হাঁটছিল।

ঘাটের মাথায় ছোট্ট বাজারটা জনহীন নিঝুম। বাসটা দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে। ভেতরে ঢুকে বসে রইল শচীশ। অপরাধীর মতো। পর্ণা যদি আর কিছু না হোক, তার বোনই হত, কী করত শচীশ? শচীশ, তুমি কী করতে? শচীশ জানে, সে জবাব দিতে পারবে না। ঠাণ্ডা-হিম একটা শীতের লম্বা রাত্তিরে ওম খুঁজতে

মারিয়া হয়ে উঠেছিল সে। যদি বা ঘটনাচক্রে ওমটুকু জুটল, নিতে পারল না। শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে হলো, ওই ওমে লেপের ভেতর ছারপোকার মতো অজস্র দুঃখকষ্টের পোকার কামড়—কারণ খালি মনে হয়, তারাপদ মজুমদারের বউ যদি সত্যি তার কেউ হত খুব আপন কেউ? তাহলে কী করত শচীশ? কিছু কি করতে পারত?

বুকের ভেতর থেকে একটা আবেগ ঠেলে আসে বারবার। শচীশ ঠাণ্ডা-হিম আড়ষ্ট হাতে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। এতক্ষণে বাবুগঞ্জে ঘন কুয়াশার ভেতর দিনের ক্ষীণ স্পন্দন টের পাওয়া যাচ্ছে। পাকুড়তলায় কারা সবে আগুনের কুণ্ড জ্বালল।···

মানুষ-ভূতের গল্প

আলোরানী হেরিকেনের দম কমিয়ে শুয়ে পড়তেই একটা ঘুম-ঘুম পুরুষশরীরের ফাঁদে আটকে যাচ্ছিল প্রায়, এমন সময়ে বাড়ির পেছনে খিড়কির দিকে কাঁপা-কাঁপা গলায় সন্দেহজনক ডাকাডাকি, 'ঘনশ্যাম। ঘনশ্যাম। ঘনা রে।'

এক ঝটকায় ফাঁদ ছিঁড়ে উঠে বসল আলোরানী। বাইরে বারান্দার খানিকটা দরমাবাতায় ঘেরা কুঠুরি। শাশুড়ি তারাদাসীর ডেরা সেখানে। তার ভয়কাতুরে চাপা ধমক শোনা যাচ্ছিল, 'যা। যা। ধুস্ ধুস্। বয়স বাড়লে ঘুম কমে। কানও খর হয়। গাছগাছালি থেকে পাতা খসে পড়লেও শাসায়।

কিন্তু এটা কোনও পাতা খসার ঘটনা নয়, স্পষ্ট ডাকাডাকি এবং গলাটা অবিকল ঘনশ্যামের বাবা বটকেষ্টর। আলোরানীর ধাক্কা খেয়ে ঘনশ্যামের ঘুম ও প্রেম দুই-ই গেল। অভিমান করে বলল, 'কী মাইরি খালি—'

আলোরানী হেরিকেনের দম বাড়িয়ে চমকানো গলায় বলল, 'বাবার গলা মনে হচ্ছে যেন?'

এবার খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল ঘনশ্যাম। 'ছাড়ো তো। কোন শালা রাতদুপুরে মস্করা করতে এসেছে।' বলে সে বউকে ধরতে হাত বাড়াল। একটা ধস্তাধস্তি বেধে গেল।

সেই সময় আবার শোনা গেল, 'ও ঘনা। ঘনা রে।'

আলোরানীকে ছেড়ে ঘনশ্যাম লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। হাড়-জ্বালানে মামলাবাজ বলে গাঁয়ে তার বাবার খুব বদনাম ছিল। আড়ালে তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসাও করা হত। কিন্তু আর তো লোকটা বেঁচে নেই। তাছাড়া বাবা খারাপ হতে পারে, ঘনশ্যাম মোটেও খারাপ নয়। কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। বাবার রেখে-যাওয়া মামলামোকদ্দমা নিয়েও তার মাথাব্যথা নেই। অন্যপক্ষ এই এক মাসেই ঝটপট একতরফা ডিক্রি পেয়ে যাচ্ছে। ঘনশ্যাম লাঠি

হাতে বেরুল। পেছনে হেরিকেন হাতে তার বউ আলোরানী। তারাদাসী দরমাবাতা এবং তেরপলের ভেতর থেকে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, 'স্বভাব যায় না মলে। সকালে গেনুকে খবর দিস বরং।'

গেনু ভূতের বদ্যি। ঘনশ্যাম মায়ের মুখে গেনুর নাম শুনে একটু ভড়কে গেল বটে ; কিন্তু ফের করুণ স্বরে 'ঘনা রে' শুনে লাঠি বাগিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'কোন শালা রে ?'

খিড়কির দরজার বাইরে থেকে অবিকল বটকেষ্টর গলা শোনা গেল, 'আমি রে, আমি। খামোকা শালাসমন্দি না করে দুয়োর খুলবি না কী ? শীতে অবস্থা কাহিল একেবারে।'

ঘনশ্যাম হকচকিয়ে গিয়েছিল। আলোরাণী ঠোঁট কামড়ে ধরে কী ভাবছিল। তার হাতে হেরিকেন। হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে খিড়কির দরজা খুলে দিল এবং যে লোকটি বাড়ি ঢুকল, সে অবিকল বটকেষ্ট।

সেই ময়লা ফতুয়া, খাটো ধুতি, কাঁচাপাকা গোঁফ, কাঁধে ব্যাগ। চোখে তেমনই জ্বলজ্বলে চাউনি, চালাক-চালাক ঝিলিক।

ঘনশ্যাম প্রচন্ড আতঙ্কের চোটেই লাঠি তুলেছিল। বটকেষ্ট খপ করে ধরে ফেলে খাপ্পা মেজাজে বলল, 'হতচ্ছাড়া বাঁদর বাবার মাথায় লাঠি তুলতে হাত কাঁপল না ? তখন থেকে ডেকে-ডেকে গলা ভেঙে গেল, আবার বাড়ি ঢুকতেই লাঠি। মারব গালে এক থাপ্পড়।

ঘনশ্যাম লাঠি ছেড়ে দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। সেই আদি অকৃত্রিম বাবা মনে হচ্ছে. কিন্তু—

সে ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলে উঠল. 'ধুস্ শালা। তাহলে ধারদেনা করে কার বডি পুড়িয়ে এলাম ?'

বটকেষ্ট থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'পুড়িয়ে এলি মানে ?'

ঘনশ্যাম গুম হয়ে বলল, 'বেড খালি দেখে খোঁজ করলাম। বলল, মগ্‌গে গিয়ে দেখুন।' বটকেষ্ট হতভম্ব হয়ে বলল, 'মগ্‌গে গিয়ে আমাকে দেখলি ?'

'তাই তো মনে হল।' ঘনশ্যাম মিনমিনে স্বরে বলল।' হাস-পাতালের লোকেরাও বলল। তা ছাড়া বডি ফুলে ঢোল।'

বটকেষ্ট এতক্ষণে একটু হাসল। 'আর বলিস নে। হাসপাতালের যা খাবার। গত জন্মের ভাত উঠে আসে পেট থেকে। কাঁহাতক আর সহ্য হয়। শেষে কেটে পড়লাম।'

আলোরানী মুখ টিপে হাসছিল। গৃহবধূর গলায় বলল, 'গরম জল করে দিই। হাত-মুখ ধুয়ে নিন।' তারপর শ্বশুরের পায়ে টিপ করে প্রণামও ঠুকল।

বটকেষ্ট আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলল, 'আগে এক কাপ চা। রায়পুরে খগেনের বাড়ি খ্যাঁট দিয়ে বেরিয়েছি।' বলে ছেলের দিকে ঘুরল। মাথা ন্যাড়া করেছিলি দেখছি। তার মানে, বাপের ছেরাদ্দও করেছিস। হাঁদারাম।'

তারাদাসী তার ডেরায় চুপচাপ ছিল। হঠাৎ তার ফোঁপানি শোনা গেল। আলোরানী বলল, 'আঃ। চুপ করুন তো। রাত-দুপুরে কেলেংকারি করবেন না।'

বউমার তাড়ায় তারাদাসী থেমে গেলে। ঘনশ্যাম গুম হয়ে বলল. 'কেলেংকারি হবেই সকালে গাঁসুদ্ধু হইচই পড়ে যাবে। তুমি মাইরি খালি ঝামেলা বাড়াও—কোনও মানে হয়? হাসপাতালে ভাল লাগল না তো বাড়ি চলে আসবে। তা নয়, এক মাস নিপাত্তা। এদিকে কোন শালার বডির মুখে আগুন দিয়ে—ধুস্।'

বটকেষ্ট আস্তে বলল, 'চেপে থাক্ দিনকতক। কাকপক্ষীটিও যেন টের না পায়।' বলে সে বারান্দায় উঠল। 'বিধবা' স্ত্রীর উদ্দেশে ফিক করে হেসে বলল, 'কী? গোঁসাঘরে খিল দিলে নাকি? যা-যা বলতাম, ঠিক-ঠাক মিলে গেছে তো? বলেছিলাম না ঘনা ঘরে ঢুকবে আর তোমাকে এই পায়রার খোপে ঢোকাবে?'

ঘনশ্যাম ফুঁসে উঠল। 'না জেনে খামোকা যা-তা বোলো না। মা নিজেই বলল, তোরা ঘরে থাক। আমাকে বাইরে দে।'

মামলায়-মামলায় প্রায় সর্বস্বান্ত বটকেষ্ট বউমা আর ছেলের জন্য বারান্দায় এই ঘেরাটোপের ব্যবস্থা করেছিল। আশা ছিল, হরেনের সঙ্গে টুকরো জমি নিয়ে মামলায় তার জয় হবে এবং তাই বেচে পাশে একখানা ঘর তুলবে। কিন্তু হাকিমের অভাবে আদালতে নাকি মামলার পাহাড় জমে উঠেছে।

বটকেষ্ট হেরিকেনটা তুলে তেরপলের পর্দা ফাঁক করে তার 'বিধবাকে' দেখতে গেল। কিন্তু তারাদাসী লেপমুড়ি দিয়েছে। বটকেষ্ট খ্যা খ্যা করে বলল, 'ঢঙ। বিধবা হয়েছ তো বিধবা হয়েই থাকো। ছেরাদ্দ-হওয়া লোকের বউ। যাগযজ্ঞ করে গন্ডা কতক বামুন খাইয়ে আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে, জানো তো? বউমা, আমাকে এখানেই বিছানা করে দিও!'

ঘনশ্যাম পিতৃভক্তিতে গদগদ হয়ে বলল, 'না, না। তুমি ঘরে শোবে। আমরা বরং এখানেই শোব। এখনও তত শীত পড়েনি!...

সকালে শাশুড়ির সাড়াশব্দ না পেয়ে আলোরানী তেরপলের পর্দা তুলেছিল। তারাদাসীর বিছানা খালি। বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরেও পাত্তা পেল না। গাঁয়ের একটেরে বাড়ি। পড়শিদের কাছে খোঁজখবর নিয়ে ফিরে এল আলোরানী। কেউ দেখেনি তারাদাসীকে। তখন উদ্বিগ্ন ঘনশ্যাম বেরুল মায়ের খোঁজে।

কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে সে গম্ভীর মুখে বলল, 'জগা বলল, ভোরের বাসে মাকে চাপতে দেখেছে। বাবাকে মাইরি কী বলব? খালি ঝামেলা বাড়ানো স্বভাব।'

ঘরের ভেতর তক্তাপোশে বসে বটকেষ্ট চা খাচ্ছিল এবং পুরনো পোকায় কাটা দলিল-পরচা দেখছিল। ছেলের কথা কানে যেতেই চাপা গলায় ডাকল, 'ঘনা। শুনে যা।'

ঘনশ্যাম বারান্দায় উঠে বলল, 'বলো।'

'তোর মা কেটে পড়েছে তো?' বটকেষ্ট বাঁকা হাসল। 'জগা বলল না কোন বাসে চাপতে দেখেছে?'

'সাঁইথের বাসে। কেন?'

বটকেষ্ট তারিয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'আমি ভাবছিলাম হাসপাতালে গিয়ে ঢুকবে নাকি। সাঁইথে যাওয়া মানে রোঘোর বাড়ি। যত্নআত্যি পাবে। তোর মায়ের কিছু কিছু ব্যাপারে বেশ টনটনে বুদ্ধি। আয়, বস্ এখানে।'

ঘনশ্যাম অনিচ্ছার ভঙ্গিতে বসল। সিন্দুক থেকে এসব পোকায় কাটা কাগজপত্তর বের করে খুঁটিয়ে দেখা তার মামলাবাজ বাবার বরাবরকার অভ্যাস। মুখ তেতো করে বলল, 'আবার ওই মড়া

'ঘাঁটতে বসেছ ?'

'স্বভাব যায়না মলে।' বটকেষ্ট ফিক করে হাসল। তোর মা কাল রাত্তিরে বেশ বলছিল। তোর মায়ের কথাটা মনে ধরারা মতে। তুই ছেরাদ্দ করে নাড়া হয়েছিলি। তোর মা শাঁখা ভেঙে সিঁদুর মুছে বিধবা হয়েছে। তার মানে, আমি এখন মরা মানুষই বটে। কাজেই চেপে যা।'

'চাপবটা কী ?' ঘনশ্যাম জানতে চাইল। বটকেষ্ট জ্বলজ্বলে চোখে ঝিলিক তুলে বলল, 'কাল রাত্তিরে বললাম কী তোকে ? আমি যে বেঁচেবত্তে আছি, একেবারে চেপে যা।'

'হুঁ, তারপর ?'

'তেঁতুলতলার জমিতে একখানা ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়ে আয়।'

ঘনশ্যাম জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার মাথা খারাপ ? হন্নাদা আমার বডি ফেলে দেবে। কলাই বুনে কাঁটার বেডা দিয়ে রেখেছে—নিজে গিয়ে দেখে এসো গে না।'

বটকেষ্ট একটু ভেবে বলল, 'কাঁটার বেড়া দিয়েছে নাকি ? যাচ্চলে। মামলা এখনও ঝুলে আছে। মগের মুলুক পড়ে গেছে দেখছি। তোর বাধা দেওয়া উচিত ছিল।'

ঘনশ্যাম চটে গেল। 'তুমি গিয়ে ঝাণ্ডা পুঁতে দিয়ে দেখ না, কী হয়। হন্নাদা এখন গাঁয়ের মাথা হয়েছে। পঞ্চায়েতের মেম্বার। এসব আমার দ্বারা হবে না।'

'তুই একটা অকম্মা।' বটকেষ্টও চটল। 'তোরই ভালোর জন্য চিন্তাভাবনা করে বাড়ি ফিরে এলাম। নৈলে অ্যাদ্দিন গয়া-কাশী-মথুরা করে দিব্যি ঘুরে বেড়াতাম। সংসারে ঘেন্না ধরে গিয়েছিল, জানিস ?'

ঘনশ্যাম আঙুল খুঁটতে থাকল।

বটকেষ্ট চাপা গলায় ডাকল, 'বউমা ! শোনো তো !'

আলোরানী মাথায় ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকল। সে বারান্দা থেকে কান করে সব শুনছিল। বলল, 'কাকে কী বলেছেন ? সেদিন তালপুকুরের মাছ ধরে সব্বাই যে-যার ভাগ নিয়ে বাড়ি ঢুকল। মাঝখান থেকে আমি চ্যাঁচামেচি করে গলা ভাঙলাম। আপনার ছেলে উল্টে আমাকে বকাঝকা করে ঠেলতে ঠেলতে—'

'বাজে কথা বোলো না!' ঘনশ্যাম বাধা দিয়ে বলল।' মেয়ে-ছেলে—অপমান করে বসলে খুব ভালো হত? চারটে পুঁটিমাছের জন্য ঝামেলার মানে হয় না।'

'পুঁটি নয়, বাবা!' আলোরানী শ্বশুরকে হাত তুলে মাছের সাইজ দেখাল। 'এত-এত বড় পোনা।'

বটকেষ্ট গলার ভেতর বলল, 'এক আনার শরিক আমি। আচ্ছা দেখছি। ফিরে যখন এসেছি, একটা এস্পার-ওস্পার না করে ছাড়ছি না।'

আলোরানী শ্বশুরের সায় পেয়ে উৎসাহে বলল, 'জানেন বাবা? হাসপাতালের ব্যাপারটাতেও আমার সন্দেহ হয়েছিল। যত বলি, কাকে দেখতে কাকে দেখেছ, তত বলে, আমাকে বাবা চেনাচ্ছ?'

বটকেষ্ট অভিমানী শ্বাস ফেলে বলল, 'আমাকে যদি চিনবে, তাহলে এ অবস্থা হয়? যাক্ গে। বউমা, তোমাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই। ঘনার দ্বারা কিসসু হবে না।'

আলোরানী ঝটপট বলল, 'ঝাণ্ডা পুঁততে হবে তো? পুঁতে আসব। আমি সব পারি—আপনি কিছু ভাববেন না।'

ঘনশ্যাম নড়ে উঠল। 'মারা পড়বে বলে দিচ্ছি। মেয়েছেলের এত সাহস ভালো নয়। শালা হন্নাদাটা বড্ড ঢ্যামনা!'

খপ্ করে তার কান ধরে বটকেষ্ট ঝাঁকুনি দিল। 'চো-ও-প্! কাল রাত্তির থেকে শুনছি আমার মুখের সামনে খালি শালা-টালা মুখখিস্তি। একটা মাস আমি ছিলাম না, তাতেই এই? সত্যি-সত্যি মলে মুখ থেকে নাদি বেরুবে হতচ্ছাড়ার।'

ঘনশ্যামের পিতৃভক্তির মূল কারণ, ছোটবেলা থেকেই তার কাছে বাবা একটা বিপজ্জনক সাংঘাতিক জিনিস। তা ছাড়া বট-কেষ্টর এক সময় গাঁয়ে প্রচণ্ড দাপটও ছিল। বউয়ের সামনে কান ধরায় অপমানের চোটে ঘনশ্যাম শেষ পর্যন্ত কী আর করে, খি খি করে হাসতে লাগল।

আলোরানী একটু লজ্জা পেয়েছিল অবশ্য। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘনশ্যাম বলল, 'খুব হয়েছে। কান ছাড়ো, বেরুব।'

কান ছাড়ার সময় শেষ ঝাঁকুনি দিয়ে বটকেষ্ট বলল, 'যেখানে

যাবি যা। তোর আশা কখনও করিনি, করবও না। কিন্তু সাবধান, আমার কথা চেপে রাখবি। চাউর করলেই কী হবে, জানিস ?'

উঠে দাঁড়িয়ে ঘনশ্যাম বলল, 'বাড়ি থেকে বের করে দেবে তো ? দিও।'

'না।' বটকেষ্ট শক্ত মুখে বলল। 'তাহলে সত্যি-সত্যি মরব।'

ঘনশ্যাম একটু অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে ?'

মাথার ওপরকার কড়িকাঠ দেখিয়ে বটকেষ্ট বলল, 'ওখান থেকে ঝুলব বুঝতে পারছিস তো ? একহাত জিভ বের করে ঝুলে থাকব।'

ঘনশ্যাম ভয় পেয়ে জিভ কেটে বলল, 'ধুস ! খালি আজে-বাজে কথা।'...

বটকেষ্টর মরার খবর পেয়ে হরেন নিশ্চিন্ত হয়েছিল। টুকরো জমিটা নিয়ে জ্ঞাতি বটকেষ্টর সঙ্গে তিন বছর মামলা চলছিল। জমিটার তিন দিকে আগাছার জঙ্গল, একদিকে কয়েকটা ঝাঁকড়া প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ। তার ওধারে একটা পুকুর। ভাদ্রমাসের ধান তুলতে থানাপুলিশ হয়ে গেছে। সেই ফৌজদারি মামলাও ঝুলছে আদালতে। আশ্বিনে হঠাৎ কী অসুখে ভুগে বটকেষ্ট শহরের হাস-পাতালে গেল এবং মারাও পড়ল। শ্রাদ্ধে দয়া করে হরেন ঘনশ্যামকে কিছু নগদ টাকাকড়িও দিয়েছে। শর্ত হল, ঘনশ্যাম আদালতে যাবে না। তারপর হরেন জমিটাতে কলাই বুনে দিয়েছে। সারের জোরে দেখতে দেখতে ঝাঁপালো সবুজ হয়ে উঠেছে জমিটা। গরু-ছাগলের বড় উপদ্রব এদিকটাতে। তাই কাঁটাঝোপের বেড়া দিয়েছে। এবেলা-ওবেলা এসে একবার করে দেখে যায় হরেন। তার কাছে খুব গর্বের জিনিস এই মাটিটুকু।

বিকেলে বাসরাস্তার ধারে গজার দোকানে হরেন চা খাচ্ছিল। সেই সময় তার মেয়ে পান্তি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল, 'বাবা ! শিগগির এস। তেঁতুলতলার কলাইয়ের ক্ষেতে ঘনাকাকার বউ ঝাণ্ডা পুঁতেছে।'

ঝাণ্ডা পোঁতার ব্যাপারটা পাড়াগাঁয়ে ইদানিং রীতিমতো ঘটনা। কিন্তু হরেনের বিশ্বাসই হল না। ঘনশ্যাম তার বাবার মতো নয়।

কোনও ঝামেলায় থাকে না। তবে তার বউটা একটু তেজী, একথা ঠিকই। তাই বলে তার ঝাণ্ডা পোঁতার সাহস হবে, এটা অবিশ্বাস্য —এবং সেও কিনা হরেনের দখল করা কলাইবোনা জমিতে ?

হরেন বলল, 'যাঃ !'

'সত্যি বাবা !' পাত্তি চোখ বড় করে বলল, 'মা দেখেছে। আমি দেখলাম। মা বলল, শিগগির তোর বাবাকে খবর দে।'

হরেন হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, 'বাড়ি যা দিকি। কাজ নেই কম্ম নেই, খালি পাড়া-বেড়ানো। ঝাণ্ডা পুঁতেছে তো কী হয়েছে ? বাড়ি যাবার সময় উপড়ে ফেলে দিয়ে যাব।'

পাত্তি মনমরা হয়ে চলে গেল। জগা বলল, 'পেছনে লোক জুটিয়েছে হে হরেন ! নৈলে ঘনার বউয়ের এত সাহস হত না।'

হরেন চটে গিয়ে বলল, 'তুমিও মাইরি যেন কী! লোক জোটাবে ! এত শস্তা ? লোক জোটাতে হলে মালকড়ি দরকার। ঘনার হাঁড়ির অবস্থা ঢনঢন। কালই দেখবে মুনিশ খাটতে নেমেছে !'

জগা বলল, 'তোমার বেপার্টির লোক হলেই জুটবে। আজকাল তো এরকমই হয়েছে।'

গোঁ ধরে হরেন বলল, 'বেপার্টি ? এ গাঁয়ে আমার বেপার্টি হবে কোন শালা ? সবগুলোকে তো দেখলাম। পায়ের তলায় এসে মুণ্ডু কাত করেছে। মরা মানুষের নিন্দে করতে নেই—বটকেষ্ট সম্পর্কে জ্যাঠাও ছিল বটে, তবে সেও গেছে, সব ঠাণ্ডাও হয়েছে।'

জগা কথা বাড়াল না। চায়ের দোকানে এ সময়টা খদ্দেরের ভিড় বেড়ে যায়।

চা শেষ করে হরেন উঠল। কিছুক্ষণ দোনামনা করে রাস্তার নয়ানজুলির দিকে ঘুরল। শর্টকাটে যাওয়ার পথে বাধা নয়ান-জুলির জল। শেষ বেলার আলোর গায়ে কুয়াশার ছাপ পড়েছে। এখান থেকে তেঁতুলতলার জমিটা দেখা যায় না। অনেকটা ঘুরে বাঁধের ওপর দিয়ে মাঠে নামল হরেন। গাঁয়ের শেষ দিকটায় ঘন গাছগাছালি। জমিটার কাছাকাছি যেতে দিনের আলো কমে এল আরও।

তেঁতুলতলা পোঁছেই চোখ জ্বলে গেল হরেনের। সত্যিই

কলাইয়ের জমির মাঝখানে পোঁতা কঞ্চিতে লটকানো একটা ঝান্ডা। খুঁজতে খুঁজতে একখানে কাঁটার বেড়া ওপড়ানোও চোখে পড়ল। হরেন হুঙ্কার দিল, 'তবে রে হাতচ্ছাড়ি।' হুঙ্কারের লক্ষ্য ঘনশ্যামের বউ।

তারপর সে মসমস করে জমিতে ঢুকে ঝান্ডাটা ওপড়াল। কঞ্চিটা দুমড়ে মুচড়ে এবং কাপড়ের ফালিটা ফালাফালা করে ছুঁড়ে ফেলল জমির বাইরে। আগের মতো কাঁটার বেড়ার ওপড়ানো অংশটা কোনও রকমে আটকে সে তেঁতুলতলায় উঠে এল। রাগী চোখে তাকিয়ে রইল জমিটার দিকে।

ঠিক এই সময়ে তেঁতুলগাছের ওপর থেকে কেউ ডাকল, 'হন্না নাকি রে! ও হন্না!'

হরেন ভীষণ চমকে উঠেছিল। মাথার ওপরকার ঘন ডালপালার ভেতর থেকে চেনা—খুবই চেনা গলায় কেউ তাকে ডাকছে। হরেন মুখ তুলতেই আবছা আঁধারে একটা মূর্তিও দেখল, একটু ওপরে মোটা একটা ডালে বসে দুটো ঠ্যাং দোলাচ্ছে। হরেন কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'কে কে?'

বটকেষ্ট দুটো ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে বলল, 'ন্যাকা চিনেও চিনতে পারছিস না—কে কে করছিস? সোজা ঝাঁপ দিয়ে পড়ব। তারপর ঘাড়টি মটকে দেব। আর কখনও যদি এই জমির তল্লাটে দেখেছি তো—'

হরেন বনবাদাড় ভেঙে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

একটু পরে বটকেষ্ট চাপা গলায় ডাকল, 'বউমা! মইটা নিয়ে এস। নামি।'

আলোরানী একটু তফাতে হাল্কা একটা মই নিয়ে আড়ালে বসে ছিল। এসে শ্বশুরকে গাছ থেকে নামাল। বটকেষ্ট খি খি করে হেসে বলল, 'খুব জব্দ হয়ে গেছে হন্না। চলো, এখনই এখান থেকে কেটে পড়া ভালো।'...

একটু রাত করে ঘনশ্যাম ফিরল। মুখটা গম্ভীর। বউকে দেখে বলল, 'বাবা কী যে ঝামেলা করে মাইরি! সন্ধ্যাবেলা হন্নাদা তেঁতুলগাছে নাকি বাবাকে দেখেছিল। বাড়ি ফিরে অজ্ঞান হয়ে

যায়। শেষে একদঙ্গল লোক লাঠিসোটা টর্চ হ্যাসাগ নিয়ে তেঁতুল-তলায় খুব খোঁজাখুঁজি করেছে। খবর শুনেই লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আমি তো ভয়ে সারা। একটা কিছু সন্দ করে আমাদের বাড়ি এলেই কেলেঙ্কারি হত।'

আলোরানী নির্বিকার মুখে বলল, 'হত না।'

'হত না মানে?' ঘনশ্যাম ফুঁসে উঠল। 'এসেই বাবাকে দেখতে পেত। তারপর—'

'বাবা তখনই চলে গেছেন।'

ঘনশ্যাম অবাক হয়ে বলল, 'সে কী!'

'রায়পুরে রাত্তিরে থাকবেন। সকালে ওখান থেকে সাঁইথে চলে যাবেন।'

আলোরনী মুখ টিপে হাসছিল। ঘনশ্যাম একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'মা যদি ছোটমামার বাড়ি গিয়ে থাকে আর বাবা সেখানে হাজির হয়, আবার এক ঝামেলা।'

আলোরানী বলল, 'কিসের ঝামেলা?'

'ধুস! বোঝো না কিছু।' ঘনশ্যাম বিরক্ত হয়ে বলল। 'মা তো বিধবা হয়ে আছে এখনও!'

আলোরানী হাসতে লাগল। 'সে তুমি ভেবো না। তোমার মা সব শাড়ি-গয়না গুছিয়ে নিয়েই গেছেন। কিচ্ছু খুঁজে পাইনি ওঁর ঘরে। আর শাঁখাসিদুর? বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।'···

গাবু বেঁচে আছে

একেক সময় এমন হয়, আস্তে চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন গুণদাপ্রসাদ, যখন কারুর কিছু করার থাকে না। গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে এ বয়সে এমন কথা মানুষের মাথায় আসা স্বাভাবিক, বিশেষ করে হাতে যদি একটা ছড়ি থাকে এবং সমবয়সী সঙ্গী থাকেন। তাছাড়া সুনসান নিরিবিলি জায়গা, গাছপালা, আকন্দ-ঝাড়, একটু নিচে অথৈ জল—যা বইছে অথবা বইছে না, তাকিয়ে কথা শুনছে বলে ভুল হয়। মানুষ যেমন জলের দিকে তাকায়, জলও মানুষের দিকে তাকায় হয়তো।

গুণদাপ্রসাদ রেলের গার্ড ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। প্রমথনাথ এখনও করেননি। শ্যামাসুন্দরী বিদ্যাপীঠে দেখতে দেখতে তিরিশ বছর কেটে গেল। মাস্টারি ভঙ্গীতে উদাত্ত গলায় বললেন, আসলে সব কাগুজে বাঘ। পেপার টাইগার্স!

কী? গুণদাপ্রসাদ আনমনা হয়ে পড়েছিলেন। কাদের কথা বলছ?

পুলিসের।

পুলিসেরও কিছু করার থাকে না অনেক সময়। গুণদাপ্রসাদ শান্তভাবে আগের সুরে বললেন। এমন একেকটা বিচ্ছিরি সময় আসে, যখন আইনকানুন অকেজো হয়ে যায়। চোখ রাঙিয়ে বেটন চালিয়ে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে, এমন কী গুলি ছুঁড়েও সিচুয়েশান কণ্ট্রোলে আনা যায় না। একটু থেমে ফের শ্বাসের সঙ্গে বললেন, আমি দেখেছি। লক্ষ্মীপুর জংশনে একবার—

তুমি মবের কথা বলছ! প্রমথনাথ ছাতিম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু তখন সব কোথায়? ওই যে জায়গাটা দেখছ, ওখানে বডি। আর এই গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দুই সেপাই। উইথ আর্মস।

তুমি দেখেছ?

হুঁউ। স্কুলে ছুটির পর এখান দিয়ে শর্টকাট করা চিরদিনের

অভ্যাস।

শুনলাম টিপটিপ করে বিষ্টি পড়ছিল।

পড়ছিল। সাইক্লোনিক ওয়েদার ছিল। সবই ঠিক। কিন্তু তখন ফ্লাড কোথায় ? ফ্লাড তো এল পরদিন ভোরবেলা।

গুণদাপ্রসাদ পা বাড়িয়ে বললেন, কিছু বোঝা যায় না।

একটু দূরে এই নিচু বাঁধ-রাস্তার ভাঙ্গন। ভাঙ্গনে দু'খানা সবুজ বাঁশ লম্বালম্বি শুয়ে সাঁকো হয়েছে। দুই প্রবীণ ঝুঁকি নিলেন না। ঘুরলেন। পশ্চিমের লাল মেঘের ছটায় পুবের গঙ্গা রক্তগঙ্গা হয়ে গেল হঠাৎ। শিমুল গাছটার ঝাঁকড়ালম্বাটে ডালে কয়েকটা শকুন পুরনো ভাস্কর্যের মতো স্থির। দূরের আশ্রমে মাইকে খোলকত্তালের শব্দ, ভক্তিগীতির ছেঁড়া কলি, একবার এগিয়ে একবার পিছিয়ে আবহমণ্ডলে মিস্টিসিজম ছড়াচ্ছে, মুঠো মুঠো রহস্যমিশ্রিত ভক্তি অথবা ভক্তিমিশ্রিত রহস্য—রক্তগঙ্গার ভয়াল শাক্ত রূপ ধীরে ঘষা খেতে খেতে ভৈরবী হতে হতে কানা বোষ্টুমী হয়ে গেল। ঘাটের মাথায় চায়ের দোকান অব্দি দুই বন্ধু চুপ। শেষে গুণদাপ্রসাদই বললেন, একটু চা খাই এসো।

প্রমথনাথের একটু-আধটু শুচিবাই আছে। সেটা স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু একটু আগের আলোচনা তাঁকে ভেতর-ভেতর এখনও ব্যাডমিন্টন খেলাচ্ছে। শাট্‌লকক একবার তাঁর কোর্টে, একবার গুণদাপ্রসাদের। অগত্যা অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে বসলেন। জানেন, এই প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড এক গেলাস চা না খেয়ে উঠবেন না। তাঁর সঙ্গে খেলা অসমাপ্ত রেখে যাওয়া ঠিক নয়। বললেন. আমি কিন্তু মাটির ভাঁড়ে।

ঘাটে ভিড়টা সন্ধ্যার মুখে বেড়ে যাওয়ার নিয়ম। এদিক-ওদিক থেকে, এমন কী ওপার থেকেও মানুষজন এসে জোটে। কাজে এবং অকাজে। বেশির ভাগ নবীন যুবক। শ্যাম্পু করা চুল, পরনে জিনস পর্যন্ত, অজস্র হাতে ক্যাসেট প্লেয়ার ও ট্রানজিস্টার এবং ধ্বনি-প্রতিযোগিতায় বুড়োহাবড়ারা তিষ্ঠোতে পারে না। তবু মানিয়ে নিতে হয়। পাটের মরসুম। হাজি মেহেরুদ্দিন আড়ত থেকে ভেতর পকেট ভারি করে বেরিয়ে প্রমথনাথকে দেখে আদাব দিলেন।

প্রমথনাথ খুশি হয়ে বললেন, এই যে !

মেহেরুদ্দিন গুণেদাপ্রসাদকে চিনতে পেরে তাঁকেও আদাব দিয়ে বললেন, আরেব্বাস ! বড়বাবু কবে এলেন ? থাকছেন তো কিছুদিন ?

জবাব প্রমথনাথই দিলেন। গুনুবাবুকে আর আমরা যেতে দিচ্ছিনে। সিগন্যালের তার কেটে দিয়েছি। রেল গাড়ি কাঁটালিয়া-ঘাট রোডে আটকে রইল। আর সিগন্যালটি ডাউন হচ্ছে না।

হাজি মেহেরুদ্দিন কিছু না বুঝেই খুব হেসে বললেন, খুব ভাল। খুবই ভাল।

কাঁটালিয়াঘাটের রায়চৌধুরী ভাইদের মধ্যে শুধু বড়বাবু গুণেদাপ্রসাদই টিকে আছেন। মেজবাবু অন্নদাপ্রসাদ হৃদরোগে কলকাতায় গত। সেজবাবু মোক্ষদাপ্রসাদ এই গঙ্গায় চান করতে তলিয়ে যান। ছোটবাবু রণদাপ্রসাদ ক্যান্সারে। চিরকুমার গুণেদা-প্রসাদের বুকের ভেতর তিনটে শুকনো ক্ষত। এইসব ক্ষত থাকলে মানুষ নির্লিপ্ত এবং দার্শনিক হতে বাধ্য। প্রমথনাথ বুঝতে পারেন।

মেহেরুদ্দিন পাছে সেই ক্ষতে খুঁচিয়ে দেন, সাবধানী প্রমথনাথ দ্রুত বললেন, এই একজন প্রত্যক্ষদর্শী. গুনু ! হাজিসায়েব. তুমি ওকে বলো, ঠিক কী হয়েছিল ছাতিমতলায় !

কিসের ? মেহেরুদ্দিন প্রশ্নটা করেই সেকেণ্ডে বুঝলেন। গম্ভীর হয়ে গেলেন। আস্তে বললেন, হুঁ—গাবু !

গুণেদাপ্রসাদ শুধু তাকালেন। মাছের চোখ। প্রমথনাথ বললেন, বলো হাজিসায়েব। দু-দুজন আর্মড কনস্টেবল ছিল কিনা ? তাদের চোখের সামনে থেকে বডি উঠে গিয়েছিল কিনা ?

মেহেরুদ্দিন চারপাশটা দেখে নিলেন। ঘটনার পর থেকে সন্ধ্যার মুখে ভিড়টা ইদানীং কম। যুবকদের আনাগোনাও কমেছে। প্রথম কয়েকটা দিন বিকেল যেতে না যেতে খাঁ খাঁ অবস্থা ছিল ঘাটের। ক্যাসেট প্লেয়ার—ট্রানজিস্টার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখানে-ওখানে রাগী মারকুট্টে চেহারার খাকি পোশাক-পরা সেপাই, হাতে-হাতে মাস্কেট। এখন তারা নেই। আবার আগের অবস্থা ফিরে আসছে দিনে-দিনে। তাছাড়া পাটের গাঁট এসে জমছে পাহাড় হয়ে।

জুট কর্পোরেশন হাওয়া চাগিয়ে দিয়েছে। মেহেরুদ্দিন চাপা স্বরে বললেন, আমার সন্দ আছে মাস্টারবাবু।

কিসের ?

মরা মানুষ কি কখনও জিয়ন্ত হয় ? হয় না। হাজিসায়েব একটু হাসলেন। তবে কথায় আছে 'কাঁটলেঘাটের মরা' !

প্রমথনাথ চার্জ করলেন, ওসব বোগাস ! বডি গেল কোথায় ? গঙ্গার উজোন-ভাঁটি তন্নতন্ন মোটরবোট নিয়ে খুঁজেছে।

মেহেরুদ্দিন তিন-তিনবার সউদি আরবে গেছেন। সেই যাওয়াকে তিনি বলেন, 'ফেলাই' করা। নিজেই রসিয়ে-ফেনিয়ে বর্ণনা করেন, কীভাবে শেষবার ভিসার মেয়াদ ফুরুলেও ছ-সাতটা মাস সে-দেশে ছিলেন। সউদি পুলিস খোঁজে এলে কীভাবে পাহাড়ে কন্দরে লুকিয়ে থাকতেন, সেটা দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। শেষে বলেন, আমার 'এজেং' বড় চালাক। এজেন্ট চালাক না হলে আজকাল মক্কেল জুটবে না। তেমনি চাপাস্বরে বললেন, কাল ভাঙ্গা বাঁধের জন্যে এম এল এ বাবুর কাছে ডেপুটেশাং-এ গিয়েছিলাম। শুনলাম এংকুয়েরি রেপোর্টে লিখে দিয়েছে, ফেলাড। কিন্তু তখন ফেলাড কোথায় বলুন ?

উত্তেজিত প্রমথনাথ বললেন, সেটাই তো বোঝাচ্ছিলাম তোমাদের গুনুবাবুকে। তখন ফ্লাড কোথায় ? তবে এনকোয়ারি কমিশনের কথা বললে, সে-রিপোর্টের কথা আমিও শুনেছি। লিখেছে ; ডিউ টু দা সাইক্লোনিক ওয়েদার অ্যান্ড ফ্লাড, দি প্লেস অফ অকারেন্স ওয়াজ ওয়াশড্ অ্যাওয়ে অ্যান্ড দি বডি কুড নট বি ট্রেসড্ এট্‌সেট্রা এট্‌সেট্রা'।

এই সংলাপ গুণদাপ্রসাদের উদ্দেশে। কিন্তু তিনি মাছের চোখে তাকিয়ে গেলাসে চুমুক দিচ্ছেন। এও খুব বিস্ময়কর দৃশ্য কাঁটালিয়াঘাটে, সামান্য মানুষ জগনের চায়ের দোকানে রায়-চৌধুরীদের বড়বাবুর চা-খাওয়া। জমিদার বংশ। ব্রাহ্মণ। তবে এটা রেলওয়েরই নিঃশব্দ বিপ্লব বলা চলে। গুণদাপ্রসাদ নিরুত্তর দেখে বিরক্ত প্রমথনাথ হাজিসায়েবের দিকে ঘুরলেন। কিছুদিন আগেও প্রসঙ্গটি নিয়ে মুখখোলা যেত না। শুধু দেয়াল নয়, বাতাসেরও কানের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হয়েছিল। প্রমথনাথ খাপ্পা হয়ে

বললেন, ডেডবডি—বুকে বুলেটের ছ্যাঁদা, উঠে পায়ে হেঁটে চলে গেল আর দুই আর্মড সেপাই তাকিয়ে রইল !

জগন মুখ খুলল এবার ! সেও একজন ভোটার। ভোটার লিস্টে নাম থাকলে সব ব্যাপারে মুখ খোলা যায়। বলল, গুস খাইলে খাইতেও পারে ওনারা। তবে অনেক কিছু ঘটে, বাইখ্যা দ্যাওন যায় না। (যা-য়-না দীর্ঘ ধ্বনিযুক্ত)।

মেহেরুদ্দিন শুকনো হাসলেন। ঠিক, ঠিক রে বাবা ! খোদা-তালার দুনিয়ায় সব কিছু সহজে বোঝা যায় না।

জগন অনায়াসে বলল, এট্টু আগে একজন আইছিল—নাম কমু না, কইল কী, গাবুরে দ্যাখ্‌ছে।

প্রমথনাথ মাটির ভাঁড়টা জুতোর তলায় মড়মড় শব্দে গুঁড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেটে হাত ভারতে গিয়ে দেখলেন, গুণদাপ্রসাদ এক টাকার নোট গুঁজে দিচ্ছেন জগনের হাতে। আধুলি ফেরত নিয়ে ছড়িটি তুলে পা বাড়ালেন। মেহেরুদ্দিন বসে রইলেন। ভাগ্নে আরিফ মোটরসাইকেল রেখে ঘাটের মাথায় দাঁড়িয়ে এক-জনের সঙ্গে কথা বলছে। ব্যাকসিটে বসে বাড়ি ফিরবেন হাজিসায়েব ভেতর পকেটে কয়েক শো নোটের বাণ্ডিল। দিনে-দিনে কেমন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, ভালয়-মন্দয় দলাপাকানো। তফাত করা যায় না। শুধু ছমছমানি।

ঘাট থেকে কয়েকপা হাঁটলে চৌমাথা। সোজা এগোলে রেল-স্টেশন। বাঁয়ে গেলে এঁকে-বেঁকে পিচের সড়ক কাটোয়া পৌঁছে দেবে। ডাইনে গেলে বাজার পেরিয়ে পুরনো গঞ্জ, নতুন বাড়ি, রঙবেরঙের তাসের মতো। তাসের উপমা মাথায় আসে স্কুল-শিক্ষকের। অনভূতির তীব্রতা থাকলে এমন ঘটে। বর্তমানের ভেতর অতীত এসে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে। তাসের ঘর ভেঙে যায়।

গুনু ! প্রমথনাথ ডাকলেন।

গুণদাপ্রসাদ শুধু হু বললেন। বাঁধের ওপর ভ্রমণে দুজনেই এখন আস্তে হাঁটছিলেন না। ওদিকটায় বাঁধ সত্ত্বেও প্রকৃতি নৈকষ্য কুলীন। ঝোপঝাড়, গাছপালা, শ্মশান, গঙ্গা—প্রচণ্ড প্রকৃতি। গাবুর ব্যাপারটা সেই প্রকৃতিকে রহস্যে ছমছমিয়ে রেখেছে—দুসপ্তা

পরেও। ছাতিম গাছটাও জৈবতা পেয়েছে। সারা শরীরে চোখ।
গুণদাপ্রসাদের, তার ওপর, ভূতপ্রেতে খুব বিশ্বাস। রেলের গার্ড ছিলেন। পাল্লা দিয়ে সাদা কাপড়পরা মূর্তি দৌড়ুতে দেখেছেন। রাতটা ছিল জ্যোৎস্নার। এ জিনিস কাউকে বোঝানো যায় না।

প্রমথনাথ বললেন, তাহলেই বোঝো।

কী?

গাবুর ব্যাপারটা। গাবুকে কে সদ্য দেখেছে কোথায় জগন বলল। অতএব এবারে দুয়ে দুয়ে যোগ দাও।

সব সময় যোগে মেলে না হে।

প্রমথনাথ গ্রাহ্য করলেন না।···হাজিসায়েব বলল মড়া কখনও জ্যান্ত হয়? একজ্যাক্টলি। সত্যিকার মড়া কখনও জ্যান্ত হয় না। হি ওয়াজ উণ্ডেড, নট ডেড। গাবুর কথা বলছি।

গুণদাপ্রসাদ আস্তে বললেন, অংশু বলছিল, পয়েন্টব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি।

অংশু দেখেছিল নাকি? প্রমথনাথ খিকখিক করে হাসলেন।··· বরাবর দেখেছি, একটা কিছু ঘটলে ডজন ডজন আইউইটনেসের অভাব হয় না। যাই হোক, অংশুকে সাবধান করে দিও।

গুণদাপ্রসাদ আনমনে বললেন, গাবুকে আমার মনে পড়ে। ছুটি ছাটায় এসে দেখেছি। প্রণাম করে গেছে। লাজুক, নম্র ছেলে ছিল—দিস ইজ মাই ইম্প্রেশান!

'মাই' শব্দটার ওপর একটু জোর পড়েছিল। প্রমথনাথ বললেন তুমি বলতে গেলে বরাবর আউটসাইডার। আমাদের ইম্প্রেশান উল্টো। না—তাকে মাস্তান বা সমাজবিরোধী বললে অন্যায় হবে। হি ওয়াজ এ ফাইটার? বলবে, আমি তাহলে প্রশংসা করছি কি? ফাইটার হলেই প্রশংসার যোগ্য, আমি একথা মনে করি না। ফাইটটা কিসের, সেটা আগে বিচার করতে হয়। মহাভারত-রামায়ণ-ইতিহাস সর্বত্র দেখ, অসংখ্য ফাইটার। দুর্যোধনও ফাইটার অর্জুনও ফাইটার। রাম এবং রাবণ—সুলতান মামদ এবং শিবাজী ···যাই হোক, কিসের সঙ্গে কী—গাবু বুঝত না ফাইটটা কার বিরুদ্ধে এবং কেন।

কাগজে দেখেছি পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে নকশাল নিহত।

প্রমথনাথ প্রচণ্ড হাসির চাপে লম্বাটে শরীর সামল্যাতে মোটা-সোটা গুণেদাপ্রসাদের কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, সেই তো বলছিলাম তোমাকে। আজকাল সবই 'পেপারে' দাঁড়িয়েছে। মানে কাগজে হয়ে গেছে। কাগজে নকশাল, কাগজে বাঘ, কাগজে বাঁধ—হ্যাঁ, ও বাঁধ নিয়ে কী কেলেংকারি হয়েছিল জানো? কাগজে মাপ দশ কিলোমিটার ইনটু পাঁচ মিটার ইনটু তিন মিটার। হেঁটে তো এলে। কী মনে হল? পাঁচ মিটার চওড়া. তিন মিটার উঁচু। ভাই গুনু, পুরো দেশটা কাগজে হয়ে গেছে। তুমি আছ কোথা?

গুণেদাপ্রসাদ চুপচাপ হাঁটতে থাকলেন। বাজার ছাড়িয়ে বিদ্যুতের খুঁটি গেছে ভেতর দিকটায়, জালের মতো ছড়ানো মাথার ওপর সুসংবদ্ধ তার। বাজারের দিকটায় রাস্তায় আলো, তারপর সন্ধ্যার ধূসরতা ফুঁড়ে এখানে-ওখানে চৌকো হলুদ আলোর ফালি—ঘরের জানালায়, কোনো রোয়াকেও। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। শেষ আশ্বিনের মিষ্টি হিম আর হঠাৎ শিউলির ঝাঁঝালো গন্ধ। আকাশে কিছু নক্ষত্রের গায়ে গা ঘষে যাওয়ার মতো বুনোহাঁসের ঝাঁক চলে গেল। গুণেদাপ্রসাদ ছুটিতে এসে গঙ্গার বাঁওরে বন্দুক নিয়ে হাঁস মারতে যেতেন। আজকাল হাঁস বসে না খবর নিয়েছেন। তাছাড়া বন্দুক ছিনতাই হওয়ার ভয় আছে। বকুলতলায় দাঁড়িয়ে বললেন, চলি!

প্রমথনাথের আরও বলার কথাছিল। শ্বাস ছেড়ে বললেন, এস। পরে কথা হবে'খন। আমার আবার টিউশনি আছে। যাই, দেখি।...

মেহেরুদ্দিনহাজি একটি কিংবদন্তীসিদ্ধ বাক্য আওড়েছিলেন, 'কাঁটলেঘাটের মড়া' (মুসলিমরা মরা বলেন),প্রমথনাথ বলেছিলেন, ওসব বোগাস! সেটা তর্কের ঝাঁঝ। নিজের সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করতে চাইলে মানুষ চোখ বুজে হাত চালাবেই। অবশ্য ওই প্রবচনটির ধার ক্ষয়ে ক্ষয়ে নেতিয়েও গেছে। বিশ বছর আগেও তল্লাটে কোথাও কেউ কাঁট্‌লেঘাট যাচ্ছি বললেই তার মুচকি হাসি পাওনা হত, তা যতই বাবুগিরি করে বলা হোক না 'কাঁটালিয়াঘাট'

যাচ্ছি' ! শ্মশানটার জন্য এই খ্যাতি-অখ্যাতি। বস্তুত পাড়াকুঁদুলি-দের মুখে ওটি ছিল প্রথাসিদ্ধ গাল, হাজিসায়েবের বাক্যটি। সেই উদ্ধারণপুরের পর গঙ্গার উজোনে কাঁটালিয়াঘাট দ্বিতীয় মহাশ্মশান, ইদানীং যেখানে এক সাধুবাবার বিশাল আশ্রম। প্রহরে প্রহরে মাইকে খোল-কত্তাল, ভক্তিগীতির ছেঁড়াখোঁড়া একটু কলি গাঙেয় বাতাস এপার-ওপার কতদূর টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু এই মিস্টিক ও কোমল ভক্তির বীজ পুঁতেছিলেন পূব থেকে আসা উদ্বাস্তুরা। নইলে ঘোর শাক্ত মাটি, মহাশ্মশান, ভৈরব-ভৈরবী, ত্রিশূল, মড়ার খুলি, কারণবারি, জটা ও হুঙ্কার, হাড়িকাঠ ও খাঁড়া; তাই রক্তে ও মৃতুতে ভয়াল কাঁটালিয়াঘাটে জীবন্মৃত্যুর মাঝের সীমারেখাটি চুঁড়ে পাওয়া যেত না। তিরিশ বছর আগেও ছিল লুপলাইনের হল্ট মাত্র। তার পর স্টেশন হল। প্ল্যাটফর্ম উঁচুও হল। শেসে ওভারব্রিজ পর্যন্ত। বিদুৎ প্রবাহ চালু করে গেলেন স্বয়ং বিদ্যুৎমন্ত্রী। নিছক ঘাট অর্থাৎ শ্মশান থেকে গঞ্জ, গঞ্জ থেকে রীতিমতো টাউনশিপ। এখন কাঁটালিয়াঘাট যাচ্ছি বললে ভালরকম একটা যাওয়াই বোঝায়। তার ফলে সেই রহস্যময় ঘটনাটিও আর ঘটে না, মড়ারা এসে জ্যান্ত হয়ে ট্যাঙস ট্যাঙস করে হেঁটে যায় না। এও প্রবাদ ছিল, 'কাঁটলেঘাটে কে মড়া কে জ্যান্ত, বুঝা কঠিন।' সব প্রবাদ পুরনো শিলালিপির মতো ক্ষয়ে দুষ্পাঠ্য হয়ে গেছে। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের কিছু আগে রাধাপ্রসাদ রায়চৌধুরী জ্ঞাতিদের সঙ্গে লড়ে ফতুর হয়ে কাঁটালিয়াঘাটের পুরনো কাছারি বাড়িটাকেই জমিদার বাড়িতে রূপ দেন। ততকিছু ঝকমকে রূপ নয়, নেহাৎ দোতালা বাড়ি—শেষ ছাদটাও দেখে যেতে সময় পাননি। কপালীতলায় জ্ঞাতিরা আগাগোড়া হেসে অস্থির। চার যোয়ান ছেলের বড় ও মেজ চাকুরে। সেজ ও ছোট মাটি নিয়ে লড়তেন। সেজটি ছিলেন মারকুট্টে ভিলেন। তাঁকে সামলাতে বড় গুণদা-প্রসাদকে মাঝে মাঝে আসতে হত। লোকের মতে, মাটির মানুষ বড়বাবু। অথচ রেলের গার্ড হলে মানুষের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক নষ্ট হয়। শরীরে রেলগাড়ির মতো চাকা গজায়। একই যুক্তিতে বড়বাবু সেজকে বলতেন, 'ছেড়ে দে' এবং চাষীদের সঙ্গে রফা করতেন। রফা করতে করতে কোথায় ঠেকেছি লক্ষ করেছ ?' সেজ

মোক্ষদাপ্রসাদ বলতেন। বড়বাবু চলে গেলে সেজবাবু আবার মাটিতে থাবা হাঁকড়াতেন। কাঁটালিয়াঘাটে তখনও জ্যান্ত-মড়ার সীমারেখাটি 'বুঝা কঠিন ছিল।' মোক্ষদাপ্রসাদকে টেনে নিলেন গঙ্গা, মোক্ষ দিলেন হয়তো, কিন্তু আসল গণ্ডগোলটা অন্যখানে। কাঁটালিয়াঘাটে মাটি ভাল করে না আঁকড়ে ধরলেই বিপদ। জ্যান্ত-মড়ার সীমারেখাটি নিমিষে তছনছ হয়ে যায়। ফলে মোক্ষদাপ্রসাদ কিছুকাল দেখা দিতেন শেষরাতের ফিকে জ্যোৎস্নায় গমক্ষেতের কোনো বুড়ো চাষীকে, যে তার পাকা ফসল পাহারা দিতে ক্ষেতের শিয়রে কুঁড়ে বেঁধেছিল। কাঁটালিয়াঘাটে বিদ্যুৎ আসার পর ভূতের দৌরাত্ম কমেছে।

গুণদাপ্রসাদের আসা সাত দিন হয়ে গেল। মন কিছুতেই বসছে না। শরীরে চাকা ঘুরছে, সারাক্ষণ রাতের মালগাড়ির শব্দ, মাঝে সামনের দিক থেকে ইঞ্জিনের তীক্ষ্ম হুইসল। একটু পরে বোঝেন, আশ্রমের মাইক, এবং কামরূপ এক্সপ্রেস পাস করে যাচ্ছে, খই ফোটার শব্দটা বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল।

বড়বাবু, কবে আসা হল? গুণদাপ্রসাদ এ দিকটায় এলেই প্রণাম পান। এ দিকটায় চাষাভুষো ক্ষেতমজুর মৎস্যজীবী মানুষজন। বিদ্যুৎ এতটা আসেনি। বন্যার পর ত্রাণ ব্যবস্থা দেখতে আসা মন্ত্রীমশাইকে নাকি স্থানীয় বিদ্যুৎবাবু কৈফিয়ৎ দেন, 'উই আর অ'ফুল্লি সরি স্যার! নো ডিম্যান্ড স্যার! নোবডি অ্যাপ্লায়েড স্যার!' প্রমথনাথ মুডে থাকলে ক্যারিকেচারে পাকা। তাঁর সেই ক্যারিকেচার অনুসারে, মন্ত্রীমশাই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে জিগ্যেস করেন, এখানকার কুটিরশিল্প কী? জনপ্রতিনিধি মুচকি হেসে এবং আস্তে বলেন, 'বোমা'! রাষ্ট্রীয় গাম্ভীর্য চিড় খায় এবং মন্ত্রীমশাই শুষ্ক হাস্যে বলেন, 'দেয়ার ওয়াজ এ রিপোর্ট অ্যাবাউট নকশাল অ্যাকটিভিটিজ।' জনপ্রতিনিধি আরও আস্তে বলেন, 'পরে বলব 'খন।' তার পর নাকি জিপের দিকে যেতে কথোপকথনের বাকি অংশ?

'সামবডি ওয়াজ কিল্ড্ ইন এ কনফ্লিক্ট উইথ দা পোলিস?'

'হ্যাঁ। গাবু।'

'কে সে?'

'ছিল একজন। আসলে—'

'এস পির রিপোর্টে দেখলাম হি ওয়াজ এ নকশাল অ্যান্ড হ্যাড বিন ক্রিয়েটিং টেরর অ্যামং দা পিপ্‌ল্‌।'

'বলছি। চলুন।'…

কাঁটালিয়াঘাটের এই লেজের অংশটাই পুরনো এবং বাঁওরের কাছাকাছি বলে মাটিটা নিচু। জল ও মাটি থেকে যারা সারাসরি খাদ্য সংগ্রহ করে, তারা জল ও মাটির ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘর বাঁধবেই। বাঁওরের সঙ্গে হাউলির প্রাগৈতিহাসিক নাড়ির বাঁধন বাঁধা। বাঁওরে মাছ না পেলে হাউলি বুক পেতে ছিল। শুধু মাছ কেন, হেঞ্চা-কলমি-সুসনি শাক, গুগলি-কাঁকড়া-ঝিনুক,পানিফল পদ্ম-শালুক থরে বিথরে সাজানো। ক'বছর সরকারি ফিশারি হয়ে হাউলির দরজা বন্ধ। ওটা একটা গবেষণা-প্রকল্পের রূপায়ণ। তবে বাঁওরটা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি পেয়েছে। তার চেয়ারম্যান স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। তাই বলে খ্যাদোড় বাউরি তার সদস্য হতে আইনে বাধা আছে। সে মৎস্যজীবী নয়। হেতু কুনাইও নয়। বড়বাবুকে অপ্রত্যাশিত দেখে দুজনেই উঠে এল। পোনাম বড়বাবু। পোনাম বড়বাবু! তারপর প্রবীণ বাউরি মানুষটি বাঁওরের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে বলল, আর হাঁস আসে না বড়বাবু!

গুণদাপ্রসাদ হাসলেন। হাঁস কি হবে? বন্দুক এনেছি?

খ্যাদোড় অপ্রস্তুত। হেতুচরণ বলল, 'ভরম' সহজে ঘোচে না মানুষের। বড়বাবুকে দেখলেই কাঁধে বন্দুকটি দেখি। সেও হাসতে লাগল। হাতে সুতোর তকলি। বাঁওরে জাল ফেলতে দেবে না, মাগঙ্গা আছেন। তিনি গভরমেণ্টের।

গুণদাপ্রসাদ বললেন, গাবু মারা পড়ল!

আচমকা এই বাক্যেটি বড়বাবুর বন্দুক ছোঁড়ার পুরনো আওয়াজ। তখন আওয়াজটি শুনলেই কেউ-না-কেউ ছুটে বেরিয়ে যেত বাঁওরের দিকে। বড়বাবু হাস মেরেছেন। একটা-দুটো ছিটকে গিয়ে পানার ভেতর কী শোলার ঝাড়ে যদি লুকিয়ে থাকে, পাখনায় বা ঠোঁটে ক্ষত। তাঁর গুলিবিদ্ধ হাঁস কুড়োনোর জন্য মঘা ছিল বাঁধা। মঘা হালমানা। 'রাজবাড়িতে' তিন পুরুষের লোক। অবশ্য এটাই গুণদাপ্রসাদের মতে, 'হিস্টোরিক্যাল জোক'—

জমিদার বাড়ি মানেই রাজবাড়ি, তা সে নেহাৎ ক্ষয়াখবুটে দোতলা কী একতলাই হোক।

হেতু ও খ্যাদোড় মুখ তাকাতাকি করে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে। গুণেদাপ্রসাদ ছড়িটি বগলে গুঁজে পাঞ্জাবির পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করলেন। নাকে নস্যি গুঁজে রুমালে নাক মুছলেন। তখন খ্যাদোড় আস্তে বলল, কেউ মরতে চাইলে পরে তাকে ধনন্তরিও বাঁচাতে পারে না, বড়বাবু!

কেন? গাবু মরতে চাইবে কেন?

খ্যাদোড় জবাব খুঁজে পেল না। হেতু তর্কালিতে একটা পাক খাইয়ে বলল, গাবুকে মারে কে?

গুণেদাপ্রসাদ বললেন, ছাতিমতলায় পড়ে ছিল। পুলিস পাহারা দিচ্ছিল।

দিলে কী হবে?

খ্যাদোড় একটু চটে গিয়ে বলল, হ্যাঁলি, ছাড়ো দিকিনি! কাঁটলেঘাটে চিরটাকাল খালি হ্যাঁলি। শুনে শুনে কান পচে গেল।

হেতু হাঁসল।…তুমি বলছো হ্যাঁলি, কতলোকের কাছে হ্যাঁলি না! সত্যি।

গুণেদাপ্রসাদ বললেন, সত্যিটা কী? 'কী'-এর ওপর খুব জোর দিলেন।

গাবুকে মারতে পারেনি দারোগাবাবু!

তাহলে লাসটা পড়ে ছিল কার?

গাবুরই। আবার কার?

খ্যাদোড় এত চটে গেল যে ধপাস করে গাব গাছটার তলায় ভিজে মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ল। দিন দশেক আগেও এখানে জল ছিল। খটখটে রোদ্দুরে মাটিটা শক্ত হয়েছে। এমন কী পচা ঘাসের গোড়া থেকে কচি আঁকুরও মুখ বাড়িয়েছে। আর দশটা দিন পরে সব আগের মতো সবুজে ছয়লাপ হয়ে যাবে। গুণেদাপ্রসাদও একটু বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু না হেসে পারলেন না খ্যাদোড়ের অবস্থা দেখে। বললেন, হ্যাঁর রে! বুঝলাম না হয় কাঁটলেঘাটে কোনো-কোনো মড়া জ্যান্ত হয়! গাবুও কি জ্যান্ত হয়ে হেঁটে চলে গেল?

তাই তো যেয়েছে। হেতুচরণ শক্তমুখে বলল। থানায় যেয়ে খবর করুন। জানতে পারবেন।

পুলিস বাধা দেয়নি?

দিয়েছিল। বন্দুকও ছুঁড়েছিল গুলি ফস্কে গেলে কী করবে?

খ্যাদোড়ের মনে হল, একটা রফা করা উচিত। গলা ঝেড়ে বলল, আসলে সেই সাঁজবেলা থেকেই সাইকোলোং। টিপটিপিয়ে বিষ্টি। খুব হাওয়া ছিল, বড়বাবু। দেবেন গো, আমাদের দেবেন চৌকিদার। বাড়ি থেকে কেটলি নিয়ে পুলিসদের জন্যে চা আনতে যেয়েছিল। দারোগাবাবু তখন থানায় ফিরে ফোং পাঠিয়েছেন হাসপাতালে। অ্যামবুলেং আসবে। ডোম আসবে। বোডি তুলবে। নিয়ে যেয়ে মশাই, কাটাকুটি করবে-টরবে—মানে, যা-যা সব আইনে করে।

গুণদাপ্রসাদ বলেন, তারপর?

খ্যাদোড় মুখে ঐতিহ্যগত রহস্য এনে গলার ভেতর বলল, গাবুর মাকে আপনি দেখেছেন।

হুঁ, দেখেছি।

কালীতলায় হাটবারে ভর হত। মাথায় জটা ছিল।

জানি, জানি।

মায়ের মোন, বড়বাবু। মরে যাক কী বেঁচে থাক, মা। কিনা বলুন আপনি?

তাতো বটেই!

ছেলের বোডি বুকে তুলে কাঁদতে কাঁদতে মা যখন চলে যায়, তখন—দম ছেড়ে খ্যাদোড় বলল, তখন হাতের বন্দুক হাতেই থাকে বড়বাবু! মানুষের কিছু করার থাকে না। দেবেনের কাছে শুনেছি, পুলিস দুজন 'এংকুরির' সামনে মুখ খুলতেই পারেনি। খালি ফ্যালফেলিয়ে তাকায় আর টসটসিয়ে জল পড়ে—এমন অবস্থা। শেষে সাসপেং।'

ঠিক এমন কিছুই গুণদাপ্রসাদ বোঝাতে চেয়েছিলেন প্রমথ-নাথকে। খ্যাদোড়ের মুখে তার সায় পেয়ে খুশি হলেন। বললেন, হ্যাঁ—এমন হয়। আমি দেখেছি।

হেতুচরণ নড়ে উঠল। লম্বা নিঃশব্দ হেসে বলে উঠল, তাইলে দাঁড়ালটা কী? হরেদরে এক।

খ্যাদোড় বলল, কক্ষনো এক লয়। তুমি অন্যকথা বলছিলে বড়বাবুকে।

গুণদাপ্রসাদ তর্ক দেখে বললেন, ছেড়ে দাও। ঠিক যে-সুরে বলতেন তার ভাই গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ মোক্ষদাপ্রসাদকে। পা বাড়িয়ে মনে মনে বললেন, সায়েন্স কতটুকু জানে? সে তুমি চাঁদেই যাও, আর মঙ্গলগ্রহেই যাও। ওই গাছটা দেখতে পাচ্ছ? একবিন্দু বীজ থেকে অত বড় গাছ। এক্সপ্লেন করো, দেখি। কোথায় ছিল, কীভাবে এল?

বাঁধের দিকে যাচ্ছেন দেখে হেতুচরণ চেঁচিয়ে বলল, পারবেন না বড়বাবু! বাঁশ আছে বাঁশ! ভাঙ্গা বাঁধ।

হুঁ, সেই বাঁশের সাঁকো। মনে পড়ায় গুণদাপ্রসাদ সোজা বাঁওরের দিকে হাঁটতে থাকলেন। কিছুতেই মন বসছে না। কীভাবে কাটাবেন কাঁটালিঘাটে? শরীরে গতি নিলে এই ভুলটা হয়। যেন আর থামতে হবে না। থামলেও, ভেবেছিলেন, কাঁটালি-ঘাট তো আছে। গঙ্গা, বাঁওর, বন্দুক, প্রকৃতি। এক সপ্তাহেই টের পাচ্ছেন প্রকৃতিও মানুষের চরম সান্ত্বনা নয়, চূড়ান্ত ঠাঁই নয়—অন্তত যতক্ষণ বেঁচে আছেন। মরলে অবশ্য আলাদা কথা।

বাঁওরের গাঢ় হলুদ বর্ণের জলের সামনে পৌঁছে মনে হল, না—মরার পরও এক ধরনের জীবন আছে। প্রেতজীবন। সেই জীবনে তিনি কী করবেন? ভাবলেই বুকে হাতুড়ির ঘা। জ্যোৎস্নারাতে মালগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা হতভাগিনী শ্বেতবসনাকে মনে পড়ে।...

বিকেলে গুণদাপ্রসাদ ভাবলেন স্টেশনে যাবেন। রসময় ধাড়া কাঁটালিয়াঘাট রোডে বদলি হয়ে এসেছেন, এ একটা দারুণ আবিষ্কার। সাহেবগঞ্জ, মোতিহারি, হাথিয়াগড় জংশনের দিনগুলো মনে পড়ে যায়। পারাপারের ঘাটের কাছে চৌমাথায় এসে পড়ে গেলেন ওতপেতে থাকা প্রমথনাথের পাল্লায়। প্রমথনাথ হাসলেন।... ওয়েটিং ফর ইউ। চলো, ছাতিমতলায় যাই। অংক কষে

বুঝিয়ে দেব।

নাঃ। গুণদাপ্রসাদ বাঁকা মুখে বললেন। ছেড়ে দাও।

সব কিছু ছাড়া যায় না হে গুণ! হাম কমলিকো ছোড় দিয়া, লেকিন কমলি হামকো নেহি ছোড়া।

অগত্যা গুণদাপ্রসাদ বললেন, যাবে তো চলো বরং স্টেশনে যাই। আমার এক কলিগ আছে।

চলো! প্রমথনাথ পা বাড়ালেন। স্টেশন রোডের দুধারে শিরীষ, অর্জুন, অশত্থ, বটের সার। এই রাস্তাটুকু সায়েবরা পাকা করেছিল। একটা রেশমকুঠি ছিল গঙ্গার ধারে। সেটাই গরজ। এখন সেখানে হাটতলা। গঙ্গার পাড়ে পুরনো কালীমন্দির মেরামত করা হয়েছিল কাত্যায়নী অর্থাৎ গাবুর মায়ের শরীরে দেবীর অনুপ্রবেশের পর। কায়েতবাড়ির বিধবা। শ্যামলা রঙ, ছিপছিপে, কালো চুলে রাতারাতি কয়েকটা জটা। ভরের সময় প্রশ্ন করলে আমুল সঠিক উত্তর দিতেন। গাবু হালপেন্টুল পরে জিলিপি খেতে খেতে হাটে ঘুরত। প্রমথনাথই তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেই গাবু। ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন স্কুল শিক্ষক।

প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড এতক্ষণে হেসে ফেললেন। ইঞ্জিনের হঠাৎ-ফোঁস মনে পড়ায়।

কী হল? হাসছ যে গুণু।

এমনি।

প্রথমনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, রিউমার বেড়ে যাচ্ছে। একটু আগে হাজারিলালজির আড়তে শুনলাম, গাবুকে ওপারে তারাতলায় দেখেছে কে। শুধু দেখা নয়, মিটিং করছে বলেছে। লালজি সিরিয়াস লোক।

কিসের মিটিং?

তা বোঝা গেল না। গাবুকে তো আমি ভাই কখনও মিটিং—ফিটিং করতে দেখিনি। পার্টি-ফার্টি করতেও দেখিনি। মাঝে-মাঝে দেখা হত। প্রণাম করত। বলতাম, ফাইনাল একজামিনেশানটা দিলিনে কেন বাবা? আফটার অল, একটা ডিগ্রি না থাকলে চাকরি-বাকরি—মানে, এমনিতেই ঘরে-ঘরে এম. এ পাস করে—

তো গাবু…

গুণেদাপ্রসাদ ছড়ির ডগায় রাস্তার মাঝখান থেকে ইটের টুকরোটা ঠেলে ফেলে দিলেন। হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, কাতুকে তুমি বলতে কাতুরাণী! একটা পদ্যও লিখেছিলে মনে পড়ছে।

প্রমথনাথ গালে থাপ্পড় খাওয়ার মতো চমকে উঠেছিলেন। তারপর মুখ উঁচু করে হা হা শুষ্কহাস্য হাসলেন। …তুমি ব্যাচেলার লোক। তোমার আবার এসবও আছে নাকি? রিসেণ্ট অ্যাটাক?

না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

প্রমথনাথ জনহীন রাস্তায় গাঢ় স্বরে বললেন, যৌবনের ধর্ম। তবে তুমি যতটা ভেবেছ বা ভেবেছিলে, অত কিছু নয়। কাতুকে নিয়ে পদ্য লেখা বা স্বপ্ন দেখার লোক কাঁটালিয়াঘাটে অনেক ছিল। গরিব ভদ্রলোকের বউ যৌবনে বিধবা হলে অনেক কিছু ঘটবার সম্ভাবনাও থাকে। সবাই তো তোমার মতো ব্রহ্মচারী নয়।

সরি! আই ডিডন্ট্ মিন দ্যাট, প্রমথ।

প্রমথনাথ বাল্যবন্ধুর কাঁধে ভালবাসার হাত রেখে বললেন, না, না। আমি রাগ করিনি। জাস্ট একটা রিয়্যালিটির কথা বলছি—এ ক্রুড রিয়্যালিটি। কাতুকে সেটা কেন করতে হয়েছিল। অতএব কাতুও একজন ফাইটার ছিল। তুমি বলবে, দেবীর ভর। আর আমি বলব, সেটাই তার ফাইট। একটা জিনিস দুদিক থেকে দেখা আর কী!

কথা ঘুরিয়ে দিলেন গুণেদাপ্রসাদ। …তুমি বলছিলে গাবুর ব্যাপারটা অংক কষে বুঝিয়ে দেবে!

প্রমথনাথ সতর্কভাবে চার পাশটা দেখে নিয়ে বললেন, ওই কালীমন্দির। গোবর্ধন চন্দ্রমশাই মন্দিরের নামে ছাতিমতলার উল্টোদিকে—কাল জায়গাটা তুমি আশা করি লক্ষ্য করেছ, খানিকটা ধানক্ষেত, খানিকটা জঙ্গল হয়ে আছে—সামান্যই জঙ্গল অবশ্য।

করেছি। গুণেদাপ্রসাদ আগ্রহে বললেন। চন্দ্রমশাই জমি দিয়েছিলেন নাকি?

হুঁ।

তারপর?

একলপ্তে সাত বিঘে পাঁচ কাঠা জমি। কাতু যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন একে—ওকে দিয়ে সাত বিঘে চষিয়েছিল। বাকিটুকু পারেনি। হঠাৎ মারা গেল। তারপর গাবু ভোগদখল করত। পুজো আচ্চায় যা লাগে, রেগুলার দিত। মায়ের পুজোরি কাতুই বহাল করে গিয়েছিল—তুমি চিনবে, মোহনের ছেলে জিতেশকে। গাবু তো কায়েত—বামুন নয়।

বুঝলাম। বামুন—কায়েতে বিবাদ।

হাত তুলে নাড়তে নাড়তে প্রমথনাথ বললেন, নো, নো। জিতেশ গাবুর রান্না পর্যন্ত করে দিত।

তাহলে চন্দ্রমশাইয়ের ছেলেদের সঙ্গে?

এগেইন ইউ মিস্‌ড্‌ দা টার্গেট। স্কুল শিক্ষক চোখে ঝিলিক তুলে হাসলেন। চাষ জমির বর্গা করত মুসলমানপাড়ার সোলেমান। তার নাম বর্গাদার বলে রেকর্ড হয়েছিল। না—বিবাদ তার সঙ্গেও নয়।

তবে কার সঙ্গে?

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে। ফিসফিস করে বললেন। অনেক রথীমহারথী জড়িত। এইটটি টুতে বারোয়ারি পুজো কমিটি হল। ব্যস, সেই সূত্রপাত। গাবু রেকর্ড বের করে আনল। সিক্সটির রিভাইজড্‌ সেট্‌লমেণ্ট রেকর্ড। তাতে শ্রীমতি কাত্যায়নী দেবী'র নাম। সবাই হতবাক।

কিন্তু সম্পত্তি তো দেবোত্তর।

কাতু ধূর্ত মেয়ে ছিল। প্রমথনাথ হাসতে থাকলেন। তাছাড়া তখন তার দাপট বলো দাপট, ইনফ্লুয়েন্স—প্রচুর। প্রচুর। দম নিয়ে বললেন, এখন একটাই রাস্তা খোলা ছিল। চন্দ্রমশাইয়ের উইল নিয়ে মামলা লড়া। তবে তাতেও সুবিধে হত কি না আই ভেরি মাচ ডাউট। গাবুকে যদি বা হটানো যেত, সোলেমান? সে বর্গাদার। শুধু তাই নয়, সে গাবুর চেলা বলতেও পারো। হিন্দু-মুসলিম রায়ট বাধতেও পারত। অতএব মেক গাবু এ নকশাল অ্যান্ড স্ম্যাশ হিম।

গুণদাপ্রসাদ আস্তে বললেন, মফস্বল গ্রামগঞ্জে আজকাল দেখছি বড্ড জটিল অবস্থা।

সে সর্বত্রই। কোথায় নয়? আসলে, হিস্টোরিক্যাল পার্স-পেক্‌টিভ থেকে বলছি, মানুষের সমাজের ভেতর পচ ধরলেই জটি—

কিন্তু গাবু গুলি খেয়েও চলে যায় কী করে? দুজন আর্মড কনস্টেবল ছিল।

প্রমথনাথের আর হাসির ইচ্ছা নেই। বললেন, তোমাদের বাড়িতে তো টি ভি আছে? দিল্লি, বাংলাদেশ ক্লিয়ার আসে।

টিভির কথা কেন? গুণদাপ্রসাদ অবাক হয়ে গেলেন। খ্যাদোড় ঠিকই বলছিল। কাঁটালিয়াঘাটে হেঁয়ালি চিরাচরিত।

প্রমথনাথ অন্যমনস্কভাবে বললেন, আমার জামাইবাবাজি সম্প্রতি একটা ছোট্ট টিভি দিয়ে গেছে। আমার তত আগ্রহ নেই। তবে মাঝে—মাঝে চোখে পড়ে। দেখি। হিরোকে গুলি করেছে। পড়ে গেছে। ভিলেন ভাবল, দিয়েছি ব্যাটাকে খতম করে। ভেবে যেই কাছে না আসা, হিরো এক লাফে তাকে কাত করে দিল। মানেটা বুঝলে তো? গুলি লাগেনি। ভান করে পড়ে ছিল।

প্ল্যাটফর্মে উঠে গুণদাপ্রসাদ ফের বললেন, দুজন আর্মড কনস্টেবল ছিল!

থাকলে কী হবে? হঠাৎ চটে গেলেন স্কুল শিক্ষক। সাইক্লোনিক ওয়েদার। ছাতিমগাছের নর্থ ইস্টে বডি। সেদিক থেকে সাইক্লোন, বৃষ্টির ছাঁট। লজিক্যালি বলা চলে সেপাইরা ছাতিমগাছের সাউথ-ওয়েস্টে চলে এসেছিল। সেই ফাঁকে গাবু কেটে পড়ে। ইজি সলিউশান!

গুণদাপ্রসাদ ভাবলেন খ্যাদোড়ের বৃত্তান্তটি বলবেন। বললেন না। প্রমথনাথ গাঁজা বলে উড়িয়ে দেবেন। তিনি তো তাঁর মতো কোনো জ্যোৎস্নারাতে নির্জন প্রান্তরে মালগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ুনো শ্বেতবসনা নারীকে দেখেননি।···

কয়েকটা দিন একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব, বাস্তব—অবাস্তবের গুলিয়ে যাওয়া, বারবার জ্যোৎস্নারাতের ভূতটি চোখে পড়া—গুণদাপ্রসাদ নিজের এই বিপন্নতার দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকেন। মোক্ষদাপ্রসাদের বউ রমলার দুই মেয়ে। বড়টি পাত্রস্থ হয়েছে

বরানগরে, তার জেঠুর চেষ্টায়, ফলে রমলা বড়ভাসুরের প্রতি কৃতজ্ঞ। দোতলার একটা ঘর ছেড়ে দিয়ে সেবাযত্ন করছেন। ছোট মেয়ে সোমার ক্লাস নাইন চলছে। ফেল করে—করে নাইনে ঠেকে গেছে। একটু রগচটা স্বভাব। বাবার অনেকটাই পেয়েছে যেন। নিচের তলাটা রণদাপ্রসাদের ভাগে পড়েছিল। তার বউ সুমিতা 'নিউট্রিশান সেণ্টারে' দুধ—মাইলো বিলিয়ে মাসে শ'খানেক টাকা পায়। দুই ছেলে অংশু ও রঞ্জু, এক মেয়ে দীপা। অংশু কলেজে এক বছর পড়েছিল। রঞ্জু এখন ক্লাস সিক্সে। দীপা হাঁটি—হাঁটি পা—পা করে উঠোনে তুলকালাম বাধায়। সুখের কথা, দুই জায়ে খুব মিলমিশ আছে। ছেলেমেয়েরা দুই বিধবার ঘরেই কাড়াকড়ি করে খায়। সুমিতার সকালে ডিউটি! ততক্ষণ দীপা রমলার জিম্মায়। বেশ ভাল লাগে গুণদাপ্রসাদের। মোক্ষদা-প্রসাদের ভিলেনি কীর্তি শেষ দশ বিঘেয় বর্গাদারের নামে রেকর্ড ঠেকানো। নইলে ঝামেলা হত। লাঙল যার, জমি তার, সেটা উচিত কথা—গুণদাপ্রসাদের হিসাবে। কিন্তু এতগুলো দ্বিপদ প্রাণীর অবস্থা শোচনীয় হত। রমলা তাঁর দেবরের জমির তদারক করেন। মঘা হালসানা বুড়ো হয়েছে। তার ছেলে রতনের খেতাব মাহিন্দার। একজোড়া বলদ রেখে গেছেন মোক্ষদাপ্রসাদ। রমলার চেষ্টায় এই সব কৃষি ব্যবস্থা টিকে আছে। কলকাতাবাসী প্রয়াত মেজভাসুরের ছেলেমেয়েরা কৃষি বোঝে না। জেঠুর মতোই মাটি চেনে না। তাই মাটির ভাগ নিতে আসে না। কাকারা বেঁচে থাকায় সমর কালীপুজো দেখতে আসত। কাঁটালিয়াঘাটে সাতখানা কালী প্রতিমা ছিল তখন। দুর্গাপুজো খান দুই। তবে শাক্ত মাটিতে কালীপুজোর ধুমটাই বেশি। অতীতে নরবলির কথা শোনা যায়। এখন পাঁঠাবলির রেওয়াজও কমিয়ে দিচ্ছে পূর্ববঙ্গীয় মিস্টিক ভক্তির প্রভাব। তবে বিধ্বস্ত রেশমকুঠির বুকে গজিয়ে ওঠা হাটতলার শিয়রে সুপ্রাচীন কালীমন্দির, ক'বছর থেকে যা নিয়ে বিরোধ, এখনও প্রচুর পাঁঠার রক্ত না দেখলে জেগে ওঠে না। বড় বেশি রক্ত, তাই যেন বড় বেশি বিরোধ—গুণদাপ্রসাদের ধারণা হয়েছে এতদিনে। ওই পুরনো দেবী—ভাস্কর্য বিসর্জনের নয়। বিসর্জিত হয় একটি পশুরক্তচিহ্নিত ঘট, যা প্রতীক, কাত্যায়নী

জটার ওপর যেটি ধারণ করে গঙ্গার বুকে জলে নামত এবং প্রতীকসহ ডুব দিত। উঠত প্রতীকহীন সিক্ত জটা নিয়ে নাকি আধ ঘণ্টা পরে। আ-ধ-ঘ-ন্টা! গুণদাপ্রসাদ শুনে অবাক। প্রমথনাথের মতে, প্র্যাকটিস। তুমি প্র্যাকটিস করো, তুমিও পারবে। যোগবল? দ্যাটস রাইট, গুণু! ওটা আদতে এক ধরনের এক্সাসাইজ। প্রমথনাথ বড় জ্বালাচ্ছেন দেখে গুণদাপ্রসাদ এড়িয়ে চলতে শুরু করেছেন ক্রমশ। বাড়িতে বলা আছে, 'বেরিয়েছেন।'

তবে সত্যিই বেরোলে। টো টো করে ঘোরেন। শর্টকার্টে রেল কোয়ার্টারে রসময়ের কাছে, সেখান থেকে মাঠ ঘুরে বাঁওরে, কোনো সময় কাত্যায়নীর নামে রেকর্ডকরা ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে সেই ছাতিম তলায়। বাঁধের নিচের সমতল একটুকরো জায়গায় ঝোপ-ঝাড় ফের চিকন হয়েছে। পলির দাগ ধুয়ে গেছে বৃষ্টিতে। কাল-কাসুন্দে, আকন্দ, কুঁচফল, নাটাকাঁটা, শেয়াকুলের ভেতর হিজল, জাম, জারুল, ভাঁড়ুলের উঁচু-উঁচু উদ্ভব। সায়ণ্টিস্ট! এক্সপ্লেন করো।

আদাব বড়বাবু!

গুণদাপ্রসাদ পিছু ফিরে দেখতে পেলেন মাঝখানে সিঁথি একরাশ চুল, কয়রা চোখ, তামাটে গড়নের যোয়ান। পরনে লুঙ্গি, হাফহাতা হাওয়াই শার্ট, খালি পা। একটা হাতে গামছায় কী একটা জড়ানো। তার পেছনে সমবয়সী, হাঁটু অব্দি গুটোনো ফুলপ্যাণ্ট জংলি ছাপমারা স্পোর্টিং গেঞ্জি, চুলে কেতা আরও একজন। সে বলল, নমস্কার বড়বাবু। বেড়াতে বেরিয়েছেন!

প্রথম জন হাসল। আমার নাম মাতো, বড়বাবু।

দ্বিতীয় জন বলল, সোলেমনের ছেলে, বড়বাবু। আমাকে অবশ্য চিনবেন। আমি সেই কালো। সেজবাবুর বডিগার্ড ছিলাম।

গুণদাপ্রসাদের বুকের ভেতর হাতুড়ি পড়তে লাগল। মনে পড়েছে, মোক্ষদাপ্রসাদের সঙ্গে এই রকম সব ছেলে ঘুরত। মোক্ষদা-প্রসাদ বলত, বডিগার্ড ছাড়া আজকাল চলে না। গুণদাপ্রসাদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

মাতো বলল, আপনি থাকলে এসব হত না, বড়বাবু ! বাপজি আপনার কথা খুব বলে। বলে, কাঁটালঘাটের মালিক ছিলেন বড়বাবুরা। বলে, আপনার বন্দুকের টিপ ছিল। পাখি উড়িয়ে দিয়ে তবে গুলি করতেন।

কালো চোখে একটা ইশারা করে বলল, দেখা না একবার বড়বাবুকে। মালটা কেমন বলতে পারবেন।

মাতো কাছে এসে গামছায় জড়ানো জিনিসটা বের করলে গুণদাপ্রসাদ চমকে উঠলেন। একটা লম্বাটে দিশি পিস্তল। দ্রুত বললেন, ভাল। কিন্তু এ দিয়ে কী করবে তোমরা !

কালো হাসল। যাই করি, মালটা কেমন দেখলেন বড়বাবু ?

ভাল।

মাতো ও কালো বাঁধের ভাঙ্গা অংশটার দিকে পা বাড়ালে গুণদাপ্রসাদ কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাকলেন, শোনো, শোনো।

দুজনে ঘুরে দাঁড়াল। চারের দশকে রমাপ্রসাদ যখন কাঁটালিয়াঘাটে আসেন, তখনও এ দিকটায় জঙ্গল। বাঘ ছিল। সেই রকম, বাঘের মতো ঘুরে দাঁড়ালো, চন্দনে চাউনি। বাঘগুলো মানুষ হয়ে ফিরে এসেছে। আবার বাস্তব-অবাস্তবে জড়িয়েমড়িয়ে যাচ্ছে। গুণাদাপ্রসাদ মাথা ঠিক রেখে একটু হাসলেন। ··গাবুর ব্যাপারটা কী হয়েছিল হে ?

কালো নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বলল, গাবুদার কী হবে ? দারোগাবাবু তাড়িয়ে এনে ওকে ওইখানটাতে গুলি করেছিল। করুক না। এক গাবু যাবে, আরেক গাবু আসবে।

বর্গাদার সোলেমানের ছেলে মাতো বলল, তাই বলে ওই জমির ধান ষষ্ঠীবাবুদের ভোগে লাগবে না। গাবুদা বলেছিল, আমি না থাকলে আমার অংশ বিলিয়ে দিও। তাতে বাপজির আপত্তি নাই, বড়বাবু !

ওরা চলে গেলে গুণদাপ্রসাদ গুম হয়ে পা বাড়ালেন। মাটির এত ঝামেলা। কিছু বোঝা যায় না। একবার মনে হচ্ছে, কাত্যায়নী কেন নিজের নাম রেকর্ড করিয়েছিল—করিয়েই নিজের ছেলের মৃত্যুর কারণ হল, আবার মনে হচ্ছে, এসব কিছু ঘটত না—যদি তিনি সাহস করে ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে ঝিরঝিরে বৃষ্টির

রাতে…

জোরে মাথা দোলালেন গুণদাপ্রসাদ। না, না। তাহলেও ভুল হত। দেবীর প্রাপ্য, দেবীর চায়েস—তাঁর মতো নিছক মানুষ গ্রহণ করে ভীষণ বিপদে পড়ে যেতেন। এদিকে কেলেঙ্কারির একশেষ হত। রমাপ্রসাদের জ্ঞাতিদের সঙ্গে যোগ দিতেন কাতুর বাবা প্রভাকর ঘোষ। কাঁটালিয়াঘাটে তখন দুর্ধর্ষ মানুষ বলতে ঘোষ-বাবুই ছিলেন। রমাপ্রসাদের পাশে না দাঁড়ালে এই মাটিটুকুও চলে যেত অন্যের হাতে। তাছাড়া মাতাল মানুষ। তেমনি গোঁয়ার। মেয়ের পাত্র ঠিক করাই ছিল। অন্য কিছু হলে সহ্য করতেন বলে মনে হয় না।…

দুপুরে দোতালায় খাটে শুয়ে ভাতঘুমের রেশটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। তাহলে কী জ্যোৎস্না রাতে মালগাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা শ্বেতসনা কাত্যায়নীকেই দেখেছিলেন? বুকটা হু হু করে উঠল! বুঝতে এত দেরি হয়ে গেল!

জেঠু, ঘুমোলেন নাকি?

সোমাকে দেখে গুণদাপ্রসাদ বলেন, না রে! আয়! বোস এখানে।

সোমা বলল, জেঠু জানেন কী হয়েছে?

কী রে?

গাবুদাকে বেলডাঙ্গার হাটে মিটিং করতে দেখেছে। নাকুদা দিব্যি করে বলল, গাবুদা! মুখে দাঁড়ি গজালে কী হবে? গলার স্বর?

গুণদাপ্রসাদ হাসবার চেষ্টা করে বললেন, খুব রিউমার ছড়াচ্ছে তাহলে।

সোমা সিরিয়াস হয়ে বলল, রিউমার নয়। তারাতলায় পোস্টার পর্যন্ত পড়েছে। অঞ্জলি স্বচক্ষে দেখে এসেছে। পোস্টারে বড়-বড় লেটারে লেখা আছে, গাবুদা সামনের রোববার মিটিং করতে আসবে। খুব হিড়িক পড়ে গেছে—অঞ্জলি বলল।

গাবু দেখছি তোদের হিরো ছিল, না!

সোমা রাঙা হয়ে ভ্যাট্ বলে বেরিয়ে গেল। গুণদাপ্রসাদ উঠে

বসে নস্যি নিলেন। আজকাল এই হয়েছে ; হিন্দি ফিল্মের ইমপ্যাক্ট। অবশ্য প্রমথনাথের মতে, গাবু মস্তান বা সমাজবিরোধী ছিল না। ফাইটারই ছিল। তবে শেষে বুঝেছেন ফাইটটা দেবোত্তর সম্পত্তি। কেননা গাবু অর্জুন না দুর্যোধন, সেটা সাব্যস্ত করতে পারছেন না প্রমথনাথ। ফের বাস্তব—অবাস্তবে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেল। খ্যাদোড় বলছিল, কেউ মরতে চাইলে ধনন্তরিও তাকে বাঁচাতে পারে না। এও গোলমেলে ব্যাপার। গাবু মরতে চেয়েছিল কেন? আসলে হয়তো ব্যাপারটা যে-যার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছে। কিন্তু কাতুর ছেলে 'লেজেন্ডারি ফিগার' হয়ে উঠছে কেন? 'কেন'র চোটে প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড উত্যক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত করে ফেললেন, এখানে থাকবেন না। কলকাতায় অন্নদাপ্রসাদের ছেলেদের কাছে গিয়ে থাকবেন। চেতনা-অবচেতনার এই সংঘর্ষ আর সহ্য হচ্ছে না।...

'জনগণ তৈরি থাকুন! চাষীভাইরা তৈরি থাকুন! কাঁটালিয়ার মাঠে ফসল পাকার সময় আমাদের সবার গাবুদা এসে যাবে।'

গুণদাপ্রসাদ থমকে দাঁড়িয়ে লাল হরফে ছাপানো পোস্টারটি পড়ছিলেন। মুখে ধীরে ধীরে উত্তেজনা ফুটে উঠল। পা বাড়ালেন বাজারের দিকে। আবার পোস্টার চোখে পড়ল। ডাইনে বাঁয়ে শ্রেণী-বদ্ধ পোস্টার—একটার পর একটা। মহাশ্মশানের দিক থেকে আশ্রমের মাইকে মিস্টিসিজম এগিয়েপিছিয়ে পোস্টারগুলিকে স্পর্শ করছে। পোস্টারগুলি সুপ্রাচীন শাক্তপ্রতীকে রূপ নিতে নিতে জটা, রক্ত, মড়ার খুলি, কারণবারি, কাত্যায়নীর ভৈরবী চেহারা হয়ে উঠেছিল : ঝাপসা করে দিচ্ছে মিস্টিক ভক্তি-বাষ্প। কালীপুজোর আর দুদিন বাকি। কালীপুজোটা দেখেই চলে যাবেন গুণদাপ্রসাদ। কলকাতায় চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। জবাবের জন্য অপেক্ষা শুধু। কারুর কাঁধে তো গিয়ে ভর দেবেন না, স্পষ্ট সে কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। এমন সময়ে ওই পোস্টারগুলি ডাইনে বাঁয়ে সার বেঁধে তাঁকে অনুসরণ করছে। ক্রমশ উত্তেজনা বাড়ছে।

এই যে গুনু! প্রমথনাথ তৈরি ছিলেন কোথাও। আচমকা ঝাঁপিয়ে এলেন। চোখে কেমন পাগলাটে হাসি। চাপা স্বরে বললেন,

দেখছ কাণ্ডখানা ?

গুণদাপ্রসাদ ফোঁস করে উঠলেন। কাণ্ড কিসের ? এটাই তো হয়।

কী হয় ?

কারচুপি ! প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড রাগী মুখে বললেন। লোক-খেপানো চাতুরী ! মিথ্যাকে সত্যি করা !

স্কুল শিক্ষক তাঁর একটি দীর্ঘ বন্ধুবৎসল হাত ওর কাঁধে রাখলেন !...নো নো। ফ্যাক্ট। ক্রুড রিয়্যালিটি। আমি তোমাকে বরাবর বলেছি, গাবু বেঁচে আছে।

কাঁধের হাত কোমল করল গুণদাপ্রসাদকে। আস্তে বললেন, তুমি ইতিহাস—ইতিহাস করো। জানো না মরা মানুষের নাম ভাঙিয়ে জ্যান্ত মানুষেরা কী করে ?

করুক। মোটিভটা বুঝতে হবে, তাতে ভাল না খারাপ হবে ! অবশ্য গাবুর ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। এ রেয়ার কেস।

উত্তেজনা এ বয়সে মানুষকে সহজে ক্লান্ত করে। গুণদাপ্রসাদ চা খেয়ে বেরিয়েছেন। তবু আর একবার চা দরকার মনে হল। বললেন, এস, চা খাই।

জগনের দোকানের দিকে পা বাড়িয়ে প্রমথনাথ একটু হেসে বললেন, পোস্টার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস অ্যালার্ট হয়ে গেছে। এম এল এ জিপে চেপে দেখতে এসেছিলেন। গুলি খাওয়া বাঘের মতো চলে গেছেন। তবে দিস মাচ। আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ গুনু: পোস্টার কেউ ছিঁড়বে না। কারণ সবাই এটাকে তোমার অ্যাঙ্গল থেকে দেখছে। জোক ভাবছে। কিন্তু আমি জানি, এটা জোক নয়। লেট দা হার্ভেস্টিং সিজন কাম ! স্বচক্ষেই দেখবে।

অগত্যা করুণ হাসলেন গুণাদাপ্রসাদ।...গাবুকে ?

ইয়েস—গাবুকে। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন প্রবীণ, ঢ্যাঙা, ধুতিপাঞ্জাবিপরা স্কুল শিক্ষক।

চায়ের গেলাস এগিয়ে চাঅলা জগন ফিক করে হাসল। কি মাস্টারমশাই ? আমি কি কইছিলাম ?

ঘাটের মুখে আজ জমাট ভিড়। পাটের পাহাড়। ক্যাসেট প্লেয়ার, ট্রানজিস্টারের চিৎকারে কান পাতা যায় না। প্রমথনাথ

মাটির ভাঁড়ের ঝটপট চা শুয়ে নিয়ে জুতোর তলায় স্বাস্থ্যবিধির কারণেই ভাঁড়টিকে মড়মড়িয়ে ভাঙলেন। গুণদাপ্রসাদের দেরি হচ্ছে। তাঁকে টেনে ওঠালেন। গুণদাপ্রসাদকে জোর করেই বাঁধে নিয়ে গিয়ে তুললেন।

ভয়াল ও জৈব ছাতিম গাছটির কাছে গিয়ে প্রমথনাথ বললেন, ছড়িটা দাও। হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ছড়িটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে হল। গুণদাপ্রসাদ ছাতিম গাছের কাছে দাঁড়িয়ে দেখলেন, প্রমথনাথ নিচের মাটিতে ছড়ির দাগ টানছেন। এইখানে গাবু পড়ে ছিল। কেমন তো? এবার তুমি গাছটার পেছনে যাও। আহা, যাও না। না! তোমার মুখ উল্টোদিকে। দেখতে পাচ্ছ আমি কী করছি? পাচ্ছ না? আমি এই ঝোপগুলোর ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে গিয়ে গঙ্গায় পড়লাম। ব্যস্! এবারে তুমি এদিকে মুখ ফেরালে। দেখলে কেউ নেই। অতএব ধাঁধায় ভোগো। চাকরি যাবে দেখে গপ্প রটাও। চোখ থেকে টসটস করে জল ফ্যালো। বলো, 'একটা মেয়েছেলে এসে বডি তুলে নিয়ে গেল। তার গায়ে বন্দুকের গুলি বেঁধেনি।' কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনে যেহেতু 'ভূত' টার্মটা নেই, তার ডেফিনিশনও নেই; সেই হেতু কমিশন তোমাকে—তোমাদের দুজনকে সাসপেন্ড এবং মেন্টাল হসপিট্যালে পাঠানোর রেকমেন্ড করুন। ধরাধরি করে শেষ পর্যন্ত বদলিতে রফা হোক। কী? বুঝতে পারছ! ক্লিয়ার?

গুণদাপ্রসাদ নিচের মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা প্রমথনাথের পেছনে, ঠিক জলের ধারে নুয়েপড়া হিজল-জাম-জারুলের আড়ালে ঘন ছায়ার ভেতর একটা আবছায়ার নড়াচড়া দেখছিলেন? শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। জ্যোৎস্না রাতে মালগাড়ির সঙ্গে সমান্তরালে ধাবিত শ্বেতবসনা কাত্যায়নী—হ্যাঁ, কাত্যায়নী ছাড়া আর কে হতে পারে, অবশেষে এই সন্ধ্যায় আবার এসে দাঁড়াল কী? গুণদাপ্রসাদ মাটিতে দাঁড়িয়ে, অতএব সেও মাটিতে দাঁড়িয়ে—সমান্তরালে। ব্যবধান রেখে চলা ওর স্বভাব ছিল।

প্রমথনাথকে অবাক করে প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড ভিজে মাটিতে নেমে ঝোপঝাড় ঠেলে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। শ্রেণীবন্ধ, ঝুঁকে-

পড়া, জলে শেকড়বাকড় মরিয়া হয়ে আঁকড়ানো গাছপালার আড়াল দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তাঁরই ভাইঝি সোমা! এখানে কী করছিল? এমন করে পালিয়ে গেল কেন?

প্রমথনাথ ডাকছিলেন। গুণদাপ্রসাদ দ্রুত ফিরে এলেন। প্রমথনাথ বললেন, কী ব্যাপার?

কিছু না।

স্কুল শিক্ষক আগের কথায় ফিরে এলেন। তাহলে এবার বুঝলে তো গাবু বেঁচে আছে?

আছে। প্রাক্তন রেলওয়ে গার্ড অতি কষ্টে শব্দটা উচ্চারণ করলেন। আসলে একেকটা সময় এমন হয়, যখন কারুর কিছু করার থাকে না।...

রাজকুমারী এবং এক মরা কাকিনীর গল্প

শেষ মাঘে যখন কাঁটালিয়া ঘাটের মাথায় শিমুল ফোটার ঝলমলানি তখনই, দশরথের মেয়ে রাজকুমারীর বিয়ের শুভদিন ঠিক করা হয়েছিল। বরের বাড়ি গঙ্গার ওপারে একেবারে চোখ বরাবর। পাড়ের ওপর একতলা নতুন দালানবাড়ি গাছপালার ফাঁকে ঝকমক করে। দশরথের চোখে মেখে গিয়েছিল আঠায় সাঁটা ছবির মতন। আর সে শিমুলতলার ঘাটে গিয়েদাঁড়ালেই অবিকল দেখতে পেত, তার মেয়ে রাজকুমারী সেই চালচিত্রে এক প্রতিমা। প্রতি-মাই বটে তো এ মেয়ে। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ। বাবুবাড়ির মেয়েদের সঙ্গে চেহারা চলন-বলনে ফারাক নেই। দশরথ তার সম্প্রদায়ের মোড়ল মাতব্বর মানুষ। পাড়াসুদ্ধ দিন গুনছিল কবে ডুমডুমিয়ে বেজে উঠবে প্রথাসিদ্ধ ঢোলক। বহু-বহুড়িরা এসে হলুদবাটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে। রঙ খেলবে দাশু মোড়লের উঠোনে। কাবুলির সঙ দেবে।

সব আশা আর ইজ্জতের ওপর ছাই ছড়িয়ে রাজকুমারী শুভ-দিনের আগেই হঠাৎ নিপাত্তা। কাঁটালিয়া জুড়ে ঢিঢি ছিছি। গঙ্গার ওপারেও বাঁকা হাসি, গুজগুজ, ফিসফিস। বর নির্মল-কুমার কলেজে পাশ দিয়ে প্রাইমারি টিচার। তার বাবাও কালুডহর গাঁয়ের এক মোড়ল মানুষ। দশরথের মতো নিরক্ষর, কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধিতে বাবুদের কান কাটে এবং পঞ্চায়েতের ইলেকশানে জেতা পার্টিনেতা। দশরথের মতো ভুঁইক্ষেতে খাটে না। ঠাকুরতলার মাচায় বসে সিগারেট টানে। ধোঁয়া উড়িয়ে বলল, 'ছোড় বে! নির্মল কা বহু আবে টাউনসে। হাঁ—মরদকা বাত, হাত্থিকা দাঁত।'

আর তখন দশরথ কাকতাড়ুয়া হয়েতার বেগুনক্ষেতে দাঁড়িয়ে। চোখে সাঁটা মান্যবর মোড়লের দালানটি ঘষে মুছতে গিয়ে

ঝরঝর করে কাঁদে। যার লিখাপড়াজানা বেটি ভেগে যায়, যে কাঁটালিয়ার এক মাতব্বর মানুষ, তার গোপনে বসে কান্নকাটি আর শাপমন্যি করা ছাড়া আপাতত কিছু করার নেই।

কিন্তু কার সঙ্গে ভাগল রাজকুমারী? দশরথের বিধবা দিদি সরবতিয়ার সন্দেহ, এ নিশ্চয় জঙ্গিপুর টাউনের সেই ছোকরার কাজ—সেই ম্যাজিকওয়ালা ছোকরা গাকুয়া, পদ্মা-জলঙ্গী সীমান্তে জুয়াড়িদের মেলায়-মেলায় ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ায় যে, তার 'মুরখ বুদ্ধু' ভাই—দশরথ যাকে খাল কেটে ঘরে কুমির আনার মতো ঠাঁই দিত যখন-তখন।

সরবতিয়া আবার ঐ তল্লাটের বদ্যিমা। ঝাড়ফুক, তুকতাকে ওস্তাদনী। ক্ষেতের ফলমাকড়ে কেন ফলন নেই, কেমিকেল সার ঢেলেই বা কেন বিয়োচ্ছে না বেগুনগাছগুলো, লাউলতারই বা বেয়াড়াপনা কেন, তার জন্য শ্মশান চুঁড়ে রাতবিরেতে সেই এনে দেবে হাড্ডি বা খুলি। মন্ত্রপুত সেইসব জিনিস ক্ষেতের দোষ নষ্ট করবে। আজকাল লিখাপড়ার এত চলন, এত পার্টিবাজি আর পঞ্চায়েতি হইচই, তবু প্রাগৈতিহাসিক অবচেতনা দুর্মর।

দশরথ যখন মুখদেখানোর লজ্জায় গোপনে নির্জনে কেঁদে বেড়াচ্ছে কিংবা চকিতে লোক দেখলেই মুখ তুম্বো করে ক্ষেতের ফসলে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ছে, তখন তার বদ্যিদিদি সরবতিয়া উঠোনের কোণে লম্বা লগি খুঁজছে। লগির ডগায় বাঁধা এক মরা কাক। কাকটা সে গঙ্গার পাড়ে কাঁটাবনে দৈবাৎ পেয়ে গিয়েছিল। হয়েছিল কি, কাকটা ডিমপাড়ার জন্য বাসা বাঁধতে শুকনো ডাল সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছিল। কাঁটাবনে ঢুকে হতভাগিনী আর বেরুতে পারেনি। শয়ে-শয়ে কাক এসে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় এবং ক্ষতবিক্ষত কাকিনী মারা পড়ে।

সরবতিয়া মন্তর পড়ে মরা কাকিনীকে ঝুলিয়ে আশা করছিল, এই কাকিনী যখন ডেকে উঠবে, তখনই রাজকুমারী যেখানেই থাক, বাড়ির জন্য আনচান করে ছুটে আসবেই আসবে। তারপর সরবতিয়া দাওয়ায় বসে সুর ধরে তার মরা স্বামীর উদ্দেশে মাসান্তিক কান্নার ছলে ভাইঝির জন্য পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল।

গঙ্গার পাড়ে কালীপুজোয় মেলা বসানো বাবু ও মোড়লদের

বহুকালের একটি কীর্তি। সেই মেলা চলে দশরথদের সম্প্রদায়ের ছট পরব অব্দি। সদর শহর বহরমপুর থেকে পিচের সড়ক এসে গেছে। ঘাটের মাথায় বাসস্ট্যান্ড, বাজার। হাইস্কুলও হয়েছে ইদানীং। কাঁটালিয়া ঘাট জমকালো গঞ্জ হয়ে উঠেছে। মেলার সময় সার্কাস আসে। ম্যাজিক আসে। মাইক বাজে। কুলকুল করে লোকজন। ছোকরা ম্যাজিকওয়ালা প্রোফেসর গাব্বুর তাঁবুটি ছোট্ট হলেও হরেক মজাদার খেলার জন্য ভিড় হত প্রচণ্ড। সেই প্রোফেসর গাব্বুর সঙ্গে দশরথের প্রায় কুটুম্বিতা হয়ে গিয়েছিল। এ পাড়ার ছেলে ছোকরারা ছট পরব উপলক্ষে মোটারকমের চাঁদার দাবি করেছিল। প্রোফেসর গাব্বু কারুর পরামর্শে দশরথের কাছে আসে এবং তাকে দেখামাত্র দশরথের মনে কী একটা ঘটে গিয়েছিল। তারপর যখনই গাব্বু ম্যাজিক নিয়ে এসেছে, দশরথের বাড়ি তার অবরে-সবরে আনাগোনা চলেছে। খাওয়া-দাওয়া তো বটেই। আর রাজকুমারী তো গাব্বুদা এলেই চঞ্চল, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গাব্বুর তাঁবুর গ্রিনরুমে রাজকুমারীর অবাধ গতিবিধি ছিল। ফিরে এসে সরবতিয়া বুড়িকে হাসতে হাসতে বলত, 'পিসি গে, একদম তেরি মাফিক—সিরফ্ বুদ্ধু বানা দেতা গাব্বুদা! তুভি ম্যাজিকওয়ালি গে পিসি!'

সরবতিয়া রেগে যেত। 'থামরি লিখখাপঢাওয়ালি! তু বহত সমঝদারনি!' কখনও ফিক করে হেসেবদ্যিবুড়ি বলত, 'ছোকড়াকো হামি এইসা খেল দেখলাবে, উওভি সমঝাওলবে কেত্তা ধানমে কেত্তা চাল।'

গাব্বু বলত, 'রাজকুমারী, তোমরা ও ভাষায় কথা বলো কেন বলো তো?'

রাজকুমারী বলত, 'বাঃ! এটাই তো আমাদের মাদার টাং! আমাদের কমিউনিটি কোনো আমলে বিহার থেকে এসেছিল শুনেছি। তাই মৈথিলি আর বাংলা মিশিয়ে কথা বলে।'

ওরা যখন ইংরেজি মেশানো বাংলায় কথা বলত, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ভাইবোন প্রশংসার চোখে তাকিয়ে কান খাড়া করে শুনত। দশরথ তো গর্ববোধই করত, তার মেয়ে ইংরেজি বুলি বলে—ইতনা লিখাপঢা! সেই মেয়ে এমন করে ভেগে গেল কেন, তার মাথায়

আসে না। নির্মলকুমারও ইংরেজি বুলি বলে। কলেজে পাশ ছোকরা। তবে গাব্বুর সঙ্গে ভেগেছে বলে তার বিশ্বাস হয় না। গাব্বু তাকে 'মুরখ' হলেও কী সম্মান করত! আর গাব্বু কিনা বামুনের ছেলে! সরবতিয়াদিদি বরাবর উল্টাপাল্টা বাত করে।

পাড়ায় ছেলেরা ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে। মাতব্বরাও বলেছে, থানায় খবর দাও। কুছ বুরাভি হোনে সক্তা—দিনকাল যা চলেছে, কিছু বলা যায় না। তবু দশরথগোঁ ধরে আছে। লোকেরা শেষে শাসিয়েও গেল, জাতের এই অসম্মান তারা বরদাস্ত করবে না। দশরথ মোড়ল বলেও রেহাই পাবে না। জরিমানা দিতে হবে দশের কাছে।

তবু দশরথ চুপ।...

কদিন পরে ঘাটের মাথায় বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে নির্মলকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল দশরথের! তাকে সবাই নিমাই মাস্টার বলে ডাকে। নৌকোয় সাইকেলসুদ্ধু পেরিয়ে রোজ তাকে এপারের তিন কিলোমিটার পিচরাস্তা ঠেঙিয়ে মামুদপুর প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করতে যেতে হয়। নির্মলকুমার সবে প্যাডেলে পা তুলেছে দশরথকে দেখে পা নামাল।

হতে-পারত-শ্বশুর হতে-পারত-জামাই-বাবাজির মুখোমুখি পড়ে গিয়ে একেবারে পাথর। কিন্তু নির্মলকুমার একালের ছেলে। স্মার্ট এবং ফিটফাট। মুখে বরাবরকার হাসি। এই সকালেই ঘাটের বাজারে বাস-ট্রাক-টেম্পো-সাইকেল রিকশো আর মানুষ-জনের ভিড়ভাট্টা মিলে দৈনন্দিন তুলকালাম অবস্থা। তাদের দিকে আলাদা করে নজর রাখার মতো কেউ ছিল না। নির্মলকুমার আগের মতোই 'কাকা' বলে সম্ভাষণ করে এগিয়ে এবং দশরথকে অবাক করে বলে উঠল, 'কুছ খবর মিলা, কাকা!'

দশরথ ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, 'নাহিক!'

নির্মলকুমার চাপাগলায় বলল, 'কালীতলাবর্ডারমে যাকে দেখো, কাকা! হুঁয়া হামরে এক বন্ধু ছে। উসকা নাম যে শরৎ ছ। খোকাবাবু নাম বোলনেসে ঘর দেখা দেগা। হামরে খোকা খবর ভেকলবজ কাল রোজ হুঁয়া মিলামে দেখা তোঁহার বেটিয়াকো!'

দশরথ ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আস্তে বলল, 'ঝুট।'

'কাহে?' নির্মলকুমার খুব অবাক হয়ে গেল। 'খোকা ঝুট-বোলনেবালা নাহিক গে কাকা!'

দশরথ গলার ভেতর থেকে শব্দ করে বলল, 'হামরে বেটিয়া মর গেয়া!' তারপর বেঁটে মোটাসোটা দশরথ থপথপিয়ে চলে গেল। ভিড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

নির্মলকুমার গুম হয়ে সাইকেলে চাপল। সে বুঝতে পেরেছে, দশরথ তার মেয়েকে মন থেকে ত্যাগ করেছে।

কিন্তু পারছে না নির্মলকুমার। রাজকুমারী যেন তারই মুখে চুনকালি লেপে দিয়ে পালিয়ে গেছে। কাঁটালিয়া স্কুলে কো-এডুকেশনের ব্যবস্থা আছে। কত ছোটবেলা থেকে রাজকুমারীকে সে দেখে আসছে! সেই ফ্রকপরা বয়সে সরস্বতী পুজোর দিন ক্লাস ফাইভের ছাত্রীটি কেন হঠাৎ ক্লাস নাইনের ছাত্রটির দিকে তাকিয়ে কেমন হেসেছিল এবং কেনই বা হেসেছিল, আজও বুঝতে পারে না নির্মলকুমার। কিন্তু তারপর থেকে রাজকুমারীর নাগাল পেতে চাইত নির্মলকুমার। কথাবার্তা যে একেবারেই হত না, তা নয়। কিন্তু ওই বয়সে মনে যে স্বপ্ন-কল্পনা-সাধ জীবনটাকে অস্থির করে রাখে, তা প্রেমভালবাসা না হলেও এমন একটা জিনিস, বুকের ভেতর যেন স্থায়ী দাগ কেটে দেয় একটা ক্ষতচিহ্নের মতো। এতদিন পরে সেই ক্ষত হঠাৎ আবার রক্তাক্ত করে দিয়ে গেল মেয়েটা।

তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার, চেনাজানা লোকেরা তাকে দেখে যেন মুচকি হাসছে—কি না, মান্যবর মোড়লের বেটার বহুই যেন ভেগে গেছে। পৌরুষে ঘা বেজেছে নির্মলকুমারের। ইচ্ছে করলে কি সে একেবারে টাউনের কোনও বাবুর বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করতে পারত না! কলেজ জীবনে কত সুন্দর সুন্দর মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। ইচ্ছে করলেই প্রেমভালবাসাও করে নিতে পারত না কি? আসলে এমন এক সম্প্রদায়ের ঘরে তার জন্ম, অবচেতনায় জাতপাতের ভয়টা ছিল সবসময় বাসা বেঁধে। তাই সংকোচ হত। শহরের কত মেয়েকে তো সে নিজের জাতপাতের পরিচয় দিতেও পারেনি।

এখন পঁচিশ বছর বয়সের গ্র্যাজুয়েট এবং প্রাইমারি শিক্ষক নিমাই মাস্টার সে। স্কুলে গিয়েও লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে থাকে, পাছে অন্য মাস্টারমশাইরা তাকে ব্যাপারটা জিগ্যেস করে বসে! তার আত্মীয়কুটুম্ব তার বাবা-মা সবাই বলছে, 'বাঁচ গেইলি বেটা! বহুত বাঁচ গেইলি তু। ওই খারাপ চরিত্রের মেয়েকে বিয়ে করলে তোর যা হবার হত, আমাদের তো মানইজ্জত থাকত না এতটুকু!'

তা ঠিক। তবু মনের ভেতর দগদগে ঘা চাগিয়ে উঠেছে নির্মল-কুমারের। হারামজাদি মেয়ে ভাগলি তো ভাগলি ঐ ম্যাজিক-ওয়ালার সঙ্গে! মাতাল, নচ্ছার এক বাউন্ডুলে। চালচুলো নেই। পৈতে ঝুলিয়ে রাখতে দেখা গেছে বুকে, কিন্তু ওটা তো মিথ্যা হতেই পারে।

নির্মলকুমার মাঝপথ থেকে ফিরে আসছিল। আজ সে স্কুলে যাবে না। তকিপুরের চৌমাথায় এসে ডাইনের পিচরাস্তায় পড়তেই টের পেল বুকে ধাক্কা মারছে শেষ মাঘের উত্তুরে হাওয়া। সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিতে দিতে সামনে ঝুঁকে পড়ল সে। বাধা ঠেলে লড়াই করার ভঙ্গিতে সে সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলল।

কপিলেশ্বরের ঘাটে গঙ্গা নৌকোয় পেরিয়ে নির্মলকুমার ঈশানকোণে কাঁচা রাস্তায় যখন চলেছে, তখন তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত ঠেকেছে। দিনটা দুপুরের দিকে আরও মেঘলা হয়ে গেছে। বারো কিলোমিটার নাকবরাবর কাঁচা রাস্তার ধুলোয় তার সাইকেল যেমন, তেমনি সেও ভূত হয়ে উঠেছে। কালীতলা বর্ডারে পৌঁছানোর আগেই নির্মলকুমার পদ্মা দেখতে পাচ্ছিল। পদ্মার বিশালতা দেখামাত্র হঠাৎ যেন তার শরীরটা নেতিয়ে গেল। ওই বিশালতা শূন্যতার মতো তার চোখে আটকে গেল। কোথায় এমন করে চলছে সে, কেন চলেছে, সেটা আর যেন খুঁজেই পাচ্ছিল না, মান্যবর মোড়লের গ্র্যাজুয়েট ছেলে, মামুদপুর প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক নির্মলকুমার সংকার।...

শরৎ, যার নাম খোকা, সে কায়েতবাড়ির ছেলে। শহরের' কলেজে সহপাঠী ছিল নির্মলকুমারের। কিন্তু প্রথম বছরের পরই

পড়াশুনো ছেড়ে ব্যবসা করতে যায়। তার বাবা মস্ত আড়তদার। একসময় নাকি স্রেফ ছাতুর ব্যবসা করেই বড়লোক হয়েছেন। তাই এলাকায় তাঁর নাম ছাতু কায়েত। বয়স হয়েছে বলে ছেলেদের গদিতে বসিয়েছেন। খোকা বলত, কালীতলা বর্ডারের বাজারে প্রত্যেকটা আড়ত হল গিয়ে স্মাগলিংয়ের ঘাঁটি। খোকা চোখে ঝিলিক তুলে বলত, 'বল না কী ফরেন জিনিস চাই তোর? ঘড়ি না কলম? ট্রাঞ্জিস্টার না টেপরেকর্ডার। যে ফরেন প্যান্টপিস টাউনে একশো টাকায় কিনবি, আমি তোকে পঁয়ত্রিশ টাকায় এনে দেব।' নির্মলকুমার সাদাসিদে থাকতে শিখেছে ছেলেবেলা থেকে। শৌখিনতা পছন্দ নয় তার। এখনও সে ধুতি আর তাঁতের কাপড়ের পাঞ্জাবি পরে ঘোরে। বাবা মান্যবরের মতো পার্টিবাজিতে নেই। আবার বাবার মতো সিগারেটও টানে না। ভাইদের মতো প্যান্টশার্ট রকমারি ফরেন জ্যাকেট কিংবা টেপরেকর্ডারেও আসক্তি নেই তার।

আড়তে খোকা গদির ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে সিগারেট টানছিল। নির্মলকুমারকে দেখে একমুখ হেসে বলল, 'আয়! তোর কথাই ভাবছিলাম একটু আগে। যশোদা তাহলে খবর দিয়েছে?'

নির্মলকুমার একটু হাসল মাত্র।

গদিতে কিছু ব্যাপারী আর চাষাভুষো লোকের ভিড়। বাইরে তারাজুতে খন্দ ওজন হচ্ছে। কয়াল হাঁকছে, 'পাঁচ পাঁচ—পাঁচো পাঁচ! ছে ছে—ছয়ো ছেই…' বাজার জুড়ে মানুষজন, ব্যাপারী, ট্রাক, টেম্পো, গরুমোষের গাড়ি আর শহরের রাস্তার ধারে যেমন থাকে, তেমনি ফরেন প্যান্টের স্তূপ।

খোকা উঠে এল গদি থেকে। নির্মলকুমারের সাইকেলটা এক কর্মচারীর জিম্মায় দিয়ে সে বলল, 'আয় নিমাই!'

কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে, বুঝতে পারছিল না নির্মলকুমার। বাজার ছাড়িয়ে পদ্মার পাড়ে বটতলায় বেদী আর ত্রিশূল পোঁতা। সেই বটের পেছনকার শেকড় নেমে গেছে শান্ত নীল পদ্মার গহন জলে। সেখানে বসে খোকা বলল, 'যশোদার মুখেই সব শুনেছিলাম। তবে তোর ওই রাজকুমারীকে আমি চিনি না। দেখিনি কখনও। যশোদা বলল, আগের রাতে জুয়াড়িদের মেলায় ম্যাজি-

কের তাঁবুতে একটি মেয়েকে দেখেছে। ওই যে ইলেকট্রিক গার্ল বলে খেলা দেখায়, জানিস তো? সারা গায়ে ইলেট্রিক জ্বলে ওঠে আর মেয়েটা ভ্যানিশ হয়ে যায়। তো যশোদাই বলল, প্রোফেসর গাব্বু এবার যে মেয়েটিকে নিয়ে এ খেলা দেখাচ্ছে তাকে রাজকুমারী বলেই মনে হয়েছে। হ্যাঁ—মিসটেক হতেও পারে। জানিস তো? যশোদা কী মাল?'

খোকা দম ফেলে বলল, 'তো আমার একটু ইণ্টারেস্ট জাগল। কাল সকালে গেলাম ওদের তাঁবুতে। গিয়ে দেখি, মেয়েটার সিঁথেয় সিঁদুর। হাতে শাঁখা—নোয়া। উনুনে কেটলি চাপিয়ে পাখার হাওয়া দিচ্ছে। আর ম্যাজিসিয়ান ব্যাটাচ্ছেলে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। আমার সঙ্গে চেনা নেই। বললাম, কী মশাই? কেমন চলছে খেলা? ব্যাটা কী মাল মাইরি! ভীষণ খাতির—টাতির করে বসাল। তারপর বললাম, আপনার মিসেসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না? তখন ব্যাটা মেয়েটাকে ডেকে বলল, 'রাজু, এস—আলাপ করিয়ে দিই।'

নির্মলকুমার চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল শুধু।

খোকা ফিক করে হেসে বলল, 'আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো বললাম, আপনার মিসেসের নাম বুঝি রাজকুমারী? অমনি দুজনেই চমকে উঠল। তারপর ব্যাটাচ্ছেলে নার্ভাস মুখে বলল, না—ওর নাম রঞ্জিতা। তাই রাজু বলে ডাকি। যাই হোক, আমার চোখ বাবা! সোজা বললাম, কেন মশাই হেজিটেট করছেন? আপনার মিসেসের বাবার বাড়ি কাঁটালিয়া ঘাটে। আমি সবই জানি। তখন প্রোফেসর গাব্বু আমার হাত ধরে কি পা ধরে, এই অবস্থা।'

নির্মলকুমার এতক্ষণে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'তারপর?'

খোকা বলল, 'কথা দিতে হল, চেপে থাকব। কিন্তু ফিরে এসে যশোদাকে সব বলে পাঠিয়ে দিলাম তোদের গাঁয়ে। এদিকে হয়েছে কি, রাতারাতি তাঁবু—টাবু গুটিয়ে ব্যাটাচ্ছেলে হাওয়া! চল, জায়গাটা দেখাচ্ছি। ওই আমবাগানের ভেতরে মেলা বসেছে। প্রোফেসর গাব্বুর তাঁবু যেখানে ছিল, সেখানে ভোঁ ভাঁ অবস্থা। চুলোর ছাই, খুঁটি পোঁতার গর্ত, পেঁয়াজের খোসা…' খিখি করে

হাসতে লাগল খোকা। শেষে বলল, 'মনে হচ্ছে, পদ্মা পেরিয়ে চলে গেছে। রাজশাহীর গোদাগাড়ি ঘাট আছে—ওই যে ধূ ধূ দেখছিস—দ্যাখ্!'

নির্মলকুমার সেদিকে তাকালো। বিশাল নীল জল আর ধূসর বালির চড়ার ওধারে দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে সে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে গেল। তারপর বলল, 'একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে রে!...

সন্ধ্যায় হঠাৎ তুমুল ঝড় আর শিলাবৃষ্টি। দশরথ খাটিয়ায় বসে শনের দড়ি পাকাচ্ছিল। সরবতিয়া শাপমন্যি করছিল হারামজাদী ভাইঝির নামে। আর ম্যাজিকওয়ালা ছোকরাকে বাণ মারবে কি মারবে না, মারলে বোকা ছোকরিটা যে বিধবা হয়েও যাবে, সেই সমস্যার কথা বোঝাতে চেষ্টা করছিল ভাইকে। কিন্তু বাজের হাঁকড়ানি, চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ, শিলা ও বৃষ্টি, এই প্রচন্ড প্রাকৃতিক উপদ্রবে তার কথা ছেঁড়া পাতার মতন উড়ে কোথায় ভেসে যাচ্ছিল।

ভোরে উঠে শান্ত আর ভিজে পৃথিবীতে পা বাড়িয়ে প্রথমেই দেখতে গেল বদ্যিবুড়ি তার কাকিনীর দশা। লগিটা বেঁকে গেছে। আর কাকিনী দড়ি ছিড়ে পড়ে আছে উঠোনের অন্য কোনায়। সরবতিয়া থমকে দাঁড়াল। তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল। বুক থেকে ঠেলে এল চাপচাপ কান্না।

সেই সময় দশরথের দরজায় ঘণ্টি বাজলে দশরথ দরজা খুলে অবাক! ওপারের মোড়ল মান্যবরের ছেলে অর্থাৎ তার হতে-না-পারা জামাই এসে হাজির। নির্মলকুমার বাড়ি ঢুকে বলল, 'খবর মিলা কাকা! হামরে কালীতলা বর্ডারমে ভি...'

দশরথ তাকাল।

আর নির্মলকুমার হঠাৎ কি এক অবচেতন টানে দৃষ্টি ফেলল বুড়ি সরবতিয়ার দিকে। সে চমকে উঠল। তার খালি বুকের

ভেতর পা ফেলে হে'টে যাবার মতো করে গুনিন বুড়ি পা বাড়িয়েছে, আর তার হাতে ঝড়ে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে-থাকা মরা কাকিনী।

বদ্যিবুড়ী-সরবতিয়া সুর ধরে কাঁদতে কাঁদতে কাউকে শাপমন্যি করতে করতে মরা কাকিনীকে গঙ্গায় বিসর্জন দিতে চলল। নির্মলকুমার, পারলে এই শ্মশানযাত্রার অনুগামী হত। কিন্তু সেও তো একটা ব্যর্থতা।...

পানিপিরের দরগায়

নাসিরুদ্দিন খানচৌধুরি এবেলায় তোপখানার ঝিলে হাঁস মারতে বেরিয়েছিলেন। সঙ্গে বিশ্বস্ত বান্দা আবদুল। আজকাল বন্দুক নিয়ে বাইরে বেরুনোর ঝুঁকি আছে। থানার সেপাইদের হাত থেকেও মস্তান দুর্বৃত্তরা মাস্কেট বন্দুক ছিনিয়ে নিচ্ছে। গ্রাম-গঞ্জে একেবারে মগের মুল্লুক ইদানিং। পয়সাকড়িওয়ালা লোকেরা দুরু-দুরু বুকে রাত কাটায়। অথচ কুতুবগঞ্জের খান-চৌধুরির হাতে এসময় বন্দুক। এর অনেকগুলো কারণ।

খানচৌধুরি এলাকার পঞ্চায়েত-প্রধান। তাঁর পোষ্য একটি মস্তানবাহিনী আছে। আর এই আবদুল, খুনে দাগী মারকুট্টে তাগড়াই চেহারার প্রৌঢ় বয়স্ক লোকটি, সেই বাহিনীর বরাবর লিডার। তার পরনে ঢোলা হাফপ্যান্ট, এর কারণ একপকেটে ভোজালি আর অন্যপকেটে একটি চীনা পিস্তল সব সময় গা ঢাকা দিয়ে থাকে। দরকার হলেই গোখরো সাপের চেয়ে দ্রুত গর্ত থেকে ফোঁস করে বেরিয়ে পড়ে এবং ছোবল দিতে এক সেকেণ্ডও লাগেনা। পুলিশ আসে। তদন্ত হয়। চার্জশিট আর আদালতে পেঁছায় না। যদি বা পেঁছায়, আইনের ফুটো গলিয়ে আইনজীবীদের জোরালো ফুঁয়ের ঝড়ে ছেঁড়াপাতার মতো কুচি-কুচি হয়ে উড়ে যায়।

খানচৌধুরির চেহারাখানিও তাগড়াই। চাঁছাছোলা গাল ও চিবুক, কিন্তু গোঁফটি খোগলাই। বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ হবে। খাড়া নাক। একমাথা ঝাঁকড়া চুলে ফিল্ম হিরোর ফ্যাশান। পরনে এখন ধুতি পাঞ্জাবি ও প্যান্ট শার্টের বদলে সেকেলে ব্রিচেস—যা তাঁর দাদু খানবাহাদুর দবিরুদ্দিনের, এবংযে—দবিরুদ্দিন বিশের দশকে এই কুতুবগঞ্জে প্রথম অষ্টিন গাড়ি চড়ে আনাগোনা করতেন, এবং যিনিও ছিলেন এই নাতির মতোই বন্দুকবাজ, উড়ন্ত পাখি গুলিবিদ্ধ করে জেলার ইংরেজ কালেক্টরকে তাক

জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

নাসিরুদ্দিনের সেই লক্ষ্যভেদী ক্ষমতা নেই। কারণ এলাকায় শিকারযোগ্য পাখ-পাখালি বা জন্তুজানোয়ারের আকাল। তার বদলে অবশ্য মানুষ আছে। তবে মানুষের বুক ছেঁদা করার জন্য আবদুলই যথেষ্ট। নাসিরুদ্দিন জনসেবক মানুষ। মানুষের রক্তে হাত রাঙানো তাঁর শোভা পায় না।

তোপখানার ঝিলটি আসলে বেহুলা নামে নদীটিরই পুরনো খাত। তার পাড়ে নাকি মোগলবাদশাহ আকবরের আমলে জায়গিরদার কুতুবুদ্দিন খানচৌধুরির তোপখানা ছিল। এখন জঙ্গলে—জঙ্গলে ঠাসা সরকারি খাস মাটি। টুকরো ইট, পাথর বা লাইমকংক্রিটের ছাবড়া ছড়িয়ে আছে। গাছ গাছালির শেকড়বাকড়ে গাঁথা পুরনো সেই কংক্রিটের ছবড়ায় ভীতু ও কোমল আগাছা রোদ্দুরের জন্য মাথা কোটে। নিচের ঝিলে শালুকপদ্ম পানিফল আর শোলাঝাড়ের ফাঁকে দৈবাৎ এক পানকৌড়ি কী ধূর্ত ডাহুক চোখে পড়ে। গরিব গুরবো মেয়েরা হেঞ্চাকলমির শাক তোলে। ডুব দিয়ে তোলে গুগলি কী ঝিনুক। এখনও হেমন্তের শেষে অভ্যাসে উড়ে এসে বসে ছোট্ট একটি বুনোহাঁসের ঝাঁক। মানুষজনের ভিড়ভাট্টা দেখে কেটে পড়ে ঝটপট। তবু থেকে যায় দলছুট, বেয়াড়া আর মরিয়া কোনো দম্পতি। শোলাঝাড়ের আড়ালে ক্যামাফ্লেড করে ভেসে থাকে।

জঙ্গলের ওধারে আবদালাদের বসতি। ওরা মুসলমান মৎসজীবী সম্প্রদায়। এলাকার মুসলমানদের কাছে অছুৎ। ওরা বর্ষা থেকে হেমন্তকাল মাছ ধরে শুঁটকি তৈরি করে। দুর্গন্ধে ওদিটায় যাওয়া দায়। আর লোকগুলোও যেমন, মেয়েগুলোও তেমনি ডানপিটে। বড় এককাট্টা সমাজ ওদের।

বেহুলা নদীটি এই চৈত্রে শুকনো। বুকে বালির চড়া। আনাচে—কাণাচে ঝিরঝিরে একফালি কালো জলরেখা। পাড়ের বাঁধে হিজল জাম জারুল জিয়ালার সারি। ডাইনে নেমে বোরোধানের

সবুজ ক্ষেতের ভিজে আলে গামবুটের ছাপ ফেলে নাসিরুদ্দিন ঢিবির মতো উঁচু তোপখানার জঙ্গলে যখন ঢুকলেন, তখন সূর্য পেছনে কুতুবগঞ্জের ওপারে নেমেছে। উত্তাল হওয়ায় জঙ্গল কাঁপছে। জঙ্গলের ভেতর কাঠকুড়োনি মেয়েদের চলাফেরায় সংকীর্ণ আঁকা বাঁকা শাদা একটি রাস্তা হয়ে গেছে। আবদুলের দিকে ঘুরে একটু হাসলেন নাসিরুদ্দিন। এই বেতমিজ! খামোকা হয়রান করছিস না তো?

বান্দা আবদুল জিভ কেটে বলে, 'ছ্যারের সঙ্গে তামাসা কত্তে পারি? আপনচোখ দেখে যেয়েছি।'

'কী দেখতে কী দেখেছিস ব্যাটা!

'খোদার কসম, ছ্যার। একজোড়া হাঁস—একটা লয়কো। দু-দুটো।'

'চল্, দেখি।'

মানুষজনের ভিড় দেখে হাঁসদম্পতি দিনমান গা ঢাকা দিয়ে থাকে। শেষ বেলায় ঝিল থেকে শেষ মানুষটি উঠে গেলে তারা স্বাধীনতা ফিরে পায়। স্বাধীনতায় সাঁতার কাটে। ডানা থেকে জল ঝাড়ে। ঝিলের জল তখন স্বাধীনতাময়—যে স্বাধীনতা নিসর্গলোকে ছড়িয়ে আছে, যে—স্বাধীনতায় সূর্য ওঠে এবং অস্ত যায়, বীজ থেকে আঁকর গজায়, বৃষ্টি ঝরে। পাখ-পাখলি পোকা-মাকড় যে—স্বাধীনতার বন্দনা করে।

ঝিলের জলে এখন স্বাধীনতা। নাসিরুদ্দিনের হাতে বন্দুক। আবদুলের দুই পকেটে ভোজালি পিস্তল। নিচে ধূসর ঝিলের দিকে ঢিবির জঙ্গল থেকে আবদুল আঙ্গুল বাড়ায়। ফিসফিসিয়ে বলে, 'ওই দেখুন স্যার। ঠাওর করে দেখুন। ওই যে কালোমতন।'

নাসিরুদ্দিন দেখতে দেখতে বলেন, 'একটা কেন রে? তুই বলেছিলি দুটো।'

'জোড়াটা দামের আড়ালে আছে হয়তো। এক্ষুনি বেরুবে।'

বন্দুক তুলে তাক করেন নাসিরুদ্দিন। আবদুলের চোখের ঢেলা ঠেলে বেরোয়। মানুষের গলায় ভোজালি চালাতে কী সীসের গুলিতে বুক ছাঁদা করে দিতে যার কুতকুতে চোখদুটো কোমল

কোমল থাকে, একটা পাখির জন্য তা ঠেলে ওঠে। উত্তেজনায় দম আটকে যায়। ফিসফিসিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, 'লেট করবেন না ছ্যার।'

আলো কমে গেছে। ঝাপসা হয়ে এসেছে ঝিলের আবহমণ্ডল।' সন্ধ্যায় ছাইরঙে ঢেকে গেছে সবকিছু। কালো পাখিটি স্থির কিংবা একটু নড়াচড়া করছে, ঠিক বোঝা যায় না। নাসিরুদ্দিন ট্রিগারে চাপ দেন। বন্দুকের গর্জন আর বারুদের কটু গন্ধে নিসর্গ আলোড়িত হয় কয়েক মুহূর্ত। শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নাসিরুদ্দিন। কালো পাখিটিকে শোলাঝাড়ে আটকে যেতে দেখলেন। বললেন, 'যা, নিয়ে আয়।'

আবদুল দৌড়ে নেমে গেল।

নাসিরুদ্দিন দাঁড়িয়ে আছেন, বন্দুকের বাঁট মাটিতে, নলটি হাতের মুঠোয় ধরা। সিগারেট ধরালেন লাইটার জেবলে—হাওয়া বড় বেয়াদপি করছে। হিজল গাছে ঠেস দিয়ে তাকিয়ে আছেন। দেখছেন, আবদুল থমকে দাঁড়িয়ে আছে। জলে নেমে হাঁসটিকে কুড়োতে যদি হাফ প্যাণ্ট ভেজে, ভোজালি দিয়ে একটা লম্বা কিছু কেটে নিক। শোলা ঝাড়টি কিনারে থেকে তেমন কিছু দূরে নয়। তবু হারামজাদা ওভাবে দাঁড়িয়ে কী দেখছে?

নাসিরুদ্দিন রুষ্ট হয়ে নেমে যান। ঢালু পাড়ে চিকন চাপ-চাপ দূর্বাঘাস। গামবুটের চাপে চেপ্টে যেতে থাকে। নিচে নেমেই গর্জন করেন, 'আই ব্যাটা!'

তখন আবদুল হাতে ইশারা করে। নাসিরুদ্দিন অবাক হন। আবদুল তাকে ডাকছে। কেন?

উঁচু ঢিবির ওপর আবদালাপাড়া। নিচে নদী বেহুলা। তিন-দিকে বহুদূরে ছড়িয়ে আছে সোলা মেলা মাঠ। কোথাও ধূসর, কোথাও দাগড়া-দাগড়া সবুজ পোঁচ। আকাশের গায়ে দাগ কেটে চলে গেছে এগারো হাজার ভোল্ট বিদ্যুতের লাইন। বেলাশেষের উদ্দাম হওয়ায় দূরের পাম্পিংযন্ত্রের গরগর শব্দ একবার কাছে ভেসে আসে, একবার দূরে সরে যায়। হাওয়া শব্দটা নিয়ে খেলা করছে।

ঘর দশেক বসতি। একটি খেড়ো মসজিদ। নিমতলায় এক পিরের দরগা। দরগাটি মাটির। সদ্য চুনকাম করা হয়েছে। চৈত্রের শেষে রবিবার ওখানে মানত মানবে আবদালারা। উনি জলের পির। জলেই ওঁর বাস। নদী খালবিল শুকোলে তখন দরগায় ফিরে আসেন। পাঁচু আবদালার ওপর ভর করেন। ঝাকড়-মাকড় চুলে ভরা মাথাটি দুলিয়ে পাঁচুর গলায় জলবাসী পির ভবিষ্যদ্বাণী করেন। লোকে বলে পানিপির। এলাকার হিন্দু মৎস্যজীবীরাও মানত দিতে আসে।

জরিনা দাঁড়িয়ে দরগার সামনে। ছেলেপুলে বিয়োতে পারেনি বলে শুধু মরদ গফুর আধদালা নয়, পাড়াপড়শিরাও গালমন্দ করতে ছাড়ে না। মরশুমে মাছ ধরতে গিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরলেই জরিনার নামে গালমন্দ, 'ওই আঁটকুড়ির মুখ দেখে গিয়েই এমন হল। গোফুরে ওকে তালাক দ্যায় না ক্যানে? ওকে যাদু করেছে ডাইনি মেয়েটা।'

এবার পাঁচুচাচার ভর উঠলে জরিনা স্পষ্ট কথাটি জানতে চাইবে, কী গোনা করেছিল সে যে এতসব বছর বিয়োনি মেয়ে আবদালাপাড়ায়, আর তার জঠরখানি খালি থেকে যাচ্ছে?

পাঁচু আসছিল নদীর দিক থেকে। থমকে দাঁড়ায় আনমনা মেয়েটাকে দেখে। পাঁচুর হাতে পলুই আর খলুই। কালীতলার দহের কাছে তোপখানার ঝিলের মুখ। মুখে জমাট চড়া পড়ে উলুকাশের জঙ্গল। ওখান থেকে ঝিলটা বেঁকে গেছে ধনুকবাঁকা হয়ে। বন্দুকের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। বন্দুকবাজদের জ্বালায় আজকাল পাখ-পাখালি নির্বংশ। শেয়ালটিও ডাকে না। ঝিলের দামের দিকে ছিল পাঁচুর দৃষ্টি। দাম নড়তেই ঝপাস করে পলুই নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল। একটা শোলমাছ ধরা পড়েছে। একাদোকা মানুষ। সামনে গফুরের বউটাকে দেখে ঠিক করে তাকেই আদ্ধেক দেবে। দিতেই হবে।

'জরিনাবিবি!'

আনমনা জরিনা চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ায়। মিষ্টি হেসে বলে, 'কী চাচা? আঁটকুড়ির মুখ দিখে যাওনিতো?'

পাঁচু আবদালা জিভ কেটে বলে, 'উ কী কথা মা জননী? বলতে নাই।' সে খালুই থেকে তাজা শোলমাছটি বের করে দ্যাখায় গফুরের বউকে। ডেকে বলে, 'আয় মা, আমার ডেরায়। আদ্দেক তোকেই দেব।'

'ক্যানে গো চাচা?'

'যখন পলুই ফেললাম ঝিলের পানিতে, তখনই মোনেমোনে কিরে করেছিলাম কী, গাঁয়ে ঢুকেই পেথমে যাকে দেখব, তাকেই আদ্দেক দেব।'

'ও! তা নৈলে দিতে না!' জরিনা খি খি করে হাসে। আচল-চাপা হাসি। পাঁচু জিভ কেটে বলে, 'দিতাম। তোকে দিতাম। গাঁয়ের মধ্যে তোর মতন ভাল মেয়ে আর কাউকে তো দেখি না।'

কথাটা ভাল লাগে জরিনার। পেছন-পেছন যায়। দরগার পাশেই পাঁচু আবদালীর ঘর। ঘর মানে নেহাত একটা কুঁড়ে। মানতের যা পয়সা কড়ি পড়ে দরগার সামনে, তা সে জমিয়ে রাখে। কোথায় রাখে, সেটা নিয়ে জল্পনা চলে আবদালাপড়ায়। নিশ্চয় কোথাও পুঁতে রাখে।

ঘর থেকে ছোট্ট বঁটি বের করে পাঁচু বলে, তুই-ই বরঞ্চ কাটাবাছা করে দে বিটি। আমার জন্যে খানিক রাখিস।'

জরিনা মাছটিকে আছাড় মারে। নিস্পন্দ হয়ে গেলে বঁটিতে কাটতে থাকে। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। পাঁচু দরগায় পিদিম জেলে দিতে যায়। ফিরে এসে লণ্ঠন জ্বালে। জরিনা বলে, 'আলো কী হবে চাচা? আমার কাজ শেষ। এই নাও, যা দেবার দাও।'

'তুই আপন হাতে আমাকে যা দেবার দে বিটি।'

জরিনা মাথা নাড়ে। 'উঁহু, তুমি বেঁটে দাও।'

অগত্যা পাঁচু বাঁটতে আসে। নিজের জন্য একভাগ রেখে দুভাগ জোর করে গফুরের বউয়ের আঁচলে তুলে দেয়। তারপর বলে, 'গোফরো কতি গেল রে? তাকে বলিস তো একবার দেখা করতে।'

জরিনা বলে, 'হাঁসগুলানের জন্যে গুগলি তুলতে যেয়েছে ঝিলে।

'এই অবেলায়?'

'বিকেলবেলায় বাড়ি এল কোত্থেকে।' জরিনা বাঁকা মুখে বলে।

'মাছ মারার ব্যাটা এখন কুতুবগঞ্জের বাজারে আড্ডা মারতে যায়। তাড়ি গিলে চুর হয়ে এল আজ। ও কি মানুষ?'

পাচু মনে মনে হাসে। বউকে বড্ড ডরায় গফুর।...

জরিনা বাড়ি ফিরে দ্যাখে, এখনও মরদ ফেরেনি। একটুখানি বুক কাঁপে তার। তাড়ি গিলে নেশায় চুর লোকটাকে তেড়েমেড়ে গুগলি তুলতে পাঠাল। জলে ডুবে মারা পড়েনি তো?

তারপরই সে আপন মনে হাসে। জলমানুষ যারা, তাদের আবার জল-থল?

জল পেলে নেশা কেটেই যাবে। যায়ও!

জরিনা উঠোনের উনুনের পাশে রাখা পাথরের টুকরোয় মাছ ঘষতে বসে। শোল মাছের ঝোল খাইয়ে লোকটাকে তাক লাগিয়ে দেবে।...

কিন্তু দিনশেষের আবছায়ায় নাসিরুদ্দিন যে কালো জিনিষটিকে আবদুলের কথায় গুলিবিদ্ধ করেছিলেন, আসলে সেটি একটি মানুষের মাথা।

রাত দশটায় কৃষ্ণপক্ষের ফালি চাঁদটুকু উজ্জ্বল হলে আবদুল, মন্টু, রশিদ আর চন্ডী ফেরে খিড়কির দরজা দিয়ে। পাঁচিলঘেরা ফুল-ফলের গাছ পালায় সাজানো বাড়িটার গেটে মার্বেলফলকে লেখা আছেঃ 'খানবাহাদুর মঞ্জিল।' ঠাকুরদা দবিরুদ্দিনের স্মৃতির তৈরি ঝকঝকে নতুন দোতালা প্রাসাদ পুরনো আমলের একতলা দালানের ভিতের ওপর কিছুটা, আবার কিছুটা এপাশে-ওপাশে নতুন ভিতের ওপর দাঁড়ানো সবুজ রঙের সৌধ। সারারাত ঝলমল করে আলোর সাজে। সামনে লন, গাড়ি বারান্দা; ডাইনে বাঁয়ে ফুলবাগিচা। পেছনে দেশী-বিদেশী ফলের গাছের বাগান। একটি চৌকোণা ছোট্ট পুকুরও আছে যা সুইমিং পুল নামে অভিহিত, যদিও কেউ বাথস্যুট পরে সাঁতার কাটে না। কিন্তু পাম্প চালিয়ে সারাবছর জলে পূর্ণ রাখা হয়। চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে এই প্রাসাদ বাড়িটি এখন গ্রামনগরী কুতুবগঞ্জের গর্ব।

নাসিরুদ্দিন পেছনের চৌকো ছোট্ট পুকুরটির ধারে সিমেন্টের

বেদীতে বসে ছিলেন। এ রাতে এদিকের আলো নেভানো। খিড়কির দরজাটি খোলা। মালীপরিবার বাস করে বাড়ির সামনের দিকে গেটের পাশে। সেখানে গ্যারেজঘর, ড্রাইভার ও দারোয়ানের ঘর, কোণার দিকটায় মালীপরিবার। গেট বন্ধ। কৃষ্ণচূড়া আর কাঠমল্লিকার ছায়ার তলায় বিদ্যুতের আলোর কুচি, মাথায় ফিকে হলুদ জ্যোৎস্না। আবদুলরা ফিরে এলে নাসিরুদ্দিন গেটের দিকটায় চোখ দ্রুত বুলিয়ে নিলেন! ওরা সবাই শুয়ে পড়েছে। জাতীয় সড়ক দিয়ে গজরাতে গজরাতে চলে গেল দূরপাল্লার একটি বাস। গেটের দিকটা জ্বালাপোড়া করে দিয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্য।

চারটি ছায়ামূর্তির সামনে নাসিরুদ্দিন হঠাৎ একটু ভয় পেলেন। চারটি পোষা ডালকুত্তা যদি হঠাৎ কোনোদিন তাঁরই ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। জানোয়ার নিয়ে সার্কাসের খেলা দেখানো!

আবদুল চাপা হাসলে নাসিরুদ্দিনের সম্বিৎ ফিরল। আস্তে বললেন, 'কী করলি?'

আবদুল ঘাসে বসে পড়ল। চন্ডী বলল, 'আবদুলদার মাথা আছে বটে! নৈলে খুব ঝামেলা হত।'

বিরক্ত নাসিরুদ্দিন বললেন, 'ধুস! পুঁতলি কোথায়?'

রশিদ বলল, 'কবরে।'

'কবরে মানে?'

আবদুল হাত নেড়ে বলল, 'ছ্যারকে যা বলার সব বলছি। তোরা এখন আয় দিকি বাপ! রশিদ! মণ্টে আর চন্ডীর সঙ্গে তুই যাসনে। ওরা যাক এক রাস্তায়, তুই ভিনরাস্তায়। কাল দেখা হবে।'

তিনজনে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল, যে পথে এসেছিল। নাসিরুদ্দিন শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে বললেন, 'দরজা বন্ধ করে দিয়ে আয় আবদুল।'

'যাচ্ছি।' সে খি খি করে হাসতে লাগল।

নাসিরুদ্দিন ধমক দিলেন, 'হাসির কী আছে? দরজা বন্ধ করে দিয়ে আয় আগে!'

অগত্যা আবদুল দরজা বন্ধ করতে গেল। নাসিরুদ্দিন ঘুরে

দোতালায় তাঁর শোবার ঘরের জানালার দিকে তাকালেন। টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে ঘরে! পর্দা ফাঁক হয়ে আছে। নেমে আসার সময় দেখেছিলেন পর্দায় জানালাটি ঢাকা। সেলিনা বেগম তিন বছরের দস্যি ছেলেকে বুকে চেপে শুয়ে ছিলেন। সিলিং ফ্যান মাথার ওপর আস্তে ঘুরছিল। রাতের দিকে এখনও একটু ঠাণ্ডার আমেজ পাওয়া যায়। তাছাড়া পূবদক্ষিণ কোণার ঘর। সারা রাত চৈত্রের হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আবদুল এসে আবার ঘাসের ওপর বসল। নাসিরুদ্দিন বললেন, 'কোথায় পুঁতলি?'

'কবরে।'

'করবে মানে?'

আবদুলের দাঁতে জ্যোৎস্না ঝকমক করতে থাকল।...'তোপ-খানার জঙ্গলেই হঠাৎ কথাটা মনে পড়েছিল। আরে তাইতো! আজই বিকেলবেলা শাদুল্লাকে হাসপাতাল থেকে এনে কবর দিলে! টাটকা কবর। কাদামাটি সরিয়ে গোফ্রো আবদালাকে ঢোকালেই হল। আবার কাদামাটি চাপিয়ে ঠিকঠাক করে দিলেই হল। আগের দিনে শেয়ালের ভয়ে কবরে কাঁটাগাছ পুঁতে দিত। আজকাল শেয়ালও নাইকো। কাঁটাগাছও পোঁতে না।'

নাসিরুদ্দিন হাসলেন। 'তোর বুদ্ধি আছে আবদুল!'

আবদুল গলপটা বলতে থাকল। কবরের টাটকা কাদামাটি, খড় আর বাঁশের সারি সরিয়ে গোফুরকে ঢুকিয়ে কেমন করে পেটের রুগী শাদুল্লার ওপর শুইয়ে দিয়েছে, কেমন করে আবার বাঁশ-গুলো সাজিয়ে খড় চাপিয়ে তার ওপর কাদামাটি দিয়ে কবরটির গড়ন ঠিকঠাক করেছে এবং একটুও ভুল হয়নি, কারণ মন্টু ও চণ্ডী হিন্দুর ছেলে হলেও রশিদ সঙ্গে থাকায় কত সুবিধে হয়েছে —এইসব বিবরণ। আবদুল নিখুঁত বর্ণনায় পাকা। তার হাতের কাজও তেমনি পাকা।

নাসিরুদ্দিন বললেন, 'ভোরে একবার তবু গিয়ে দেখে আসিস।'

'যাব বৈকি।' আবদুল বলল, 'তবে শাদুল্লার কবর দেখতে

কেউ যাবে না জেনে রাখুন।'

'কেন? ওর ছেলেরা বা ওর বউ যদি—'

'বুড়ো লোকটা মরে ওদের মোনে শান্তি দিয়েছে। বুঝলেন না ছ্যার?' আবদুল হাত বাড়াল। 'এবারে একটা সিকারেট দ্যান, টানি!'

'কাদা মেখেছিলি নিশ্চয়। ধুলি কোথায়?'

'ঝিলে। দ্যান, সিকারেট দ্যান!'

আবদুল নিচের তলায় একটা ঘরে থাকে। পুরুষানুক্রমে এ বাড়ির বান্দা সে। তিনবার বিয়ে করেছিল। তিনবারই তালাক দিয়েছে। মেয়েদের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আবদুলের।···

নাসিরুদ্দিন ঘরে ফিরে থমকে দাঁড়ালেন। সেলিনা বেগম পুবে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সাড়া পেয়ে ঘুরলেন। নাসিরুদ্দিন বললেন, 'ঘুমোও নি! কী ব্যাপার?'

'আর কতকাল এসব করবে?' সেলিমা বেগম আস্তে প্রশ্নটা করলেন।

'কী সব?'

'ন্যাকামি কোরোনা!' সেলিনা ঝাঁঝালো স্বরে বললেন। 'সন্ধ্যা থেকে তোমার আজ কেমন ছটফটানি লক্ষ্য করছি। নিশ্চয় আবার কাউকে—'

নাসিরুদ্দিন রুক্ষস্বরে বললেন, 'শাট আপ! বাড়াবাড়ি কেরো না। মেয়েদের সবতাতে নাক গলাতে নেই।'

সেলিনা ভাঙগা গলায় বললেন, 'কিন্তু যেদিন উল্টে তোমার কিছু হবে, সেদিন আমি কী করব?' কলেজ জীবনে প্রেম করে মফস্বল শহরের এক আইনজীবীর এই কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন নাসিরুদ্দিন। দেখতে দেখতে তিরিশ বছর কেটে গেল। তিনটি ছেলে তিনটি মেয়ে'র মা হয়েছেন সেলিনা। বড় ছেলে কলকাতার কলেজে পড়ে একটি মেয়ে শান্তিনিকেতনে পড়ছে। মেজ ছেলে স্থানীয় স্কুলের ছাত্র। এখনই দুর্দান্ত মস্তান। ছোট ছেলে খাটে শুয়ে আছে। বাকি দুটি মেয়ে সদর শহরে দাদামশাইয়ের বাড়িতে থেকে সেখানকার গার্লস স্কুলে পড়ে। কুতুবগঞ্জে এখনও গার্লস স্কুল হয়নি। চেষ্টা চলছে, নাসিরুদ্দিন লড়ছেন। লড়ছেন বাবু-পাড়ার বাবুমশাইরাও।

নাসিরুদ্দিন ওই কণ্ঠস্বর শুনেই সপ্রেমে স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এক মুহূর্তের জন্য ইচ্ছে হল, আজকের অ্যাকসিডেণ্টটা বলে মনের ভার হাল্কা করেন। কিন্তু পারলেন না। সেলিনা বেগম তাঁকে এখন প্রেমিক করে ফেলেছেন। প্রেমের কোমল সুন্দর গালিচায় রক্তের ছোপ ফেলাটা উচিত হবেনা। তবে অ্যাকসিডেণ্ট ইজ অ্যাকসিডেণ্ট। তিনি তো লোকটাকে খুন করতে চান নি! তারই বরাত! তিনি নিমিত্ত মাত্র।...

থানার উঁচু বারান্দায় বিশাল টেবিলের সামনে বসে ও সি হিতেশরঞ্জন একটি ফাইল দেখছিলেন। সদ্য ফিরছেন পাশের একটা গ্রামে হাঙ্গামার তদন্ত সেরে। ঘোমটা ঢাকা একটি মেয়ে আর তার সঙ্গে রোগা পাঁকাটি চেহারার লোক, ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা চুল আর গোঁফদাড়ি—যাকে পাগল বলেই ভুল হতে পারে, নিচের লনে করজোড়ে দাঁড়াল। হিতেশরঞ্জন বললেন, 'দ্যাখো তো হবিবুর, কী চায় ওরা?'

কনস্টেবল হবিবুর বলল, 'তুমি আবদালা পাড়ার পাচু না?'

'জি হুজুর।'

'কি হয়েছে?'

পাঁচু বলল, 'গোফরোকে অবশ্যি চিনলেও চিনতে পারেন। তবে সে চোর-চোট্টা লয়কো। এই মেয়েটা হল গোফরোর বউ।'

হবিবুর হা হা করে হাসল। 'গোফরো পিটিয়েছে বুঝি?'

জরিনা আর চুপ করে থাকতে পারল না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্নাজড়ানো স্বরে বলল, 'আজ তিন দিন আমার মরদের খবর নাইকো হুজুর। সন্ধে বেলা হাঁসের জন্যে তোপখানার ঝিলে গুগলি তুলতে গেল। আর বাড়ি ফিরল না।'

পাঁচু বলল, 'চোরচোট্টা কি না আপনারা ভালই জানেন হুজুর! খামোকা একটা মানুষ নিপাত্তা হয়ে যাবে, ই কী কথা! দোষের মধ্যে শুধুই তাড়িটা-গাঁজাটা খেত—এই যা!

হবিবুর বড়বাবুর উদ্দেশে বলল, 'গোফুর স্যার! শুঁটকি মাছ বেচে বেড়াত দেখেছি। সেই গোফুর তিনদিন নিখোঁজ।'

হিতেশরঞ্জন মেয়েটিকে দেখছিলেন। দেখতে মন্দ না। ঘোমটার ফাঁকে সরল বোকাসোকা মেয়েমানুষের মুখ। বললেন,

'আত্মীয়স্বজনের বাড়ি খোঁজ নিয়েছ ?'

পাঁচু বলল, 'সে কি আর নিইনি হুজুর ? কুথাও খবর নাইকো।'

হবিবুরের উদ্দেশে বড়বাবু বললেন, 'অ্যাকসিডেন্ট তো হয়নি হাইওয়েতে ?'

হবিবুর বলল, 'আমাদের এরিয়ায় তেমন কিছু হয়নি স্যার—অন্তত এসপ্তায় কিছু হয়নি।'

বড়বাবু ডাকলেন, 'এখানে এস। ওগো মেয়ে! এখানে এস।'

পাঁচু ঠেলতে ঠেলতে সিঁড়ি বেয়ে উঁচু বারান্দায় ওঠাল। ধপাস করে বসে পড়ল জরিনা। আবার ফুঁপিয়ে কান্না। হিতেশরঞ্জন ভুরু কুঁচকে দেখছিলেন ওকে। এলাকায় মারদাঙ্গা খুনোখুনি বেড়েই চলেছে। তবে তিনি অন্য কিছু খুঁজছিলেন মেয়েটির মধ্যে। অন্য কারুর সঙ্গে প্রেমট্রেম করে স্বামীকে খুন করিয়ে ন্যাকামি করতে এসেছে নাকি। জেরা শুরু করলেন হিতেশরঞ্জন। কিছু কথার জবাব পাঁচু দিতে চেষ্টা করলে তাকে চোখ কটমট করে ধমক দিলেন। পাঁচু কোণঠাসা হয়ে বসে রইল।

সাব-ইন্সপেক্টার হরিদাস সাধুখাঁ অফিসঘর থেকে বেরিয়ে কথা শুনছিলেন। জেরা শেষ হলে বড়বাবু তাঁকে বললেন, 'মিসিং ডায়রি লিখে নিন তো হরিদাসবাবু। রেডিও মেসেজ পাঠানোর ব্যবস্থা করুন অন্যান্য স্টেশনে। ওগো মেয়ে, যাও ওঁর সঙ্গে।'

পাঁচু ও জরিনা অফিসঘরে ঢুকলে হবিবুর চাপাস্বরে বলল, 'মেয়েটার ক্যারেক্টার ভাল নয় স্যার!'

হিতেশরঞ্জন ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তাই বুঝি ?'

'হুঁ—আবদালাপাড়ার লোকের কাছে শুনেছি।'

'সে লোকটা কে ?'

হবিবুর ঝটপট বলল, 'সেটা ঠিক শুনিনি স্যার! খুঁজলে বেরুবে। তবে পাড়ার কারুর সঙ্গে মেয়েটার বনিবনা নেই। আর গোফরোও এক হারামজাদা—রোজ বিকেলে তাড়ি খেতে আসে বাজারে।'

'খোঁজ নাও তো ভাল করে।' হিতেশরঞ্জন ফাইলে চোখ রাখলেন ফের।...

নাসিরুদ্দিন খানচৌধুরি তাঁর তিনবছরের কনিষ্ঠপুত্রটির সঙ্গে রঙ্গীন বল নিয়ে খেলা কবছিলন। লনের কোমল ঘাসের ওপর টলমল করে হেঁটে বেড়াচ্ছিল পিংকু নামে ডাগরডোগর শিশুটি। বাবার দিকে বল ছুঁড়ে খিটখিট করে হাসছিল। বিকেলের রোদ্দুর মখমল ঘাসে ঝলমল করছিল। এমন সময় বন্ধ গেটের গরাদের ওধারে দুটি মানুষকে দেখতে পেলেন নাসিরুদ্দিন। নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন।

দারোয়ান করিম কিছুতেই ঢুকতে দিচ্ছেনা। বলছে, 'এখন ছ্যারের সঙ্গে দেখা হবে না। কাল দশটা এগারোটায় পঞ্চায়েত আপিসে যেও।'

নাসিরুদ্দিন বলটি হাতে নিয়ে হাঁক দিলেন, 'কী করিম ?'

করিম বলল, 'আবদালাপাড়ার পাঁচু ছ্যার !'

বুকের ভেতর ঠান্ডা একটা বল গাড়িয়ে গেল নাসিরুদ্দিনের। জীবনে কত খুনখারাপির হুকুম দিয়েছেন, একটুও বুক কাঁপেনি। অথচ কদিন থেকে কী একটা গোপন সন্ত্রাস তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ঘুম হচ্ছে না। ভাল করে খেতে পারছেন না। সেলিনাকে সব খুলে বলতে ইচ্ছে করছে, তবু পারছেন না।

বললেন, 'ভেতরে আসতে দে ওদের।'

পাঁচু আর জরিনা এসে সামনে দাঁড়াল। জরিনার মুখ ঘোমটা ঢাকা। পাঁচু আদাব দিয়ে বল, 'গফুরকে চেনেন কি না জানিনা হুজুর। তারই বউ। সেলাম কর মা চৌধুরিসাহেবকে।'

জরিনা কপালে হাত ঠেকাল। নাসিরুদ্দিন চমকে উঠলেন। বছর কুড়িবাইশের বেশি বয়স নয়। ছিপছিপে গড়নের যুবতী মেয়ে। বন্য ও সরল সৌন্দর্য্যের ওপর গাঢ় বিষাদের ছাপ।

পাঁচু বলল, 'গোফরো তিনদিন থেকে নিপাত্তা হুজুর। তাই থানায় গিয়েছিলাম মেয়েটিকে নিয়ে—যদি কিছু কিনারা হয়।'

'থানায় গিয়েছিলে ?' নাসিরুদ্দিন আস্তে বলল, 'কী বলল পুলিশ ?'

পাঁচু কাঁচুমাচু মুখে হাসবার চেষ্টা করল। 'কাগজে লেকে তো নিলে। পথে আসতে আসতে খ্যাল হল, একবার চৌধুরি-সায়েবের কাছে যাই। অনুগ্র করে যদি হুজুর থানায় একটু বলে দেন।'

নাসিরুদ্দিনের পায়ের কাছে এসে পিংকু বলটি কেড়ে নেবার চেষ্টা করল তারপর বলটি পেয়ে সে জরিনার দিকে ছুঁড়ে দিল। জরিনা বলটি তার হাতে তুলে দিল কয়েক পা এগিয়ে। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। নাসিরুদ্দিন বিব্রত মুখে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছে কিছু বলে যায় নি গোফুর?'

জরিনা কান্নার মধ্যে বলল, 'তোপখানার ঝিলে হাঁসের জন্যে গুগলি তুলতে গেল বিকেলবেলা। কিনারায় গুগলিগুলান জড়ো করা ছিল। লোকটা নাইকো।'

'বলো কী।'

পাঁচু বলল, 'জি হুজুর। হেরকেন হাতে ঝিলের ধারে দুজনে খুঁজতে এলাম। তখনও জোসনা ওঠেনিকো। দেখি কী, এতগুলান গুগলি জড়ো করা আছে মানুষটা নাইকো। ই বড় ধন্দর কথা হুজুর।'

'থানায় বলেছ?'

'জি।'

'ঝিলের পানিতে খুঁজেছ? ডুবেটবে—'

কথার ওপর জরিনা বলল, 'গাঁসুদ্ধুলোক ঝিলের পানি খুঁজছে হুজুর।'

পাঁচু বলল, 'ডুবে মারা গেলে অ্যাদিনে ভেসে উঠত।'

নাসিরুদ্দিন শ্বাস ছেড়ে বললেন,'ঠিক আছে। এসো তোমরা। বড়বাবুকে বলব'খন। ওরা চলে যাচ্ছিল, ফের ডাকলেন, 'শোনো।'

দুজনে ঘুরে দাঁড়াল। তখন নাসিরুদ্দিন বললেন, 'ওর চলছে কী করে? গোফুরের অবস্থা কেমন ছিল?'

পাঁচু বলল, 'বড় কষ্টে পড়েছে মেয়েটা। গোফরে হারামজাদা তো মদমাতাল লোক ছিল। যা রোজগার করত, সব উড়িয়ে দিত। ঘরে চাট্টি শুঁটকিও নাইকো যে বেচে খাবে।'

'কাল একটা দরখাস্ত লিখেনিয়ে আসতেবলো ওকে—পঞ্চায়েত অফিসে। কেমন? যদি পারি, কিছু টাকাকড়ি পাইয়ে দেব।'

ওরা চলে গেলে পিংকুকে কোলে তুলে নিলেন নাসিরুদ্দিন। সামনের দোতালার ব্যালকনিতে সেলিনা বেগম দাঁড়িয়ে আছেন। ওই মুখে কী একটা দেখলেন নাসিরুদ্দিন। বুকে আবার ঠান্ডাহিম একটা বল গড়িয়ে গেল।

কদিন পরের কথা।

চৈত্রমাসের শেষ রবিবার আবদালাপাড়ার 'পানিপিরের' দরগায় পাঁচু আবদালার ভর উঠেছে। এলাকার হিন্দু মৎস্যজীবীরাও পানিপিরের দরগায় এদিন মানত দিতে আসে। পিরবাবার দয়ায় তারা জলের শস্য কুড়িয়ে—বাড়িয়ে বেঁচেবর্তে আসে। হিন্দু-মুসলমানের ভিড়ে ছোট্ট বসতিটি গমগম করে। সামনের চটানে ছোটখাটো একটা মেলাও বসে যায়। একটা বিকেলের এই মেলায় পাঁপর ভাজার গন্ধ ভাসে। তালপাতার বাঁশি বাজে মনোহারিওয়ালারাও চট বিছিয়ে বসে থাকে। দরগার সামনে মানতকারীদের ভিড়। পাঁচু আবদালা মাথা দোলাচ্ছে। মানত করে বসে দুটো হাত হাঁটুতে রেখে ঝাঁকড়া মাথাটিকে চক্কর খাওয়াচ্ছে চর্কির মতো। এ পাঁচু সে—পাঁচু আবদালা নয়, স্বয়ং জলবাসী এক অশরীরী মহাত্মা—তাঁর নাম পানিপির। পাঁচুর মুখ দিয়ে তিনিই কথা বলছেন। সে-কথা বোঝা সহজ নয়। শুধু বোঝে ওই জলচরা মানুষ যারা, তারাই। এবার কোন মাসে কোন জলায় কেমন মাছ হবে, আকাশ কেমন বর্ষাবে—তারই বৃত্তান্ত।

জরিনা দরখাস্ত লিখিয়ে নিয়েছিল কুতুবগঞ্জের জহুরিবাবুকে দিয়ে। হুজুর চৌধুরিসায়েব একশো টাকা—যাতা কথা নয়কো, নগদ একশো টাকা 'ছ্যাংছান' করেছেন। সেই টাকা পেয়ে জরিনা ভেবেছে, গঞ্জের বাজারে গিয়ে পানসিগরেটের দোকান খুলবে। মরদের কথা ভাবতে গিয়ে তবু হঠাৎ দমে যায়। বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে কান্নার গোটা। ঝরঝরিয়ে চোখ দিয়ে ভেঙ্গে বেরিয়ে যায় বর্ষার মেঘের মত। মধ্যরাতে চোখ মুছে আবার ভাবে, যদি হঠাৎ কোনোদিন ফিরে আসে লোকটা, কী অবাক না হবে—তার বউ পানওয়ালি সেজে বসে আছে পিচ রাস্তার ধারে।

মেলার ভিড়ে ঘুরছিল জরিনা। হাতে টাকা এসেছে। কী কিনি, কী কিনি এই অস্থিরতা। শুঁটকির কটু গন্ধ ঘুচে গেছে চৈত্রের উত্তাল হাওয়ায়। পাঁপর ভাঁজার গন্ধ বসেছে চেপে। আজ আবদালাপাড়ায় একটা সুদিনের দিন। এই দিনটির প্রতিক্ষায় থাকে এলাকার যত সব জলচরা মানুষজন। পানিপিরের সামনে খুচরো পয়সার ঝকমকানি দেখে জরিনার মনে পড়ে সে একটা আধুলি মানত করে ছিল।

আধুলি কেন, একটা টাকাই দেবে বরং! নোটটা চাদরে রেখে সেলাম করতেই শোনে মাথাদোলানো পানিপিরের কণ্ঠস্বর।

…তোপখানার ঝিলে গিয়েছিল গোফরো। আর গিয়েছিল পাঁচু আবদালা। বন্দুকের আওয়াজ শুনেছিল। ঝিলের ধারে গুগলিগুলান জড়ো করা ছিল।

জরিনা ডুকরে কেঁদে বলে, 'পানিবাবা! আমার মরদ কতি গেল?'

পানিপির ফের বলেন, 'তোপখানার ঝিলে গিয়েছিল গোফরো। আর গিয়েছিল পাঁচু আবাদালা। বন্দুকের আওয়াজ শুনেছিল। ঝিলের ধারে গুগলিগুলান জড়ো করা ছিল।'

কেউ কিছু বুঝতে পারে না। মুখ তাকাতাকি করে পরস্পর। জরিনা কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'দশটাকা মানত দিই পানিবাবা! বলো, আমার মরদ কতি গেল?'

পানিপিরের জড়ানো গলায় কথা এলোমেলো হতে থাকে ক্রমশ শুধু 'বন্দুকের আওয়াজ' কথাটি বোঝা যায়। জরিনা এবার পিরবাবার পায়ে মাথা কুটতে থাকে। মেয়েরা তাকে টেনে সরিয়ে আনে। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য জলচরা মানুষজন অন্য বার্তা শুনতে চায় জলবাসী অশরীরী মহাত্মার কাছে। গোফুর, পাঁচু, বন্দুকের আওয়াজ, জড়োকরা গুগলি— সবই তুচ্ছ এখন। দয়া করে বৎসরান্তে পিরবাবা যখন এসেছেন, তখন 'বন্দুকের আওয়াজ' কথাটার মানে খুঁজে কে দেখতে চায়? কেউ না।

জরিনাকে মেয়েরা সান্ত্বনা দিতে একান্তে নিয়ে যায়। আর জরিনাও পানিপিরের মতো ভাঙ্গা জড়ানো কণ্ঠস্বরে বিড়বিড় করে, 'বন্দুকের আওয়াজ…বন্দকের আওয়াজ। ক্যানে উ কথা বুললে পিরবাবা? বুলো, তোমরা বুলো! ক্যানে বন্দুকের আওয়াজ, বুলো?'

আবদালাপাড়ার সবচেয়ে কুঁদুলি বুড়িটাও ফোঁস করে নাক ঝেড়ে বলে, 'চুপ কর মা! চুপ করদিকিনি! বাবা পানিপিরের হেঁয়ালি বোঝে সাধ্যি কার?'…

কাঞ্চী, বদন এবং বাঁকার গল্প

শহরের কোর্টে মুকুটমণির আজ একটা ফৌজদারি মামলার দিন। বেরুতে যাচ্ছেন, সেই সময় সুমুখে অযাত্রার মতো বাঁকাকে ঝুড়িতে বসিয়ে বাঁশের ভারায় ঝুলিয়ে ওর দুই স্যাঙাত হাজির হল।

বাঁকা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, মটুকবাবু, আদাব।

মুকুটমণি বললেন, এমন সময় এলি বাপ? এখন যে বেরুচ্ছি। পরে একদিন বরং—

বাঁকা ঝুড়ি থেকে ব্যাঙের মতো থপথপ করে বেরুল। লুঙ্গির ভেতর হাঁটু থেকে দুটো ঠ্যাংই যে কাটা, বোঝা যায় না। দুহাতের তালুতে একটুকরো করে কাঠ আটকে রেখেছে। হাত ভর দিয়ে পাছা থেবড়ে ঠাঁইনড়া হতে পারে।

বাঁকা একটু হাসল।···অনেক কষ্ট করে এলাম মটুকবাবু। মবুব আর কেতোকে পাঁচটা করে টাকা মিটিয়ে দিন।

মবুব আর কেতো মিটিমিটি হাসছিল। এই কালুডহরি গাঁয়েই বাসরাস্তার শেষ। নদীর ওপারে নাবাল মাটির এলাকা। বিলখাল কাশকুশের জঙ্গল ভেঙে দু ক্রোশের ধাক্কা! কাধ টাটাচ্ছে।

মুকুটমণি টাকার কথা শুনে বললেন, কী মুশকিল।

মুশকিল কিসের মটুকবাবু? আপনার জন্যে কী করিনি?

কেতো উসকে দিল একটু।···এখনও করবে। বাঁকাদার হাত দুখানা আছে, এই যথেষ্ট। কী মবুব?

মবুব সায় দিল।

বাঁকাকে বীরহাটার লোকেরা ফাঁদে আটকেছিল। বেধড়ক মার, টাঙ্গির কোপ। দুটো পায়ের হাড় বেরিয়ে পড়েছিল। মুকুটমণির অবশ্য শোনা কথা। শুনতে পেয়ে বলছিলেন, দুষ্টের মরণ গোড়হরে।

কিন্তু মরণ হয়নি বাঁকা সেখের। গতর দেখে বরং মনে হচ্ছে, আর ফুল উঠেছে। গোঁফ বৃষ্টিখাওয়া ঘাসের মতো সতেজ।

মুখ গুমোট করে মুকুটমণি দশটা টাকা বের করে দিলেন দুই স্যাঙাতকে। সাপ নিয়ে খেলা!

টাকা পেয়েই ওরা চলে গেল। স্তম্ভিত মুকুটমণি ডাকছিলেন। ওরা যেন শুনতেই পেল না। ঘুরে চোখ কটমট করে বললেন, ব্যাপার কী রে তোদের?

আমাকে একটুখানি ঠাঁই দেবেন বলেই কষ্ট করে আসা।

কোথায় ঠাঁই দেব তোকে? আমার মাথায়?

ও কী কথা মটুকবাবু? আপনার জন্যে কী না করেছি?

করেছিস কি মাগনি? টাকা নিসনি?

ইচ্ছে করছিল মুখে দুটো লাথি মারেন। কিন্তু বাসের সময় হয়ে গেছে। কথা না বাড়িয়ে হনহন করে চলে গেলেন মুকুটমণি। বাঁকা খুব ডাকাডাকি করল! পিছু ফিরলেন না।

বাড়িটা গাঁয়ের টেরে। গাছপালা ফুলেফলে ঢাকা চারদিক থেকে। কতক দূর গেলে নদীর বাঁধ। বর্ষায় দৈবাৎ সে বাঁধ ভেঙে গেলেও এই উঁচু ভিটেতে বান পৌঁছয় না।

বাঁকার যখন ঠ্যাং দুটো আস্ত ছিল, সে এত তৎপর মানুষ ছিল না। মারাদাঙ্গার সময় আলাদা, অন্য সময় সে ঝিমধরা মানুষ। বড্ড ঘুম পেত খালি। কিন্তু ঘুমুতে গেলে কয়েকজন স্যাঙাতকে পাহারায় রাখতে হত। তাদের কাছে পিস্তল তো ছিলই। একটা স্টেনগান পর্যন্ত ছিল। স্টেনগানটা নিয়ে কেটে পড়েছে যে, তার নাম মজিদ। সে নাকি এখন পদ্মাতীরে বর্ডারমুলুকে গিয়ে আছে। জিনিসটা আজ থাকলে কত কাজ দিতে ভাবতে কষ্ট হয় বাঁকার।

সে বাঁশ আর ঝুড়িটা গেটের পাশে রেখে উঁকি মারছিল ভেতর দিকে। ঠ্যাং দুটো থাকলে এতক্ষণ মটুকবাবু তাকে বসার ঘরে সোফায় বসিয়ে ফ্যান চালিয়ে দিতেন, চা আসত। সন্দেশ আসত। মটুকবাবুর মেয়ে কাঞ্চী এসে জানতে চাইত, আজ কত-গুলো লোক বসিয়ে এসেছে গব্বর সিং? বসানো ব্যাপারটা সে জেনে গিয়েছিল। বাঁকাকে সে গব্বর সিং বলে ডাকত। শহরে 'শোলে' নামে একটা সিনেমা এসেছিল। এলাকার লোক ঝেঁটিয়ে গিয়ে দেখেছিল। বাঁকা ছবি দেখে না। তবে একটা ছবির মানুষ 'গব্বর সিংয়ের কথা শুনে তার একবার দেখার ইচ্ছে হয়েছিল।

তখন সমস্যা, টাউনের অমলবাবুর সঙ্গে তার বিবাদ। অমলবাবুর গ্যাং গ্রামাঞ্চলেও ছড়ানো। বীরহাটার রিকশোওয়ালারাও তার লোক। তাদের একজনকে বাঁকার গ্যাঙের একজন বসিয়ে দেয়। শোধ তুলতে অমলবাবু একদিন মোটরসাইকেলে চেপে সিনেমা হলের সামনে থামে, সেখানে 'শোলে' চলছিল। তারপর ম্যানেজারকে শো থামাতে বলে। হলের ভেতর আলো জ্বালাতে হুকুম দেয়। সেই আলোয় বাঁকার দুই স্যাঙাত নুরু আর গণেশকে খুঁজে বের করে। খবর ঠিকই ছিল। অমলবাবু নিজেই গুলি করে দুজনকে। বেরিয়ে এসে ধীরেসুস্থে মোটরসাইকেলে চেপে বাড়ি ফেরে। বাঁকা বলেছিল, আচ্ছা। দেখছি।

দেখার আগেই বীরহাটায় গিয়ে ফাঁদে পড়েছিল। ওরা ভেবেছিল মরে গেছে। তা না হলে শ্বাসনালী কেটে দিত। বাঁকার প্রাণ খুব শক্ত।

গেটটা কাঠের। ফুট পাঁচেক উচু। সেখানে একটা লোহার খাপ আটকানো। অনেকবার উঁচু হয়ে হাত বাড়িয়ে খাপটা খুলতে পারল না বাঁকা। তখন ডাকতে লাগল, দিদি গো। বাবুদিদি গো! গব্বর সিং এসেছে গো!

বারান্দায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির মাহিন্দার বদন দেখছিল। বাঁকা সেখ তার কাছে ছিল বিস্ময়কর মানুষ। সে খালি প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে দেখত তাকে। ভাবত, এই মানুষ মানুষ মারে। সে বড় বীর। অমন বীর হতে পারলে বদন মটুকবাবুর মাহিন্দারি করত কি? বাবুগিন্নির সব সময় জাত তুলে কথা সহ্য করত কি? ধড়াম্ধড় বোম মেরে উড়িয়ে দিত না?

বদনই এল একগাল হেসে। উরেব্বাস! বাঁকাদা যে গো! বলে সে গেট খুলে দিল।

বাঁকা হুকুম করল, পেছেখানা আর বাঁশখানা বারান্দায় উঠা। আর গিন্নিমাকে খবর দে।

বদন হুকুম তামিল করল। বাঁকা পাছা ঘষটে ফুলবাগিচার মাঝখান দিয়ে লন পেরিয়ে বারান্দার সিঁড়ির কাছে একটু জিরিয়ে নিল। তারপর অনেক চেষ্টার পর উঠতে পারল।

মুকুটমণির স্ত্রী স্বাধীনবালা বসার ঘরের দরজা খুলে উঁকি দিলেন। দিয়েই চমকে গেলেন।...এ কী বাঁকা। এ কী অবস্থা

হয়েছে তোমার ?

দেখুন মা জননী।

স্বাধীনবালা জিভ চুকচুক করে বসলেন, আহা রে ! এমন করে মানুষ ? বাবু একটু আগে বেরিয়েছেন। দেখলে—

আজ্ঞে। তবে দেখুন, জানে মারলেই বেঁচে যেতাম। বাঁকা বাবুর কথায় গেল না। ভজকটতে পড়া ঠিক হবে না।

তুমি এলে কী করে ?

বাঁকা ঝটপট বলল, রেখে গেল। আগে এক কাপ চা খাওয়ান, মা। আর বাবুদিদিকে ডাকুন—গব্বর সিং এসেছে বলুন। বললেই ছুটে আসবে।

স্বাধীনবালা বললেন, কাণ্ডী পড়তে বসেছে মাস্টারের কাছে। তুমি ভেতরে এসে বসো।

মা মেয়ে দুজনেরই মন কোমল, বাঁকা জানে। আর মটুকবাবুর মনও কোমল বলা যায়। হরি মোড়লের খামার জ্বালাতে গিয়ে তাকে বসিয়ে দিলে বাবু ঘড়ঘড়ে গলায় বলেছিলেন, আহা, রোগা মানুষ ! ওকে কেন আর—ক্যান্সারের রুগী ছিল।

বাবু বোঝেন না, এসব দৈবাৎ হয়ে যায়। একটা বড় কাজের সময় কারুর অত খেয়াল থাকে না, হাতছুট হয়ে কে বসে গেল। তবে মোড়লকে বসানোতে বাবুর বাড়তি খরচ হয়েছিল প্রচুর। মর্গের ডাক্তার, পুলিস, কোর্টের লোক—আরও যাকে-যাকে লাগে। বাবুর সব ঘাঁট ভাল রকম জানা আছে। কালক্রমে বাঁকাও সেগুলো জেনেছিল। গোলাম দারোগা একবার তাকে বলেছিলেন, বাঘে খায়—সেও আড়ে-ওড়ে খায়। তুমি শালা দেখছি পশুরাজ সিংহ। একটা একটা করে কেশর ওপড়াব—থামো ! গোলাম বদলি হয়ে যান কিছুদিন পরে। বাঁকার ঝাঁকড়া কেশরে আর হাত পড়েনি। তার মুরুব্বিরা দারোগার চেয়ে বড় ছিল।

তাহলে বাঁকা, এখন থাকো কোথায় ? স্বাধীনবালা বললেন। বদনের হাতে চায়ের কাপপ্লেট এল। প্লেটের কোণায় দুটো নারকেলনাড়ু।

বাঁকা তার কাপ-প্লেট চিনতে পারে। সেই সুদিনের ছবি ফিরে এসেছে, স্বাদগন্ধ সব অটুট। হাসপাতাল থেকে ভগ্নীপতি নিয়ে গিয়েছিল। আমার তো জানেন—

কেন? তোমার বাড়ি কী হল?

আছে। যেতে ভরসা পাই না।

তোমার বউ?

হাসতে গিয়ে বাঁকার গলায় চা আটকে গেল। অনেকবার কেশে কেশে সামলে বলল, কবে তাকে তালাক দিয়েছি—সে কি আজকের কথা!

আর বিয়ে করোনি তাহলে?

আজ্ঞে না।

এই একটা ব্যাপারে বাঁকার খুব নাম ছিল। মেয়েদের দিকে ঘুরেও তাকাত না। বরং মেয়েদের ওপর কোথাও তার স্যাঙাতরা হামলা করলে গালে থাপ্পড় মারত। কিছু গুণ না থাকলে গ্যাংয়ের লিডার হওয়া যায় না।

স্বাধীনবালা ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, এখন তাহলে ভগ্নীপতির বাড়িই থাকছ?

আজ্ঞে, থাকতে পারলাম কই?

কেন—তোমার নিজের বোন তো?

বাঁকা সুড়ৎ করে চা টেনে ফিক করে হাসল।...আমাকে রেখে ওদের সব সময় ভয়। অনেক লোক আমার হাত বসেছে। তাদের লোক এবার যদি—বুঝলেন না? হাতি পাঁকে পড়লে চামচিকে এসে লাথি মারবে।

হুঁ, বুঝেছি। স্বাধীনবালা চিন্তিতভাবে বললেন। তাহলে কী করবে ভাবছ?

বাবু আসুক। এসে যা হয়, করুক।

কথাটা শুনে একটু অবাক হলেন বাবুগিন্নি। তুমি এখানে কোথায় থাকবে?

বাঁকা ঝটপট হাত তুলে বলল, বাবু আসুক। না এলে তো যাওয়ার যো নেই আমার।...

মুকুটমণি ভেবেছিলেন কথাটা। বাঁকা বাড়ির সামনে থেকে গেল! কিন্তু বাস ছেড়ে গেলে বিপদ। রিকশ চেপেও যাওয়া যায়। কিন্তু সামনে বাতাস, তা ছাড়া ঝুঁকিও আছে। কার মনে কী থাকে।

বাসস্ট্যান্ডে ছোট্ট বাজার। বাজারেই দেখা হয়েছিল বাঁকার দুই স্যাঙাতের সঙ্গে। ইতিমধ্যে বাসের আগাপাছতলা লোক ভর্তি হয়ে গিয়েছিল! তবে মুকুটমণির সিটে কথামতো লোক বসিয়ে রেখেছিল হানিফ কন্ডাক্টর। ড্রাইভার গণেশবাবু তখনও ঘেঁতোর দোকানে পানের জন্য হাত বাড়িয়ে আছেন।

সেই অল্প সময়ে কথা হল মবুব আর কেতোর সঙ্গে। তাদের হাতে চায়ের গেলাস।

কী রে? তোরা ভেবেছিস কী?

মটুকবাবুর কথা শুনে কেতো বলল, আজ্ঞে?

ও ব্যাটাকে যে বয়ে আনলি, ফেরত নিয়ে যাবি নে?

মবুব বলল, সে-কথা হয়নি বাবু। আমরা টাউনে যাচ্ছি।

যদি ওকে কেউ বসিয়ে দেয়, কী হবে?

কেতো বলল, কী হবে? বসলে বসবে। তাতে আপনারই বা কী, আমাদেরই বা কী?

তোরা বড্ড নেমকহারাম।

মবুব চটে গেল।...ক্যানে মশাই? ওকে চেয়ারটেবিলে বসিয়ে বসিয়ে চা খাওয়াতেন, ভুলে গেলেন?

ঝগড়া করা ঠিক নয় এদের সঙ্গে। তা ছাড়া, গণেশ ড্রাইভার উঠে বসেছেন। কন্ডাক্টার হাহিফ চেরা গলায় হাঁকছিল রুটের নাম ধরে। ইলেকট্রিক হর্ন বাজলে মুকুটমণি বাসের দিকে দৌড়ুলেন।

সারা পথ মনে অস্বস্তি রয়ে গেল। শহরের স্ট্যান্ডে বাস থেকে নেমে মবুব-কেতোকে খুঁজছিলেন মুকুটমণি। তারা ছাদে ছিল। নেমে এলে কোমল স্বরে বললেন, আয় বাপ। কথা বলতে বলতে যাই।

এবং মবুবের একটা হাতও নিলেন হাতে। মবুবের হাতে প্রকান্ড ঘড়ি। পরনে ড্রাগন আঁকা গেঞ্জি আর নীল প্যান্ট। কেতোরও একই পোশাক। টাউনে আসবে বলেই গাঁ থেকে সেজে বেরিয়েছিল। তবে তারিফ করতে হয় ছেলেগুলোর। কাঁধে বাঁশের ভরা নিয়ে বাঁকার মতো লোককে ঝুড়িতে চাপিয়ে চার মাইল খাল-বিল-জঙ্গল ভেঙেছে।

তোরা ঠিকই বলছিলি, বুঝলি? মুকুটমণি বললেন। আমি নেমকহারামই বটি। কেন কী—তোরা এখনও বাঁকার জন্য কষ্ট

করতে পেরেছিস। বলতে গেলে এক সময় তোদের মাথার ওপর ছাদ হয়ে ছিল সে।

কেতো বলল, আমরা আসতাম। বললে বলে নিয়ে এলাম।

ওর ভগ্নীপতি বললে। পাঁচটা টাকাও—মবুব বলতে বলতে থেমে গেল।

মুকুটমণি খ্যা খ্যা করে হেসে উঠলেন। ডবল উপার্জন! ছেলে বটিস বাপ। ভগ্নীপতি মানে আবদুল?

আজ্ঞে। বললে, আপদ হটা দিকি! টাকা পাবি।

তাই বলল আব্দুল?

বললে কি সাধে মশাই? কখন বে-পার্টি বসাতে আসবে বাঁকাকে। এলে যা হয়।

আব্দুল আমার বাড়ি পাঠাল?

কেতো বলল, না না। বাঁকাদা নিজেই আসতে চেয়েছিল।

মুকুটমণি ভাবতে ভাবতে বললেন, যাই হোক। বেচারাকে ওভাবে ফেলে চলে এলি তোরা!

মবুব হাসল। সে আপনি দেখুন। আমরা কী বলব?

মুকুটমণির আরও কিছু বলার ইচ্ছে ছিল, ওরা চলে গেল হঠাৎ। ডেকে একটা রিকশ থামিয়ে বললেন, জজকোর্ট।

জজকোর্টের দিকে যেতে যেতে মুকুটমণির অস্বস্তিটা বেড়ে গেল ক্রমশ। বাঁকা কি তাঁর বাড়ি ঢুকবে? বদন ঢুকতে দেবে না মনে হয়। তবে স্বধীনবালা কী করবেন বোঝা যায় না। আসার সময় বলে এলে ভাল হত।

এক যদি সুযোগ এবং খবর পেয়ে মুড্ডো থেকে হরি মণ্ডলের ছেলেরা লোক পাঠায়! যদি ওরা এসে বসিয়ে দেয় হারামজাদাকে!

আকাশকুসুম চিন্তা! মুড্ডোর লোক মাঠ পেরিয়ে কালুডহরির ঘাস পর্যন্ত ছুঁতে সাহস পায় না। এ ক্ষেত্রে একটাই শুধু ক্ষীণ আশা, কালুডহরির তিনপার্টির কোনো পার্টি মুড্ডোর পার্টিকে যদি ভরসা দেয়। কে দিতে পারে মুকুটমণি আঁক কষছিলেন। সারা মুড্ডো এক-পার্টি। এখন কালুডহরির যে পার্টি কমজোর, সে ওদের সাপোর্ট চাইতেই পারে। অতএব—

আবার নিরাশ হলেন মুকুটমণি। মুড্ডোর নেতা অবিনাশের সঙ্গে কালুডহরির কমজোর পার্টির নেতা আতিকুলের জমি নিয়ে

বিবাদ আছে।

আতিকুলের পার্টি এক সময় বাঁকাকে সমর্থন করে ফেলেছিল প্রায়। হঠাৎ টের পেয়ে সে সরে আসে। আসলে বাঁকা ছিল ভাড়াটে দুর্বৃত্ত। তার গ্যাং টাকাকড়ি ছাড়া কিছু বুঝত না। তবে কালুডহরির এক বিরল গুণ পুরনো ঐতিহ্য বজায় রেখে চলছে। পার্টির স্বার্থের চেয়ে গাঁয়ের স্বার্থ বড় করে দ্যাখে। গাঁয়ের সব ব্যাপারে তিনটিতেই একজোট্টা।

করুণ হাসি ফুটে উঠল মুকুটমণির মুখে। মহাধূর্ত ওই বাঁকা। সব খতিয়ে দেখেই কালুডহরিতে এসে ঢুকেছে। এ মাটিতে তার গায়ে বাইরের লোকের হাত পড়ার সম্ভাবনা নেই। এখানে পা দেওয়া মানে স্যাংচুয়ারিতে ঢোকা। তাছাড়া এখনকার লোক কেউ তার শত্রু নয়। কালুডহরির কারুর বিরুদ্ধে সে হাত ওঠায়নি কোনোদিন।

কোর্টের প্রাঙ্গণে হরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ···কী মটুক? গাঁয়ের খবর কেমন?

আমরা বরাবর ভাল থাকি দাদা।

বলো কী মটুক? হরেন্দ্র উকিল মুচকি হাসলেন। চোখ নাচিয়ে চাপা গলায় বললেন ফের, কীরকম ভাল আছ? ওই দ্যাখো, ভুটুবাবুকে দ্যাখো। ওকেই বলে ভাল থাকা। গাছেরও খাচ্ছেন, তলারও কুড়ুচ্ছেন। নেতা হও মটুক, নেতা হও। তবে না?

মুকুটমণির উকিল সৌম্যেন্দ্র এসে বললেন, ওরা সময় চেয়েছিল। আমি অবজেকশান দিইনি।

যা বাবা। হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে আসছি।

তাতে কী? মেয়ের জন্য বউদির জন্য কেনাকাটা করুন গিয়ে। নেক্সট হিয়ারিং বাইশে ডিসেম্বর।

সৌম্যেন্দ্র বয়সে নবীন। এরই মধ্যে নাম করেছেন। তার ওপর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সবখানেই সম্পর্ক ভাল। বাবাও ছিলেন জেলার দুঁদে উকিল। মুকুটমণি সবিনয়ে চাপা স্বরে বললেন, কিছু টাকাকড়ি দিয়ে যাই?

পরে হবে। বলে সৌম্যেন্দ্র ব্যস্তভাবে চলে গেলেন।

শেষ কার্তিকের আকাশ শুকনো দেখাচ্ছে। রোদের তাপ মিঠেকড়া। আজকাল আদালত এলাকায় সব সময় থকথকে ভিড়।

ভিড়গুলো গুচ্ছ গুচ্ছ। মুখগুলো আশা-নিরাশায় জ্বলছে-নিবছে যেন। অন্তত এইরকমই মনে হয় মুকুটমণির। ভুলে যান নিজেরও ওইরকম হয়।

সৌম্যেন্দ্রের ক্লার্ক কাদির আলি যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। মুহুরিবাবু বললে ছোকরা রাগ করে।···কী কাণ্ড! আপনার জন্য কখন থেকে ওয়েট করে-করে অস্থির!

দেখা হয়েছে সৌম্যেন্দ্রবাবুর সঙ্গে। এইমাত্র।

ডেট পড়েছে শুনেছেন তো? স্যার বিস্তর স্ট্রাগল করেও—

বুঝলেন কাদির আলি হাঁ করে আছে। কিছু খাবে। ভেবে-চিন্তে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিলেন মুকুটমণি। তখন ক্লার্ক হাসতে লাগল। ···আজ এক কাণ্ড জানেন? সেসান জজ ন'টায় বসে-ছিলেন। গুধে-কাঁকসার সেই খুনোখুনির মামলা। এক ব্যাটা সাক্ষী এনেছে। খালি বলে কী, বসিয়ে দিলে—বসিয়ে দিলে। জজ বললেন, বসিয়ে দিলেটা কী? আজকাল মাইরি কী হয়েছে ভেবে দেখুন মটুকদা! বসিয়ে দিলে!

অস্থির হেসে কাদির আলি হঠাৎ দৌড়ুল। এইভাবে সারাটা দিন কত পাঁচটাকা গেলার জন্য হাঁ করে বেড়াবে ছোকরা।

তবে আদালতে যতবার আসেন মুকুটমণি, ততবার মনে বৈরাগ্য আসে। মানুষের শেকড়ের দিকটা দাঁত বের করে আছে দেখে খারাপ লাগে। চিত্তে অশান্তি হয়। কারণ এখানে এসে না দাঁড়ালে শেকড়-বাকড় চোখে পড়ে না।

এই যে মটুকবাবু! রাধারঞ্জন এসে কাঁধে হাত রাখলেন। ··· ভাল জায়গায় নৌকা বেঁধেছ হে! তুমি মহাশয় ব্যক্তি।

কেন দাদা? আমার অপরাধ?

লম্বা মানুষ রাধারঞ্জনকে কালো গাউনে ভীষণ দেখায়। মুকুট-মণি বোঝেন নৌকো বাঁধার মানেটা কী। সৌম্যেন্দ্র এখন সবার লক্ষ্য। যে কেস হাতে নিচ্ছেন, ট্রাম্প করে বেরিয়ে আসছেন। তাই নানা গুজব।

রাধারঞ্জন বললেন, রোববার তোমার গাঁয়ে যাচ্ছি। থেকো।

যাব কোথায়?

না হে! তুমি বড় চালাক। সাপের গালে এক চুমো, ব্যাঙের গালে আরেক চুমো।

গ্রাহ্য না করে মুকুটমণি বললেন, আর কত মিটিং করবেন, দাদা? যত মিটিং করবেন, তত ল অ্যান্ড অর্ডার প্রাব্লেম বাড়বে।

রাধারঞ্জন মিঠে হাসলেন। ···শ্রেণীদ্বন্দ্ব আউটবাস্ট করেছে হে! সামলায় সাধ্যি কার? যতক্ষণ না—এদিকে ভুঁটু আর কুন্দুস শ্লোগান তুলেছে, পুলিসকে আমরা নাকি ইন-অ্যাকটিভ করে—বুঝলে না?

বুঝেছি, বুঝেছি। বলে মুকুটমণি সত্য সত্য বলে অস্তিত্বহীন একটা লোকের দিকে ছুটে গেলেন।

সত্যের জায়গায় পেয়ে গেলেন গুল্টেকে। খীরহাটার বিষ্টু সামন্তের বডিগার্ড। সামন্ত একটা বকুল গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কালো চশমা পরে পাইপ টানছে। গুল্টে একগাল হেসে বলল, মটুকদা! আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

গুল্টু, এস বাপ। চা খাই!

ধুস! আপনার খালি চা।

তবে সন্দেশ খা!

গুল্টে মিটিমিটি হেসে চোখে ঝিলিক তুলে বলল, সন্দেশে পার পাবেন না মটুকদা! এবার কালুডহরি জ্বলবে।

মুকুটমণি চমকালেন। তারপর নার্ভাস মুখে একটু হাসলেন। ···আমাদের শান্তি তোদের সহ্য হচ্ছে না, বাপ?

মবুব আর কেতোর সঙ্গে দেখা হল অমলদার বাড়িতে। শুনলাম।

অ। মুকুটমণি কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

বাঁকাকে আপনার চিনতে বাকি আছে, মটুকদা। কালুডহরিতে ঢুকেছে, মানে আবার—

না, না। বিষদাঁত তো তোরা ভেঙেই দিয়েছিস। এখন আর কী করবে? ভিক্ষেসিক্ষে করবে।

আপনার মাথা! শালা মহা অর্গনাইজার। ওর গ্যাং ছত্রভঙ্গকরে দিয়েছিলাম আমরা। মবুবের কথা শুনে মনে হল, কালুডহরিতে ঘাঁটি করে রি-অর্গানাইজ করতে চায়। গুল্টে মুকুটমণির হাত ধরে টানল। আসুন না, সামন্তদার সঙ্গে কথা বলবেন।

মুড়ুটমণি আড়ষ্ট পায়ে সামন্তের কাছে গেলেন। ···

গব্বর সিং! গব্বর সিং। তুমি এসেছ, গব্বর সিং?

ছুটতে ছুটতে কাণ্ডী এল ভেতর থেকে। তার মায়ের মতো থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল আরও কয়েক মুহূর্ত। তারপর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বাঁকা বলল, তুমি তেমনি আছ বাবুদিদি।

গব্বর সিং, কই দেখি তোমার পা কাটা গেছে নাকি?

বাঁকা লুঙ্গি একটু সরিয়ে কাটা-পা দেখাল।

তুমি হাঁটতে পারো?

না পারি তো তোমাকে দেখতে এলাম কী করে?

কাণ্ডী হাসল। ···যাঃ! বদন বলছিল তোমাকে বয়ে এনেছে। তারা চলে গেল কেন গব্বর সিং?

বাঁকা বুকপকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। ধোঁয়ার ভেতর বলল, বসো বাবুদিদি।

কাণ্ডী তার কাছের চেয়ারটাতে বসল। তারপর ফিক করে হেসে উঠল। ···আচ্ছা গব্বর সিং।

বলো বাবুদিদি।

এবার তুমি লোক বসাবে কী করে? পা নেই তো তোমার।

হাত। বাঁকা একটা তুলে দেখাল। বাবুদিদি, হাতই আসল। হাত দিয়েই লোক বসাতে হয়।

যাঃ। তুমি তো পালাতে পারবে না আর। তোমাকে তাড়া করে ধরে ফেলবে।

আমার কাছে পিস্তল আছে।

সেই পিস্তলটা তো? কই, দেখি দেখি।

বাঁকার মনে পড়ল, এ বাড়ির খিড়কির পেছনে কাঠমল্লিকা গাছটার তলায় কাণ্ডীকে পিস্তল দেখিয়েছিল। কাণ্ডী বিশ্বাস করেনি ওটা সত্যিকার পিস্তল। তখন পাঁচিলে বসা একটা কাক মারতে হল। আওয়াজ শুনে বাড়িসুদ্ধু আতঙ্কে অস্থির। হরি মোড়লের লোকেরা আচমকা এসে কী একটা বাধাল নাকি। মরা কাকটা দেখে কাণ্ডী খিট খিট করে হাসছিল। তখন বছর আষ্টেক-নয়েক বয়স হবে। দেখতে দেখতে চারটে বছর চলে গেল।

বাঁকা বলল, তোমার কোন কেলাস হল গো বাবুদিদি?

ক্লাস এইট।

ইস্কুল ?

এখন তো পুজোর ছুটি শেষ হয়নি। কালী পুজোর পর—তবে। তুমি পিস্তলটা দেখাও না গব্বর সিং।

দেখাব, দেখাব।

কিছু মারতে হবে।

মারব।

বলো তো কী মারবে ? না, না—কাক নয়। অন্য কিছু।

মানুষ ?

কাণ্ডী চোখ বড় করে তাকাল। তারপর ঘুরে বদনকে দেখে বলল, ঠিক আছে। তুমি বদনকে মারবে। বলেই সে হাসতে লাগল। তুমি বদনকে মারবে না, বসাবে।

বদন রাগ চেপে বলল,শস্তা। বাবার মতো হুকুম দিতে শিখেছ বটে। তারপর কী হবে ? পুলিস এসে ধরবে। ফাঁসি হবে।

কাণ্ডী বুড়ো আঙুল দেখাল। ···কিস্যু হবে না। বাবা বলে, আজকাল লোক বসালে কিস্যু হয় না। পুলিসও আসে না।

বাঁকা বলল, তাহলে তোকেই বসাই বদন।

প্রাক্তন আরাধ্য বীরের মুখে এই কথা শুনে বদন খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল। ভেতরের দরজায় উঁকি মারছিল একটি মেয়ে। বাড়ির ঝি। সেও মুখটিপে হাসছিল। বলল, বদনদা। গিন্নিমা বললেন, মাঠে যাবে কখন ? বসে থেকে না খাটালে মুনিষ কাজ করে ?

মাঠে ধানকাটা সবে শুরু হয়েছে। বাড়ির পেছনেই মাঠ। সারা মাঠ এখনও সবুজ। জায়গায়-জায়গায় কাছাকাছি জমি হলুদ হয়ে পেকেছে। সেগুলোর নাম লঘু ধান। কার্তিকেই পেকে যায়।

বদনের ইচ্ছে করছিল না মাঠে যেতে। এক সময় এই লোকটার আনাচে-কানাচে ছোঁক ছোঁক করে করে ঘুরছে সে। তাকে যদি পছন্দ করে দলে নেয় বীর। সে কি পারে না মানুষ মারতে ? এই মাহিন্দারি জীবন তার অসহ্য।

আজ বীর মানুষটার অবস্থা দেখে একটু গণ্ডগোলে পড়েছিল বদন। আবার পিস্তলের কথা শুনে মন তেতে গেছে। কিন্তু মাহিন্দারের কপাল করে জন্মেছে। বেরিয়ে যেতে হল।

বদন মাঠে যেতে যেতে ভাবছিল, রাত্তিরে যদি থাকে, একই ঘরে

শুতে আসবে সে। মানুষ মারার গল্প শুনবে। কিংবা পিস্তলটা —যদি পিস্তলটা…

কাণ্ডী বলল, গব্বর সিং। তুমি এবার কাকে বসাবে বলো না?

খুঁজছি বাবুদিদি। হাতড়ে মরছি। পাচ্ছিনা।

কই, এবারে পিস্তলটা দ্যাখাও।

বাঁকা জিভ কাটল। …ছিঃ। দেখলে চোখ নষ্ট হয় জানো না।

আমি তো দেখেছিলাম। নষ্ট হয়েছে?

হয়েছে বাবুদিদি। বুঝতে পারছ না—হয়েছে। ভেতর-ভেতর হয়েছে।

বাঁকা এক সময় বলত মুকুটমণিকে, বাবু, আপনার মেয়ে একজন হবে। একটু সামলে-সুমলে রাখবেন। মুকুটমণি হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন। মাঝে মাঝে বাঁকা অদ্ভুত-অদ্ভুত কথাবার্তা বলে বটে। তবে কাণ্ডীর ব্যাপারটা সে ঠিকই ধরেছে হয়তো। ভয় কাকে বলে ও মেয়ে জানে না। খড়ের গাদা থেকে গোখরো সাপ বেরিয়েছিল। ইট ছুঁড়ে মাজা ভেঙ্গে দিয়েছিল। শেষে মুকুটমণি বন্দুকের গুলিতে মাথা থেঁতো করেন। মাঝে মাঝে চলে যায় নদীর ওদিকে। জঙ্গল ভেঙে ঘোরে। একবার বাগদি মেয়েদের সঙ্গে বিলে চলেগিয়েছিল। খবর পেয়ে মুকুটমণি নিয়ে আসেন। ইদানীং একটু বুদ্ধি হয়েছে বছরখানেক যাবৎ। তত জংলাপনা আর দেখা যায় না। বড় হয়েছে, স্বাধীনবালাও আর দোষ পেলে গাছে বেঁধে মারধর করতে পারেন না। বদন আড়ালে বলেছিল বাঁকাকে, বাবুর মেয়ে বড় নেকি। ন্যাকামো দেখলো গা জ্বলে যায়। এদিকে বুদ্ধিতে পেকে লাল হয়েছে ভেতর-ভেতর।

স্বাধীনবালা স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। আবার এলেন। কী বাঁকা? কী বলছে তোমার বাবুদিদি?

বলছে গব্বর সিংয়ের পিস্তল দেখবে।

দেখবেই তো। বাবুরও খুব সাধ, মেয়েকে বন্দুক ছোঁড়া শেখাবে। আমি তালা আটকে আলমারিতে ভরে রেখেছি। কথা বলতে স্বাধীনবালার মুখে অহঙ্কার এবং উদ্বেগ যুগপৎ প্রতিবিম্বিত হল।

বাঁকা দরাজ গলায় বলল, শিখুক। শিখতে দোষ নেই মা জননী! কালের গতিক দেখছেন না?

হুঁ! ফুলন দেবী হবে।

কাণ্ডী চেঁচাল, স্মা! আবার!

বাঁকা বলল, সেটা কে গো মা জননী?

কে জানে বাপু! নাক বাঁকা করে বললেন স্বাধীনবালা। কাগজে বেরুত, পড়েছিলাম। সে নাকি ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতি করে বেড়াত। শেষে পুলিসের হাতে ধরা পড়ল।

আমি কখনও ডাকাতি করিনি মা! বাঁকা কাতর স্বরে বলল।

আহা, তোমাকে কে বলছে? কথা হচ্ছে ফুলন দেবীর। আয় কাণ্ডু। সকাল-সকাল চান করে খেয়ে নে। মমতাদের বাড়ি যাব। ভাগবতপাঠ হবে।

কাণ্ডী বলল, ভ্যাট। আমি গব্বর সিংয়ের কাছে থাকব।

কাণ্ডী। ঢিঙ্গিপনা করে না।

কাণ্ডীকে নড়ানো গেল না। চেয়ার আঁকড়ে ধরে রইল। বেশি টানাটানি করলে বাঁকার সামনে একটা খারাপ দৃশ্য হবে। অগত্যা স্বাধীনবালা দুপদাপ পা ফেলে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

কাণ্ডী বলল, তুমি কতদূর হাঁটতে পারো গব্বর সিং?

বেশি দূরে পারি না। পেরাকটিস হয়নি এখনও। বাঁকা উদাস ভঙ্গীতে বলল। হাসপাতাল থেকে ফিরে ডুবোদেশে ছিলাম। এমন ডাঙ্গা চটান কোথায় সেখানে? একটু যাবে, আবার খাল। খাল আর জঙ্গল। জঙ্গলে সাপ। একটু নড়ছে কী, ফোঁস করে চক্কর মেলে সামনে টহল মারবে। আর—

আর সবুজ রঙের সেই ডাইনিটা।

হ্যাঁ, সবুজ রঙের ডাইনিটা। তার চোখ দুটো লাল।

চুলগুলোও লাল। জিভটা লাল। ইস্‌। চোখ বুজে ফেলল কাণ্ডী। শিউরে ওঠার ভঙ্গীও করল।

তোমার সব মনে আছে, বাবুদিদি।

গব্বর সিং! কাণ্ডীর নাকের ফুটো ফুলে উঠেছিল। সে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ডাকল ফের, গব্বর সিং!

গোঁফে তা দিতে বাঁকা আনমনে বলল, উঁ?

কী ভাবছ? চলো, আমরা যাই।

কোথায় গো বাবুদিদি?

হাঁটা প্র্যাকটিস করবে। কাণ্ডী চেয়ার থেকে উঠল। কই, এস।

বারান্দার সিঁড়িতে নামার সময় বাঁকা হাত বাড়ালে সে নির্দ্বিধায় হাতটা ধরে তাকে নামতে সাহায্য করল।

রাগ করে একা মমতাদের বাড়ি চলে গেছেন স্বাধীনবালা। সব ঘরের দরজায় তালা এঁটে দিয়ে গেছেন। মুকুটমণির রুগণা মা বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে নজর রেখেছেন সর্বদিকে। ঝি সুদামসখী একটু তফাতে থামের গোড়ায় পা ছড়িয়ে বসে ভাত খাচ্ছে। বদন ডাকতে গিয়েছিল কাঞ্চীকে, বাঁকাকেও। নদীর ধারে বাঁধে ঝাঁকড়া বাঘনখা গাছের ছায়ায় দুটিতে বসে গল্প করছিল। কাঞ্চী বলেছিল, যাচ্ছি। জ্বালাতে এসো না তো তুমি।

বদন ফিরে এসে খিড়কির পুকুরে ডুবে এল। বারুঠাকুর বলল, খাবি। আবার দেখে আয়, আসছে না কেন?

আসবে। আমি ডেকে তো এসেছি বাবুদিদিকে।

তোর পেটে রাক্ষস আছে, ব্যাটাচ্ছেলে!

বুড়োগিন্নিও চিঁচিঁ করে কিছু বললেন। বোঝা গেল না। সুদামসখী বলল, গুণ্ডো লোকের সঙ্গে এত কী বাপু? যখন ছোট ছিল ছিল। এখন তো চোখ-মুখ হয়েছে। ও বদনদা!

বদন তার দিকে চোখ কটমটিয়ে বেরুল। চানের পর ক্ষিদে চনমনিয়ে উঠেছে। তাছাড়া তাকে আবার এক্ষুনি মাঠে দৌড়ুতে হবে।

সেই সময় মোটরবাইকের শব্দে প্রকৃতি ফাটাচেরা হতে থাকল। গেটের কাছে বদন গিয়ে দেখল, দু-দুটো মোটরবাইকে চারটে ছেলে এসেছে। বদনের চেনা-চেনা ঠেকছিল। সঠিক চিনতে পারল না। বলল, বাবু তো নেই। টাউনে গেছেন।

তাগড়াই ছেলেটি বলল, কী রে বদনা, কেমন আছিস?

বদন চিনল এবার। বীরহাটার গুল্টে ঘোষ। বদন বলল, ভাল আছি। আপনার ভাল তো?

গুল্টে বলল, তোর বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। খবর দিতে বলল, বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

আচ্ছা।

যাচ্ছিস কোথায়? শোন না ব্যাটা।

গলার স্বর শুনে ভড়কে গেল বদন। জবাব দিতে ঠোঁট ফাঁক

করল।

তার আগেই গুল্টে তার কাঁধে হাত রেখে চাপা স্বরে ফের বলল, বাঁকা এসেছে জানিস?

বদন হকচকিয়ে গেল আরও। বীরহাটার লোকেরা ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঠেকে নিয়ে গিয়ে বাঁকাকে বসিয়ে দিতে চেয়েছিল। সেই বীরহাটার গুল্টে ঘোষ এসে বাঁকার খবর জিগ্যেস করছে। ঢোক গিলে বদন বলল, আজ্ঞে, এসেছিল শুনেছি।

কথা বলতে বলতে এ গাঁয়েরই দুটো ছেলে এসে গেল সাইকেলে চেপে। গেঁদো আর ঝালা। ঝালা বলল, কোথ্থাও নেই। মটুকবাবুর বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিল নদের চাঁদের মা। অ্যাই বদনা। বল্ না রে?

বদন আবার ঢোক গিলল। গেঁদো হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ওই তো বারান্দায় ঝুড়ি আর বাঁশ।

বাহনগুলো রেখে সবাই ঢুকে গেল ভেতরে। বসার ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কিন্তু ভেতরে বাঁকা নেই। বদন বিব্রতভাবে বলল, এসেছিল। বেরিয়ে গেছে কোথায়। আমি তো মাঠে ছিলাম সকাল থেকে।

চুপ শালা! ঝালা ধমকাল। সে মেঝে থেকে সিগারেটের একটা টুকরো চপ্পলের ডগায় ঠেলে দিল। ...এই তো বাঁকা সিগারেট খেয়েছে। মটুকজ্যাঠা সিগারেট খায় না। অ্যাই শালা মিথ্যুক! এক ঝাঁপড়ে শালার—

গুল্টে বলল, বউদিকে ডাক বদন।

বদন বলল, বাবুগিন্নি নেই। পঞ্চাতবাবুদের বাড়ি ভাগবত শুনতে গেছে।

ঝালা আর গেঁদো বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। একজন ফ্যানের রেগুলেটার ঘুরিয়ে সুইচ টেপাটেপি করে বলল, খালি ভড়ং মাইরি। এক গ্লাস জল খাওয়াও তো দাদু।

বদন জল আনতে গিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।...

নদীর জল কিছুটা নিচে নেমে গেছে। ঢালু পাড়ে থকথকে

পাঁক। বদন বাঁকাকে তালডোঙ্গায় উঠতে সাহায্য করছিল। দু'জনেই পাঁক মেখে ভূত। পাড়ে দাঁড়িয়ে অবুঝ মেয়েটা খালি চেঁচায়, গব্বর সিং! গব্বর সিং! তুমি পালাচ্ছ কেন?

বদন নিচে থেকে দাঁত কিড়মিড় করে বলে, এই মেয়েটা—মেয়েটাই ফাঁসাবে দেখছি।

লগিটা উপড়ে বাঁকার হাতে দিয়ে ফের চাপা স্বরে বলে, কথা-বার্তাও হল না। দু'মুঠো খাওয়া-দাওয়াও। মনে বড় খেদ থেকে গেল বাঁকাদা গো! আর কি দেখা হবে? মাহিন্দারি করতে করতেই—

সে ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝাড়ে। বাঁকা তালডোঙ্গাটা লগি ঠেলে সোতে যায়। একটা হাত নাড়ে কাঞ্চীর দিকে। কার্তিকের শুকনো নীল শূন্য আকাশের পটে ফ্রকপরা মেয়েটাকে পরী মনে হয়।

গব্বর সিং! তোমার পিস্তলটা দেখিয়ে গেলে না?

ভাটির দিকে ভেসে যেতে যেতে বাঁকা দ্যাখে, পাড়ের জঙ্গল ভেঙ্গে মেয়েটা তাকে অনুসরণ করছে। বাঁকা চেঁচিয়ে বলে, বাড়ি যাও, বাবুদিদি। বদন হে, বদন। বাবুদিদিকে ধরে নিয়ে যাও।

বদন গিয়ে পাঁকমাখা হাতে ধরে তাকে। কাঞ্চী ছটফট করে। বদন বলে, চুপ দিদি, চুপ। দোহাই তোমার। ওরা জানতে পারবে। বাড়ি এস দিকিনি আমার সঙ্গে।

বাঁকের মুখে কালো তালডোঙ্গাটা মুছে গেলে দু'জনে হঠাৎ দুটি পাথরের মূর্তি হয়ে যায়।…

ডালিম গাছের জিনটি

একটা আমবাগান ছিল। ছায়া ছিল। পিটুলির জঙ্গল ছিল আর বাঁশের মাচানের ওপর টাপর চাপিয়ে টঙ ছিল। রাতে লণ্ঠন জ্বলত। জাগাল আমরু শুকনো পাতায় খুড়ুস শব্দ শুনেই বাঘের হাঁক দিত। আর বিশেষ কথা, এদিক-সেদিক জঙ্গলে প্রকৃত বাঘই ছিল। তবে সে অনেক পুরনো দিনের ঘটনা।

এখন সেটাই চন্দ্র সিং দুগারের একুশ বিঘে গমক্ষেত। ফাল্গুনের রোদে প্রসারিত সুবর্ণচিত্র। ভাগীরথীর নিচু ও শাদা মাটির বাঁধে দাঁড়ালে দৃষ্টি জ্বালাপোড়া হয়। আমরুর বংশধর নাসিরের শরীরে অতীতের প্রকৃত কোনও বাঘের আত্মা আছে। দুগারজি বুঝতে পেরেছিলেন, কেননা তিনি জন্মান্তরবাদী। 'নাসির, তু জাগাল হ।' বলায় সে এককথায় রাজি। কিন্তু পূর্বপুরুষের মতো সে মাথায় গামছার পাগড়ি বাঁধেনি। হাতে লাঠি কী বল্লম নেয়নি। তার ছ'ঘরা পিস্তল আছে। আর এই পিস্তলটির কথা দুগারজি জানতেন। 'গাঁতিক দেখলে লাস ফেলবি, ডরাস নে বাপ! আমি আছি।' দুগারজি বলেছিলেন। গমের রঙ বদলানোর মুখে সত্যিই একটা লাস পড়েছিল। দুগারজি ছিলেন। বলার মতো কিছু ঘটেনি। যার লাস, সে, জেরাত মির্জা অনেক কিছু দাবি করত। যেমন, সে কেল্লাবাড়িতে থাকে, তাই নবাববংশীয়। তার ঠাকুর্দা ইসমাইল মির্জা কোচোয়ানি করলেও বছরে একটা রুপোর তঙ্কা ও কালেক্টর বাহাদুরের সেলাম পেত। সেই আমবাগানের এক শরিক ছিল সেও। শেষে গাছগুলান কাটা পড়ল। যুদ্ধের বছর সরকারের কাঠের দরকার পড়েছিল, শোনা কথা। তারপর কীভাবে একুশ বিঘেটা ভেস্টেড হয়ে যায় এবং সেও অনেক কথা যে, শেষে ভেস্টেড জমি দুগারজির হাতে চলে আসে। তিনি বিরাট কূট-কৌশলী পুরুষ।

ফাল্গুনে একুশ বিঘে পাকা গমের সময় ভোট। ভোটের মুখে জেরাত মির্জাকে কবর থেকে টেনে বের করার অবস্থা। দুগারজি

নির্দল প্রার্থী। পেছনে রাজনৈতিক সমর্থন আছে। জেরাত মির্জার মেয়ে দিলবাহারকে জিপে চাপিয়ে ঘোরানো হচ্ছে এবং সেই মেয়ে প্রাইমারি পাশ, চেরা গলায় ভাষণ দিচ্ছে, বিচার চাইছে জনগণের কাছে। দুগারজি বললেন, 'নাসির, ই কী বাপ, তুআছিস না কী?'

নাসির বলল, 'মেয়েমানুষ। ছেড়ে দেন।'

'ছাড়া কঠিন।' দুগারজি বললেন। 'তোর নামও উঠছে। শেষে—ইদিকে ভোট, হাওয়া ঘুরছে।'

'আগে ই কথাটোর জবাব দেন।'

'বল।'

'জাগালি মাঠের কাজ। মাঠ করব, না ভোট করব?'

'দুই-ই।'

নাসির হেসে ফেলল।' আপনাকে মশাই বুঝা কঠিন। ভোট, না মাঠ, ভেবে পাই না।'

ফরাক্কা ফিডার ক্যানেল বারো মাস ভাগীরথীকে পূর্ণগর্ভা করেছে। ধনুকবাঁকের মাঝামাঝি একটা গাবগাছ, যার তলায় জেরাত মির্জার লাস পড়ে ছিল। মাথার জায়গায় দুগারজির এক-জোড়া পামসুর চাপ। তবে মাটিটা খটখটে, জমানো দুধ মনে হয়। রক্ত কয়েকটিবর্ষা ধুয়ে দিয়েগেছে। একুশবিঘে সুবর্ণচিত্রে পিঁপড়ের শ্রেণী হয়ে বাংলাদেশী মুনিসরা গম কাটছে। ক্ষেত খালি হলেই পাওয়ারটিলার নামবে। এককোনায় ছোট্ট হলুদ পাকাঘর। তার ভেতর পাম্পসেট বসানো। জল জিনিসটার অভাব নেই এ মাটিতে। দুগারজি ক্ষেত দেখছিলেন। ভোট, না মাঠ? নাসির মাঝে মাঝে এভাবে তাঁকে বাস্তবতা দর্শন করায়। একটু পরে তিনিও হাসলেন। 'ভোট, না মাঠ, বললি।'

'তাই তো বললাম মনে হয়।'

'জিতব না। মিনিস্টারও হব না।' দুগায়জি স্বীকার করলেন। 'কিন্তু ভোটে না গেলে মাঠ বাঁচানো কঠিন হয়, বাপ।'

'ক্যানে কঠিন হয়?'

দুগারজি তাকালেন তার দিকে। বাঘের আত্মা আছে এই জোয়ানের মধ্যে। জাত-ঘাতক। জীবন্মৃত্যুর পার্থক্য নিমেষে একাকার করতে পটু। কপালে, দুই ভুরুর মধ্যিখানে স্থায়ী লম্বাটে নীল তিলক, যার স্থানীয় নাম 'রাখাল-ফোঁটা।' সে অতীতে এক-

রাখাল ছিল। ন্যাকড়ায় ঘুটিঙ বেঁধে থুথু দিয়ে তার স্মৃতি। নাসিরকে রূপবান করেছে ওই চিহ্ন, তাতে ভুল নেই। তায় গোঁফ, ঝাঁকড়া চুল,ব্রোঞ্জ-নির্মিত শরীর, তার মুখের হাসিতে ঐতিহাসিক ফৌজদারেদের লক্ষণ আছে, এবং মধ্যযুগে ইচ্ছে করলে এরাই নবাব-বাদশাহ হতে পারত। কেল্লাবাড়ি থেকে কাটরা কলোনি পর্যন্ত ঘরে-ঘরে তার সাগরেদ। তাদের কেউ-কেউ ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়াও জানে। এই নিরক্ষর জোয়ান ঘাতকের নেতৃত্ব করার ক্ষমতা আছে। দুগারজি তার সামনাসামনি এলে এই সব কথা ভেবে গর্বিত হন। যেহেতু তিনি বাঘ পুষেছেন। আবার ভয়ও করে। যেহেতু বাঘ মানুষখেকো হলে একটা বিপজ্জনক অনিশ্চয়তার মধ্যে চলাফেরা করতে হয়।

ভাবনাচিন্তা করে চন্দ্র সিং দুগার বললেন, 'হরেনমাস্টার ই ভোটে রাণীকে গিলবে বলে রাণীদির ডর, তু জানিস।'

'হুঁ, সব্বাই জানে।'

'তো রাণীদি বললে তুমি দাঁড়াও, একগাল খাও।' দুগারজি কষ্ট করে হেসে বললেন, 'ওই যেমন ভৈরব লধি যেতে যেতে এক-গাল করে খায়—যদ্দুর যায়। ভোগরথপুরের কাছে অবস্থা দেখেছিস ?'

নাসির বুঝতে পেরে বলল, 'এখুন রাজনীতি বৈক্তিগত।'

'ব্যক্তিগত।' দুগারজির অবাক হবার কিছু নেই। নাসির আধুনিক শব্দ বা টার্মগুলান বোঝে। 'রাজনীতি ব্যক্তিগত, খুব ভাল বলেছিস বাপ। রাণীদি জিতলে মিনিস্টার হবে। হরেনমাস্টার জিতলে এম এল এ'ই থেকে যাবে। উয়ারা সরকার করতে পারবে না, ইটা সারা দ্যাশ জানে। কথা কী, ওই হন্না বলেছিল, দুগারজি তুমি ভেস্টেড ল্যাণ্ড আবাদ করেছিলে। হে, তুমার বড় সাহস দেখি। ইয়ার বেশি আর কী বলি তোকে ?'

'দুগারজি, মেয়েমানুষের গায়ে ই নাসির হাত তুলে না।'

'মেয়েমানুষ। আমার বাবার বসানো ইস্কুলে—' দুগারজি চটে যাওয়ার ভান করলেন, 'ওই হন্নাও আমার বাবার বসানো ইস্কুলে পড়াতে পড়াতে এম এ পাশ দিলে, বি টি পাশ দিলে—শেষে, উঃ। শালা এই দুনিয়া ! তবে তোকে মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলতে কি বলেছি ?'

নাসির হাসতে লাগল। 'কথাটো কী?'

'মির্জার বেটিকে বিয়া কর বাপ।' সিঁড়িঙ্গে চেহারার দুগারজি শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে থুথু ফেললেন। 'হাজারদুয়োরির ধাপ দেখেছিস? উই দ্যাখ—' দূরে কেল্লাবাড়ির ওদিকে নবাববাহাদুর হুমায়ুন খাঁর ১৮২০-তে তৈরি সৌধটি তর্জনীতে নির্দেশ করে বললেন, 'ধাপে ধাপে চড়তে হয়। ভোটের আর দিন পনের দেরি। তু ধাপে পা দে বাপ! পনের দিন—তু সব পারিস।'

নাসির হাসি বন্ধ করে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে শাদা মাটি ঘষছিল। শ্বাসের সঙ্গে বলল, 'আমি উয়ার বাপকে মেরেছি।'

'উয়াকে বুঝা, তু লয়—অন্য কে সিটাই ফার্স্ট ধাপ।'

'মির্জারা শিয়া।'

দুগারজি খ্যা খ্যা করে হাসলেন একথায়। 'আজকাল আর শিয়া-সুন্নি। মোতি মির্জার বেটি শাহাদত দর্জির বেটার ঘরে উঠেনি? শাহাদত শিয়া? আর উই বেটির মা? কী যে বলিস তু!'

একটু পরে নাসির বলল, 'পনের দিন!'

'তোর এক দিনেই একশো, বাপ। তোর সব বড় দিন। খেলা দেখা। দেখি।'...

বরাবর ভোটের মুখে এইভাবে পুরনো কথা ফাঁস হয়। কবর থেকে অনেক লাস বেরিয়ে আসে। যার সৌধে ধাপে ধাপে ওঠার চক্রান্ত, সে, দিলবাহার, সতের বছর বয়স, ভোটের মুখে অনেক পুরনো কথা জানতে পেরেছিল। তাকে ভাগীরথীর ওপারে একুশ বিঘে সবর্ণচিত্রটি দেখিয়ে বলা হয়েছি, ওইখানে এক আমবাগান ছিল। দু আনার মালিকানা ছিল তাদের। বুড়ো আমরুর কথাও তাকে বলা হয়েছিল। সেই সূত্রে নাসিরের কথাও। নাসির জলঙ্গির বর্ডার থেকে তেত্রিশশো টাকায় যে পিস্তলটি কিনে এনেছিল, তাও সবিস্তারে। জেরাত মির্জার বুক ঝাঁঝরা-করে-দেওয়া পিস্তলটি দেখতে ইচ্ছে হত মেয়ের। তার সৎ ভাই জাহাঙ্গির নিজের মাকে নিয়ে সে বছরই কলকাতা চলে যায়। জাহাঙ্গির ট্রেনে পকেট মারত। কলকাতায় এই কাজটার সুবিধে নাকি বেশি। দিলবাহার বেগম কলকাতা দ্যাখেনি। দক্ষিণে বহরমপুর, উত্তরে জঙ্গিপুর তার নগরদর্শন। হরেনমাস্টার বলেছিলেন, 'তুই খান্দান বংশের বেটি মা। কথাটা মনে রাখবি।' কেন একথা, ভোটের মুখে এসে

বোঝা যায়।

মির্জা জেরাত আলি ছিলেম দর্জি। কাটরা কলোনির ঢেরে হাড়-পাঁজর বের-হওয়া তিনশো বছরের পোড়ো শিয়া মসজিদের উঁচু চত্বর সাফ করে একা ঈশ্বরকে ডাকতে যেতেন। দিনেরাতে নিয়মমতো পাঁচবার। তিনি পুরো বাঙালী বনে গিয়েছিলেন। দিলবাহারের মায়ের কারণে। গুলবাহার বেগম ছিলেন বাঙালী বধূ। যৌবনের শেষে পেঁছেও প্রেম এমনি আসে না, ঠেলায় পড়লে আসে। বেগমের বাপ ছিলেন উকিল। বেগম ছিলেন এক-পায়ে ল্যাংড়া মেয়ে, কালো রঙ, কোঁকড়া চুল, পুরু ঠোঁট। উকিল-সাহেব বলেছিলেন, 'একুশ বিঘে ভেস্টেড করুক, আমি আছি। আইন আছে।' এই হল বিয়ের শর্ত। আইন করে দু আনা শরিকানার তিনবিঘে হাতে এনে দিয়ে আইনজীবী চমৎকার একটি স্ট্রোকে শেষ শ্বাস ছাড়েন।

দিলবাহার মায়ের চুল পেয়েছে, ঠোঁট পেয়েছে, নাকের কিয়দংশও। বাপের পেয়েছে গায়ের রঙ, সাহস, তেজ, অহঙ্কার। খান্দানি অহঙ্কার ঠাকুর্দা কোচোয়ানি করলেও কালেক্টর বাহাদুরের বৎসরান্তে সেলাম পেতেন। এটা কম নয় জীবনে। বিশেষ সেই দিনে যে আচকান, তাজ, নাগরা, মখমলের কোমরবন্ধ পরে যেতেন ইসমাইল, সিন্দুকে এখনও রাখা আছে। গুলবাহার উর্দুভাষিণী সতীনের সঙ্গে কাজিয়া করতেন, কে শীতের রোদে ওই খান্দানি গৌরব শুকোতে দেবে! সতীন হেঁপো মেয়ে। কুঁদুলি। হাঁপানি ওঠার ভয়ে শেষদিকে কুঁদুল ছেড়ে নেহাত ঝাঁটা দেখানো শুরু হয়। দড়ির খাটিয়ায় বসে, পেছনে পুষ্পবতী ডালিম গাছ, ঝাঁটা দেখাতেন। দিলবাহার, জাহাঙ্গির হেসে অস্থির হত। কতটুকু ছেলে ছিল জাহাঙ্গির। আপেল-টুকটুক গায়ের রঙ। নিজেকে দেখিয়ে বলত, 'ম্যায় জিন হুঁ রি, সফেদ জিন।'

এসব পুরনো কথাও ভোটের মুখে এসে পড়ে, যেন আসতে বাধ্য। পুষ্পবতী ডালিম ফাল্গুনে ফলবতী হয়েছে। ওই গাছে সেই সফেদ জিন অর্থাৎ শাদা অলৌকিক মনুষ্যবৎ প্রাণীটি বাস করে। পবিত্র শাস্ত্রে ঈশ্বর ঘোষণা করেছেন, 'আমি মানুষ ও জিন পয়দা করেছি।' জিনদের দেশ আকাশের তৃতীয় স্তরে, বৈজ্ঞানিক টার্মে বলা চলে, থার্ড গ্যালাক্সিতে। সুতরাং মির্জাবাড়ির ডালিম-

গাছের জিনটি নির্বাসিত, অথবা পলাতক কোনও আসামী। জাহাঙ্গিরের মা বলতেন, 'মালুম, ভাগকে আয়া।'

জাহাঙ্গির বলত, 'হেঁয়া কাহে রি আম্মি?'

'আনার উনকি খানা, ইস লিয়ে।'

ডালিম মহাজাগতিক দ্বিপদ প্রাণীটির খাদ্য? আর কিছু খায় না? পৃথিবীতে কত কিছু খাদ্য আছে। জেরাত মির্জা বলতেন, 'যদি আমার বরাতে কিছু ঘটে যায় বেটি, যাবে। কিন্তু কখনও আনার বেচে খাবিনে। ওই ফল আমরা বেচি না। খাই না।'

ডালিমগুলোন যত উজ্জ্বল দেখাক, কেমন একটু টক তিতকুটে স্বাদ—দিলবাহার গোপনে জেনেছিল। ডালিমগাছটি পুষ্পবতী হয়। ফলবতী হয়। নিঃস্ব ভিখারিণী হয়। উদ্দেশ্যহীন এই ধারাবাহিক ঘটনার সঙ্গে অলৌকিক নির্বাসিত প্রাণীটিকে কেন জড়ানো হয়েছে, দিনে দিনে আরও বুঝেছিল সে। জিনটি না থাকলে গাছটির সম্পর্ক পৃথিবীতে কিছুই থাকে না হয়তো। এইভাবেই সকল বৃক্ষলতা, ফুলফলকে উদ্দেশ্যপূর্ণ করা হয়। কিন্তু তারপর একটি আকস্মিকতা দিলবাহারকে ভীষণ জোরে ধাক্কা দেয়। জেরাত মির্জা যেদিন লাস হন, জিনটিকে সকাতরে ডেকেও সাড়া পাননি। জিনেরা কি মানুষের ভাষা বোঝে না? কেন এতকাল এই ক্ষয়াটে জীর্ণ দালানবাড়ির মানুষজনের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, সেটা কোনপক্ষের দোষ, অথবা ও মানুষকে নিকৃষ্ট গণ্য করে? ঘৃণা করে? একটা চিন্তার বিষয়।

রাণী রায় বলেছিলেন, 'তোমার বাবার কথা অ্যাসেম্বলিতে তুলব। থানার দারোগা দুগারজির ঘুস খেয়েছে। ট্রান্সফার হয়ে গেল।' দারোগারা আসেন, চলে যান। সবই গতিশীল। পৃথিবীই তো একটা প্রবাহের অধীন। জে এল আর ও সায়েব কর্তৃক ভেস্টেড ল্যান্ড ঘোষিত হবার আগেই নাকি একুশ বিঘে মির্জা-গোষ্ঠীর কাছে কিনেছিলেন চন্দ্র সিং দুগার। জেরাত আলিরও সই আছে দলিলে। উকিল নানাজি 'ডিসট্রেস সেল' প্রমাণ করে তিন বিঘে উদ্ধার করেন। তার গৌরব রাণী রায় 'ভূমিসংস্কার' নামে আত্মসাৎ করেন। সব বেরিয়ে আসছে ভোটের মুখে। জিনেরা কেন ঘৃণা করবে না মানুষকে?

আজ ভাদুড়িয়াহাটে মিটিং ছিল। আগের রাতের সামান্য

বৃষ্টিতে মাটি নরম। মঞ্চ থেকে নেমে এসে আঁচলে ঘাম মোছার সময় একটি ঠোঁট রোগা, তীক্ষ্ন চেহারা, চোখে নিকেলের ফ্রেমে চশমা, জিনসপরা বলল, 'নমস্কার! আরও কিছু জানতে চাই, বলুন।'

'সবই তো বললাম। আপনি কে?'

'আমি দৈনিক সত্যসেবক থেকে আসছি। ইলেকশান সার্ভেতে—'

'গিয়ে তো উল্টোপাল্টা লিখবেন।'

'আপনি মুসলিম মহিলা—'

'কলকাতার লোকেরা কিছু বোঝে না'

'বুঝিয়ে দিন।'

'মুসলিম বললেন। মহিলা বললেন। আপনি বুঝবেন না।'

'একমিনিট। হরেন সরকার—আপনাদের ক্যান্ডিডেট, কোন দলের সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন?'

'ওই তো পোস্টার, ব্যানার। দেখে নিন।'

'বিপ্লবী ফ্রন্ট ব্যাপারটা বুঝলাম না। আপনারা কি নকশাল গ্রুপ?'

সতীশ, ফয়েজ, বারীন কর্মকাররা এসে ব্যূহ গড়ল। বারীন বলল, 'দিলু, কাগজের লোকের লগে কী কথা? আপনে যান তো মশয়! দিলু, চা।'

রিপোর্টারটি চিনে জোঁক। 'আপনি অসাধারণ বলেন।' সে স্তুতি করতে থাকল! 'নেতৃত্বের পোটেন্সিয়ালিটি—এই বয়সে আপনি—ওয়াণ্ডারফুল! আপনার রাজনৈতিক—'

দিলবাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'আমার রাজনীতি ব্যক্তিগত।'

বারীন দ্রুত বলল, 'দিলু আর রাজনীতি ব্যক্তিগত না। উল্টোপাল্টা কইও না বোনটি।'

রিপোর্টার বলল, 'একুশবিঘে ব্যাপারটা—'

ফয়েজ বলল, 'জমির লড়াই। সে ব্রিফিং-এ ব্যস্ত হল। রিপোর্টার নোট করতে থাকল। বাহার চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে জনগণের প্রশংসা শুনছিল তখন। ভাবছিল, ভোটের মুখেই কি এত কথা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে?

অথবা ডালিমগাছের জিনটি এভাবেই তার মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে ? বাপের সেলাই মেশিনে বসে যেসব কথা ভাবতে ভাবতে অসতর্ক আঙুল রক্তাক্ত হয়েছিল, এতদিনে সেই সব কথা, অবুঝ আর অসংবদ্ধ চিন্তা, একুশ বিঘের মতো শ্রেণীবদ্ধ সুবর্ণ-শস্য হয়ে সংবদ্ধতায় প্রসারিত হল কি ? আসমানি রঙ শাড়ির ভেতর বজ্রবিদ্যুতের ঝলকানি ক্রমশ থেকে যেতে যেতে একটা প্রচণ্ড ক্লান্তি এতক্ষণে তাকে চেপে ধরল।...

বাড়ির চারদিকে অগোছাল জঙ্গল, ধ্বংসস্তূপ। ঘেঁটুফুল, আকন্দফুল, শিমুলফুল, পলাশফুল, মাদারফুল, উঁচু-নিচু ব্যাপকতায় সমুজ্জ্বল। ভোটের সঙ্গে এদেরও কী এক গোপন যোগসূত্র। সেলিম মির্জার আমবাগানে সন্ধ্যার মুখে কোকিলটা চুপ করে গেল হঠাৎ। দুঘর একতলা বাড়ির গায়ে গাছের নখ। কার্নিশে গাছের পা। ছাদে ফাটল। বিপ্লবী ফ্রন্ট পাশের দর্জি-খানা চুনকাম করে নির্বাচন অফিস বসিয়েছে। এদিন সকাল থেকে চারটে মিটিং, গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘোরা, কর্মীরা ক্লান্ত। এরাতে ছুটি। রিক্সাওয়ালা নিজামের মা তারাবুড়ি দিলবাহারের রাতের সেন্ট্রি তিন বছর ধরে। বুড়ির কান জাগাল আমরুর চেয়ে খর। তবে এ বুড়ি খান্দানি বংশজাত কন্যা। উর্দু-বাংলা সমান বলে। মাটির ফরসিতে তামাক টানে। নিজাম আজ মুর্গি জবাই করেছিল। খানিকটা দিয়ে গেছে। সে মুর্গি জবাই করলে এটা নিশ্চিত, বাংলাদেশী সওয়ার এসেছে বহুদূর থেকে, যার পাস-পোর্ট-ভিসা থাকে না। নিজাম কী ভাবে তাদের টের পায় আশ্চর্য ! তারাবুড়ি দিলবাহারকে খাইয়ে নিজে খেয়ে সব সামলে-সুমলে ফরসিতে টান দিয়েই হাঁকল, 'কৌন হো জি ?'

সাড়া এল না। দিলু বলল, 'কেউ না !'

'নেহিরি !' বুড়ি ফের হাঁকল, 'ফৈজু আছিস ? নক্কর করছিস কাহে বেটা ? আ যা।'

উঠোনঘেরা পাঁচিল ধসে আছে। রাঙাচিতের বেড়া। সেখানে টর্চ জ্বলল। তখন দিলু বলল, 'কে ?'

'আমি।'

আকাশে চাঁদ আছে ! টর্চের আলো তাই রাগিয়ে দেয়। দিলু বলল, 'কে রে আমি ?'

'দিলু, আমি নাসির আলি।'

বুক ধড়াস করে উঠে ডালিমগাছটির দিকে একবার তাকাল দিলু। সানুনয় দৃষ্টিপাত। তারপর শ্বাসের সঙ্গে বলল, 'কী?'

নাসির হাসল। 'আমি বাঘ নই, মানুষ।'

'বলো।'

'বুলব বলেই এলাম! আগড় না খুললে কী বুলব?'

'কিছু বলার-থাকলে দিনে এস।'

'আমি মাঠের লোক, দিলু। দিনরাত সমান!' নাসির আগড়ের ওপার থেকে বলল। 'তবে কথাটো ভোটেরও বটে, লয়ও বটে।'

তারাবিবি ফরাসি টানতে ভুলে গেছে। মাটির ঢিবির মতো স্থির। হেরিকেনের দম তুলতেও সাহস হারিয়েছে। দিলু শক্ত হয়ে গেল। বলল, 'শাসাতে এসেছ দুগারজির হয়ে?'

'না। তুমি ভোটে খাটছ মাস্টেরের হয়ে। খাটো। আমার বাধা লাই। আমার কথাটো হল, তুমার বাপ জিকে আমি মারিনি।'

'অ্যাদ্দিন পরে এসব কী কথা? মতলব কী তোমার?'

'আমার ওপর-পুরুষ তুমাদের বাগানের জাগাল ছিল। আমি জাগালবংশ। দুগারবাবুর জাগাল হয়েছি। শুধু এইটুকুনই কথা। কিন্তুক তুমার বাপকে আমি মারিনি।'

'তুমি মাতলামি করতে এসেছ। চলে যাও।'

নাসির হাসল। 'একটুকুন খেয়েছি। না খেলে আসা যেত না তুমার ছামুতে। দিলু, তুমি মোসলমান, আমি মোসলমান! এই সম্পক্ক ঠিক কিনা? আর ওই শালো দুগারবাবু ভিনজাত কিনা? তুমার হুকুম লিতে এলাম।'

'কী হুকুম?'

'শালোকে বসাই, হুকুম দাও।'

'চেঁচিয়ে জড়ো করব! চলে যাও তুমি।'

'শুধু তুমার মুখের একটো কথা, দিলু। হুকুম দাও।'

'চলে যাও!'

দিলু বারান্দায় উঠে এসে হেরিকেনের দম তুলল। শরীর কাঁপছিল। দেখল, নাসির চাঁদের আলোয় আগড়ের ওধারে দাঁড়িয়ে

আছে। আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে টর্চের আলো অকারণ ফেলতে ফেলতে চলে গেল। এতক্ষণে তারাবুড়ি চাপাস্বরে বলতে থাকল, 'কমিন! কমজাত! শয়তানকা বাচ্চা। মাস্টেরকে বলিস, মু তোড় দেগা হারামিবাচ্চার।...'

একুশ বিঘের ঈশানকোণে ভাগীরথীর নিচু বাঁধে গাবতলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে চন্দ্র সিং দুগার হেসে অস্থির! 'তু বললি আমাকে বসাবি?'

নাসির হাসছিল না। বলল, 'না বুলে উপায় কী? আমার মুখে ই কথা ছাড়া আর কী মানাত?'

'ধাপে পা রাখতে পারলি না বাপ! পা ফস্কে গেল। তবে এখনও চোদ্দ দিন বাকি।'

'বলেন তো বোম মেরে রিকশোসুদ্ধু উড়িয়ে দিই ছুঁড়িকে।'

দুগারজি শিউরে উঠে তিড়িং-বিড়িং নেচে বলেন, না, না। মুখে আনিস না বাপ! আমার তিনপুরুষের কীর্তি উড়ে যাবে। পাবলিক খেপে যাবে। হিতে বিপরীত। আবার যা।'

'যেতে ডর কিসের? ই নাসির আলি সব জায়গায় যেতে পারে। তবে কঠিন মেয়েমানুষ।'

একটু ভেবে দুগারজি বললেন, 'তুলে লিয়ে যেয়ে বিহা করতে বলতাম। রাণীদির সঙ্গে সে-কথাও হল। কিন্তু বুঝলি তো? তু আমার লোক, সবাই জানে। আমি পাবলিক ওয়ার্ক করি। রিস্ক্ আছে। তুই আবার যা। ওরে বাপ, পিরিতি বড় দড় জিনিস। আঠার মতন। ছুঁলেই ছুঁড়ি আটকে যাবে—আমার মন বলছে ইকথা।'

নাসিরের পরনে আজ জিনস, ছাইরঙা শার্ট, জলঙ্গি বর্ডারে হস্তগত। দুগারজির দেওয়া মহার্ঘ সিগারেটটি ঠোঁটে রেখে বলল, 'জবালুন।' দুগারজি হাওয়া বাঁচিয়ে ধরিয়ে দিলে সে ধোঁয়ার রিং বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা করার পর বলল, 'কালু হাজির পামসেট চুরি হয়েছে। বুলছিল, নাসির, তু তামাম মাঠের পাম-সেটের জিম্মা লে। আমরা পেত্যেকে বছরে পাঁচশো করে দিব। বছরে উপরি পাবি হাজার পাঁচেকের কম লয়। আমি মাঠের লোক, দুগারজি। কী করি, বলুন?'

'আমার আপত্তি কী? তোর যদি উপরি হয়, লে। কিন্তু ই কাজটো তোকে করতেই হবে।'

'পেরাইমারি পাস। আমি নাম সই করতে পারি না।'

'ধুর ছোঁড়া। তু সিনেমার হিরো।' দুগারজি বেজায় হাসতে থাকলেন। 'ধনু উকিলের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছিলি তু। তোকে মোছলমান বলে গণ্য করেছিল? ইস্কুল ফাইনাল পাস মেয়ে। তারপর—'

থামিয়ে নাসির বলল, 'ই টাউনে সব পারি। কেল্লাবাড়ির কাউকে পারি না। উয়াদের লোহু অন্যরকম।'

'লবাবী লোহু'! নিমেষে মুখ বেঁকে গেল চন্দ্র সিং দুগারের। 'নবাবদের বান্দাবাঁদির বংশও বলে লবাবী লোহু! শালা! জেরাত মির্জার ওপর-পুরুষ ছিল সইস। ছাড় বাপ! লেগে যা আঠা লিয়ে।'

'দিলুর মুখ বন্ধ করা তো? নাকি 'আরও কিছু?'

একটু পরে দুগারজি মুখ খুললেন। 'আরও কিছু। ঠিক ধরেছিস বাপ! রাণী রায় জিতলে মিনিস্টার হবে। ঠিক। ই একুশ বিঘে সেইফ হবে। ঠিক। কিন্তু হন্না ছাড়বে না। মির্জার বেটি উয়ার ইসু্য। মানে, তিন বিঘের ঝান্ডা পুঁততে আসবে।'

'আমি আছি।'

'তোড় এলে ভেসে যাবি, বাপ! তোর পিস্তলে মোটে ছটা গুলি।'

'রাণীদিদি মিনিস্টার হবে বুলছেন। আবার বুলছেন ঝান্ডা, তোড়—বুঝি না।'

'ওরে বোকা ছেলে! পাবলিককে জাগিয়ে দিচ্ছে। তোড় একটি আসবে। মেয়েমানুষ অমন করে বিচার চাইছে পাবলিকের কাছে। রিপোর্ট খারাপ, বাপ!'

আসলে দুগারজি বোঝাতে চাইছিলেন যা, তা হল কলকাতার রিপোর্টারটির ভাষায় নেতৃত্বের পোটেন্সিয়ালিটির কথা। মির্জার মেয়ের মধ্যে রাণী রায়ের আদলের আঁকুর। একটা নতুন ফোর্স জাগছে সতের বছরের এক তরুণীর মধ্যে। রাণী রায়েও সেই চিন্তা। অদূরে তাঁর এক প্রতিদ্বন্দ্বী। আর 'আজকাল এডুকেশন রাজনীতিতে কোনও ফ্যাক্টরই নয়।'

একথা রাণী রায়ের।

নাসির কতকটা বুঝল, কতকটা বুঝল না যেন--দুগারজির ধারণা। এই ঘাতক ছোঁড়াটাকে নিয়ে একটাই সমস্যা, মেয়েমানুষের দিকে দৃকপাতহীন। ঐতিহাসিক আমলে এখানে অসংখ্য খোজা বান্দা ছিল। মনে মনে বললেন, 'ই শালার আত্মায় ফিফটি পার্সেন্ট বাঘ, ফিফটি পার্সেন্ট খোজা। শালা হিজড়ে! নৈলে এখনও বিয়ের নাম পর্যন্ত মুখে আনে না।'

নাসির সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে হাজারদুয়ারি প্যালেসের দিকে—দূরে তাকিয়ে আস্তে বলল, 'দেখছি। ভাববেন না।'···

বিকেলে অপ্রত্যাশিতভাবে নদীর ঘাটে দেখা চাপ-চাপ জমাট জঙ্গল দুধারে। সংকীর্ণ রাস্তা। কেল্লাবাড়ির ভাঙা ফটকের দিকটাও জনহীন। সিক্তবসনা তরুণী ঠোঁট কামড়ে ধরে পায়ের কাছে ইটের টুকরোগুলো দেখতেদেখতে ডালিমবৃক্ষবাসী জিনটিকে মনে মনে ডাকতে ডাকতে বলল, 'কী?'

নাসির বলল, 'হুকুম।'

'মাতলামি কোরো না।'

'আমি মদ খাইনি। সন্ধের পর খাব। এখুন মাথা ঠিক। হুকুম দাও।'

'চেঁচিয়ে লোক ডাকব।'

'ডাকো। আমার নাম নাসির।'

'কেন তুমি আমার পেছনে লেগেছ?'

'লাগিনি।' নাসির একটু হাসল। 'তিনবিঘে ফেরত লিবা তো হুকুম দাও।

দিলু বাঁকা হাসল। 'কী মতলব? খুলে বলো।' নাসির চুপ করে আছে দেখে সে ফের বলল, 'দুগারজি আমার মুখ বন্ধ করতে পাঠিয়েছেন তো? আমি জানি।'

'দেখ দিলু, ইভাবে মুখ বন্ধ হয় না। নাসির জানে। নাসির ইচ্ছে করলে তুমাকে উঠিয়ে লিয়ে যেয়ে বিহা করতে পারে। সব জানে। তবে সেটা কথা লয়।'

হঠাৎ সাহসী হয়ে গেল দিলু। 'কাল থেকে মিটিঙে তোমার একথা বলব।'

'বোলো। সেটাই চাই। তবে ছ্যাচা কথাটো বলবে। কী, বুলবে

নাসির আলি দুগারবাবুকে বসাতে হুকুম লিতে এসেছিল। আর বুলবে কী, নাসির আলি বুলেছে, হুকুম পেলে ভোটের আগেই ঝান্ডা পুঁতবে মাঠে।'

দিলু আস্তে বলল, 'তুমি আমাদের হয়ে ভোটে খাটো তাহলে। দেখাও, তুমি মিথ্যা বলছ না।'

'আমি ভোট বুঝি না, মাঠ বুঝি। কালু হাজি বুলেছে, তল্লাটের পামসেট পাহারা দিলে বছরে পাঁচ হাজার পাব। আমার পাঁচজন লোক আছে, যারা আমার আপন। বাদবাকি ই টাউনে সবাই ফালতু। ভাবে ভক্তি লয়, ভয়ে ভক্তি। বুঝলা কিছু?'

'আমার বুঝে দরকার নেই।' বলে দিলু পা বাড়াল।

'দিলু, হুকুম!' নাসির পেছন থেকে বলল।

'আমার কোনও হুকুম নেই।'

দিলু চলে গেলে সিগারেট ধরাল। এতদিন বাদে নিজেকে এই প্রথম অসহায় লাগছে। দুগারজি তাকে নিয়ে এ কী খেলা খেলতে শুরু করল? বুকটা তোলপাড় হয়। সিক্তবসনা তরুণীর পথ চলার ছপছপ শব্দ কানে বসে গেল। এই টাউনের তাবত মেয়ে নাসিরকে দেখলে মিষ্টি হাসে। সেই নাসির! শালা দুগারবাবু। খুঁচিয়ে তুমি ঘা করে দিয়েছ।...

চন্দ্র সিং দুগারও রোজ গাঁয়ে-গাঁয়ে মিটিং করে বেড়াচ্ছেন। এলাকার ব্যবসায়ীরা তাঁর সমর্থক। বড় জোতের মালিকরাও তাঁর পেছনে। মুসলিম মেজরিটি জেরাত মির্জার হত্যাকান্ডের সময় দুগারজির বিরুদ্ধে খাপ্পা হয়েছিল বটে, কিন্তু এসব ক্রোধ ক্ষণস্থায়ী হয় আপন স্বভাবে। মির্জার মেয়ে তাকে জাগানোর চেষ্টা করেছে হরেনমাস্টারের তাগিদে। দুগারজি হাওয়া আঁচ করেন, অতীত ক্রোধ জাগি-জাগি করছে। মেয়েটা এমন বলিয়ে, ভাবা যায়নি। একটা মাসেই 'জ্বলাময়ী ভাষণ' যাকে বলে, রপ্ত করে নিয়েছে। আসলে মেয়ে তো, তদুপরি নবাবি খান্দানের দাবিদার এবং বিশেষ কথা, মুসলিম। এটাই চিন্তার কারণ। 'কিন্তু না, সাম্প্রদায়িক অ্যাঙ্গেলে এটা নেওয়া ভুল হবে, দুগারজি।' রাণী রায় বলেন। 'ধর্ম সম্প্রদায়-টায় আজকালইলেকশান-ফ্যাক্টর নয়—অন্তত এই রাজ্যে। এটা ওয়েস্টবেঙ্গল, দুগারজি! আপনি শুধু

ফ্লোটিং ভোটটা খান, দ্যাটস এনাফ্।' ফ্লোটিং ভোট, যতদিন যাচ্ছে, হরেনমাস্টারমুখী হচ্ছে যেন। বড় সমস্যায় ফেলে দিলে জেরাত মির্জার মেয়ে। ওকে একনিমেষে বসিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তাতে সর্বনাশের চূড়ান্ত হবে।

পাঁচদিনের দিন সন্ধ্যায় একুশ বিঘের পাম্পসেটবসানো একতলা ঘরটির বারান্দায় বসে হুইস্কির একটি বোতল উপহার দিলেন নাসিরকে। বিদ্যুতের আলোয় প্রসারিত মাঠে সুবর্ণচিত্রটি থরথর করছে উত্তেজনায়। দুগারজি বললেন, 'কদ্দুর এগুলি, বল বাপ!'

নাসির বলল, 'সব ঠিক আছে।'

একটু চটে গেলেন চন্দ্র সিং দুগার। 'কোথায় ঠিক! আজ রোশনবাগের মিটিঙে হারামজাদি বলেছে—'

'বলুক। মুখের কথা।'

'নাসির! তু—

'ভোটের মুখে লোকে কত কী বলে।' নাসির ডাকল, 'ভজা! গিলাস বার কর। চাণ্টা, শালা কী দেখছিস? পানি লিয়ে আয়। কড়া জিনিস।'

দুই সাঙাত হুকুম তামিলে দেরি করল না। তারপর নাসির বলল, 'আলো নেভা বে। চাঁদের আলোই সাফিসেণ্ট। চাণ্টা, আগে মালিককে দে।'

আলো নেভামাত্র চাঁদের সমস্ত আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর পাড়ে, একটু দূরে, বাংলাদেশী খেতমজুরদের কুড়েয়, গানের আসর বসেছে। এতোলবেতোল হাওয়া কুড়িয়ে এনে দিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দু-একটা কলি। দুগারজির সামনে গেলাস ধরলে ছিটকে সরে বসলেন। 'ছিঃ! কখনও দেখেছিস?'

'আজ একটুকুন দেখি, দুগারজি!' নাসির বলল। 'আমাব মন চাঙ্গা। মন চাঙ্গা তো পাশেই গঙ্গা।'

'না গিলেও মাতলামি! কাজের বেলা অষ্টরম্ভা।'

নাসির খানিকটা গিলে গোঁফ মুছে বলল, 'কাজ হয়েছে। আমি নাসির, দুগারজির।'

'কী কাজ, হিসেব দেদিনি।'

'দিব। এক চুমুক খান, এই কোণ্ডিশন।'

দুগারজি না হেসে পারলেন না। 'ওরে আমার কোণ্ডিশন-ওলা!'

নাসির গেলাস শেষ করে দুগারজির জন্য রাখা গেলাসটা তুলে তাঁকে খাওয়াতে গেল। মুহূর্তে কুপিত চন্দ্র সিং দুগার তার হাতে ধাক্কা মারলেন। গেলাসটা পড়ল না। কিন্তু মদটা ছলকে পড়ল। নাসির বলল, 'ভজা, চাণ্টা! ধর মালিককে। একটুকুন খাওয়াবই খাওয়াব। আমি নাসির।'

ভজা বলল, 'ছিঃ। কী করো নাসিরদা।' চাণ্টাও বলল, 'কী করছ, মাইরি।'

নাসির গেলাসটা ফের তৈরি করে বলল, 'কৈ, হাঁ করুন। ভজা, চাণ্টা। ধর। অ্যাই শালারা।'

দুগারজি বেগতিক দেখে উঠে দাঁড়ালেন। মুখে রাগী হাসি। পা বাড়িয়ে বললেন, 'আমারই ভুল হয়েছে। ভজা, দেখিস বাপ। ঝামেলা না পাকায়। সকালে এসে কথা বলব।'

যেতে যেতে পেছনে শুনতে পেলেন, 'আপনার কথায় মানুষ বসিয়ে দিয়েছি। আমার একটো কথা থুলেন না, দুগারজি। সামান্য এইটুকুন কোণ্ডিশন—একটা শত্ত শুধু। নামতে হলে দুজনই নামব, না কী? একতরফা! দুগারজি। নাসির মানুষ লয়, খালি আপনি মানুষ। আচ্ছা!'

ছোঁড়াটার এমন বেগড়বাঁই কখনও দেখেননি। সারা চন্দ্রালোকিত মাঠ ভাবতে ভাবতে গেলেন চন্দ্র সিং দুগার। কিছু একটা ঘটেছে। কী? নৌকোয় উঠে মনে হল, হিতে বিপরীতই হয়ে গেছে।...

ভোটের সাতদিন আগে কালিগঞ্জে হরেনমাস্টারের জনসভায় বোমা ফাটল। তিনটে অথবা চারটে, প্রকৃতই বোমা। তবে সভার ভেতরে নয়, পিচরাস্তায়। ঘন ধোঁয়ার ভেতর মাইকের তার কাটা গেল। মানুষজন পালিয়ে যাচ্ছে, তবু খালি গলায় হরেনমাস্টার চিৎকার করছেন, 'এভাবে বিপ্লবকে রোখা যায় না।' কর্মীরা দিলবাহারকে কাছের একটা বাড়িতে টানতে টানতে নিয়ে গেল, যেন দলের প্রাণভোমরা। কারা বোমা ফাটাল, জানা যায় না। একজন কর্মী ভাকাকে মালবাহী সাইকেলরিকশোর দঙ্গল নিয়ে নাকি আসতে দেখেছিল। ভাকা এলাকার কুখ্যাত সমাজবিরোধী।

রাণী রায়কে সমর্থন করার গুজব ছিল। পরদিন রাণী রায়ের ফ্যাকসিমিলি স্বাক্ষরসম্বলিত ইশতাহার বেরুল, 'আমরা সমাজ-বিরোধীদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখি না। আমরা তাদের ঘৃণা করি। কালিগঞ্জের ঘটনা সম্পূর্ণ সাজানো। কারণ কেউ হতাহত হয়নি। জনগনের সামনে আমরা এই প্রশ্নটা রাখছি, বোমা কি গোলাপখাস আম?' এই প্রজাতির আমের সঙ্গে নবাবী ঐতিহ্যের সম্পর্ক থাকায় কিছু ইঙ্গিত ছিল। বুঝ লোক, যে জান সন্ধান।

কোনও একটি ঘটনা অন্যান্য ঘটনা প্রসব করে। হরেনমাস্টার বলেছিলেন, 'দিলু, ভয় পেয়েছিস মা? ভয় পাসনে। প্রতিক্রিয়াশীলরা মরিয়া হয়ে উঠেছে, এটা তারই লক্ষণ।' সে-রাতে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ পোড়ো মসজিদের গম্বুজে এসে বসলে বিনিদ্র দিলুর সঙ্গে ডালিমবৃক্ষবাসী জিনটির প্রথম মুখোমুখি দেখা হল। দিলু বলল, 'আমার ভয় করছে। বলো, কী করি?'

'তুমি নাসিরকে ডাকো।'

'ছিঃ। এ কী কথা?'

বসন্তরাতের জ্যোৎস্না-নাড়াদেওয়া তোলপাড় হাওয়ায় ডালিম-গাছটির ভেতর 'নাসির নাসির নাসির' শব্দ খালি। শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে 'নাসির নাসির নাসির'। ভাঙা চাঁদ ভালো করে দেখতে আরও একটু উঠল। তারাবুড়ি স্বপ্নের ভেতর থেকে ডাকল, 'বেটি।' দিলুর ইচ্ছে করছিল, ডালিমগুলান দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে আছাড় মেরে ভাঙে।

পরদিন কেশবপুরের মাঠে সন্ধ্যার মুখে হরেনমাস্টার আর দিলুর রিকশোর পেছনে বিস্ফোরণ। নিজামের রিকশো। কর্মীরা পায়ে হেঁটে ফিরছিল। সঙ্গে কিছু অস্ত্র ছিল। কিন্তু এটিও নিষ্ফল বোমা গোলাপখাস আম। যথেষ্ট নিরাপদ দূরত্বে সেটি ফেটেছিল। সুতরাং হরেনমাস্টারের সিদ্ধান্ত, 'ওরা ভয় দেখাচ্ছে।' কারা? প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গ। তারা কারা? রাণী রায়, চন্দ্রসিং দুগার, আবদুস সামাদরা।

ডালিম গাছের জিনটি বলল, 'নাসির নাসির নাসির…।'

অসহ্য। চোখে জল নিয়ে মির্জা জেরাতের বেটি ভাগীরথীর ঘাটে গেল। ভৈরব ডিঙ্গি থেকে জাল ফেলছিল জলে। অস্তসূর্যের ঝিলিমিলি জালের জলকনায় বুকফাটা কান্না, অঝোর অবুঝ ক্রন্দন

মনে হয়। ভৈরব একটু অবাক হয়ে বলে, 'ই অবেলায় উপারে কাঁতি যাবা মাজলনী? ভৈরব কয়েকপাত্র গেঁজানো খেজুর রস গিলেছে। চুপ দেখে ফের বলল, 'উপারে যাবার ইচ্ছে আমারও। ইখানটায় দ। শালার জাল তল পায় না গো, দেখছ—হুঁ?'

একুশ বিঘে আমবাগান দিলু দেখেনি। গমক্ষেতের সুবর্ণচিত্রটি দেখেছে। ভাঙা দেউলের শরীরে জঙ্গল ঝাঁপ দিয়েছে যেখানে, সেখানে চিত্রটির সীমানা। কাঁটাতারের বেড়া! থমকে দাঁড়াতে হল দুগারজির শক্তির সামনে। গমের পাঁজা মাথায় খেতমজুরেরা আবছায়ায় ক্ষয়ে যাচ্ছে। আট-ন ইঞ্চি পুষ্ট শিস। এত ফলন এই মাটির। হাত গলিয়ে কয়েকটা শিস ছেঁড়ে দিলু। শরীরে অসহ্য জ্বালা আর চিৎকার। ডালিমগাছের জিনটি তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে আর শ্বাসপ্রশ্বাসে, উত্তাল হাওয়ার সুরে বলছে,'নাসির নাসির নাসির…!' তাকে তাতিয়ে দিচ্ছে। প্ররোচিত করছে।…

গাবতলায় নাসির দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছিল। কদিন থেকে দুগারজি আসছেন না। আজ আসার খবর হয়েছে। ভোটের মিটিং সেরে মজুরি মেটাতে আসবেন।

নাসির জাগাল। তার দৃষ্টি একুশবিঘের প্রতিটি শিস ছুঁয়ে ঘোরে। চুন্নি মাঠকুড়োনিদের পটাত করে শিস ছেঁড়ার শব্দও প্রতিধ্বনিত হয় তার তিনপুরুষের জাগাল রক্তে। শিবমন্দিরের কাছে সেই শব্দ শুনেই, অথবা অন্য কিছু, সে ঘোরে। রক্ত ছলাত করে ওঠে। আলো এখনও ফুরোয়নি। অসহ্য আনন্দ অথবা ক্ষোভ তাকে মাটি ছাড়া করতে চায়। ভাবে, চেঁচিয়ে ডাকবে। ডাকে না।

মুখোমুখি হয়ে কয়েক হাত দূরত্বে থেমে সে দিলুর মতোই বলে, 'ক্কী?'

'নাসিরভাই!' দিলু আস্তে বলে। 'কাল সন্ধ্যায় কেশবপুরে —' থেমে যায় সে।

'হুঁ—ভাকা।'

'দুগারবাবু।'

'ওই হল। যা ভাকা, তাই দুগারবাবু।' নাসির গলার ভেতর বলে, 'কিন্তুক কথাটো কী?'

'হুকুম চাইতে গিয়েছিলে, নাসিরভাই!'

নাসির একটু হাসে। 'এই কথা! ভাল! খুবই ভাল।

হাজিসাহেব আমাকে বলেছে, তামাম পামসেট জিম্মা লাও, পাঁচ হাজার। আমি বলেছি ডবল। তবে রফা হবে।'

'নাসিরভাই! তুমি ঝান্ডা পুঁতবে বলছিলে।'

'পুঁতব! আগে শালা দুগারজি।' নাসির সিগারেটটা পায়ের তলায় চপ্পলে ঘষে নেভায়।' বড় মুখ করে এসেছ দিলু। তখন ই নাসির ছেঁচা কথাটো বলবে! হঁ্যা, তুমার বাপজিকে আমি মেরেছি। ঘিন্না করো, গায়ে থুতু দাও, যা ইচ্ছে করো! আমার ই হাত পাপিষ্টির হাত। ই হাত কাটো, যদি ইচ্ছে হয়! কিন্তুক—,

ভৈরবের হাঁক ভেসে আসে। 'জলনী গো!' এপারের জলে সুবিধে হচ্ছে না। তাই ফের ওপারে যাবে। দিলু বলে, 'যাই!' নাসির কী বলতে চাইছিল, শুনতে সাহস নেই বলেই এমন পলায়ন।

নাসির ডাকবে ভাবে। ডাকে না। একটা ঝড় এসেছিল। চলে গেল। এখন বৃষ্টির শব্দ চারদিকে। ওপারে ইতিহাসের ভাঙা-চোরা প্রাচীন রাজধানী ধূসর হয়ে যাচ্ছে। দিনশেষের অলীক বৃষ্টিতে নাসির তার পাপ ধুয়ে ফেলতে চায়।...

দুগারজি আসতে একটু রাত হল। ক্ষেতমজুরদের সপ্তার মজুরি মিটিয়ে আরাম করে বসলেন সেই ছোট্ট ঘরটার খোলা বারান্দায়। আজও একটা হুইস্কির বোতল এনেছেন। নাসির বেয়াদপি করল না আজ। বোতল আধাআধি হলে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। 'চান্টা, আলো নেভা বে!' চান্টা আলো নিভিয়ে দিলে গাঢ় অন্ধকার আর বাতাসের শব্দ। মাঠজুড়ে ইতিহাসের পুরনো ঘোড়সওয়ারদের ছোটাছুটির শব্দ। একটা হারা-জেতার চরম লড়াই বেধেছে রাজধানীর সামনে।

দুগারজি বললেন, 'নাসির! ধাপে পা দিতে পারলিনে বাপ!'

নাসির বলল, 'দিয়েছি।'

'কীরকম, কীরকম?'

'এই রকম।'

কী একটা সন্দেহ করে দুগারজি টর্চ জ্বেলেই আঁতকে উঠলেন। সেই ছ'ঘরা পিস্তল! চেঁচিয়ে উঠলেন, 'চান্টা জগা?'

বসির!' আজ বসিরও আছে পাম্পঘরে। সে দুগারজির বডিগার্ড।

টর্চের আলোয় প্রথম গুলিটি ফুটল। লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলিটি গমক্ষেতে গিয়ে ঢুকল। তারপরই বসিরের হাতের লোহার রডটি ফটাস শব্দে নাসিরের খুলিতে পড়ল। টর্চ নিভে গেল। ফের জ্বললে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা নাসিরের দিকে তাকিয়ে দুগারজি বললেন, 'ইঃ! ই কী রে! ইটা—'

বসির বলল, 'শ্যাষ করাই ভাল।'

দুগারজি ভাঙা গলায় বললেন, 'হুঁঃ! দুধ দিয়ে সাপ—শালা! দে, তাই দে। দিয়ে লদিতে ফেলে দিয়ে আয়। পরে দেখা যাবে। আর চান্টা, লৌকোতে দিয়ে আয় আমাকে। পা কাঁপছে বাপ!'···

ভোটের মুখে লাস পড়ে বরাবর। এটা কোনও খবর নয়। কিন্তু খবর করা হয়, নাসিরের ক্ষেত্রে। সে দুগারজির মাইনে-করা লোক ছিল। খবর হয় মিটিংগুলানে, হরেনমাস্টার মির্জার বেটিকে দিয়ে নাসিরকে টেনেএনে খতম করেছে। মির্জার বেটি টোপ ছিল। সাক্ষী ভৈরব? ভৈরব বলে, 'হুঁ, সিটা মনে হয় বটে। আমার লৌকোয় মেয়েটোর উপারে যাওয়াও সত্যি। হুঁ—লেয্য কথা বলব। ডর কিসের?,

নেহাত আইনরক্ষার জন্য আইনরক্ষকরা মির্জার মেয়েকে গ্রেফতার করতে এসে দেখলেন, সে উঠোনের ডালিমগাছটিকে ওতপ্রোত কুপিয়ে কাটছে। গোড়াটা নির্মূল করার সময় আব্বাস দারোগা একটু হেসে বললেন, আসুন। আপনাকে গ্রেফতার করা হল।'

মির্জার মেয়ে বয়স সতের বছর। তাকে আপনি বলার হেতু নিয়ে লোকেরা মাথা ঘামাচ্ছিল। শেষে ধরে নিল, খান্দানি রক্তের প্রতি সম্মান। ন্যাড়া উঠোন জুড়ে ডালিমগাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তারাবুড়ি সুর ধরে কাঁদে আর জড়ো করে। ফলগুলান টক আর তিতকুটে, সে জানে। এও জানে, নির্বাসিত জিনটি ঠাঁই বদলাতে বাধ্য।···

প্লাবন

অন্ধকারে নীচের দিকে শুকনো পাতার মচমচ শব্দ শোনা যাচ্ছিল সারাক্ষণ। মধ্যরাতে কিছুটা চুপচাপ ছিল। ফের এখন সেই শব্দ ; অথচ এ শব্দ যেন তেমন নয়, কিছুটা ভারী আর সতর্ক। আর মাথার ওপর বা আশে পাশে পাখিগুলোরও সাড়া নেই। আলো না থাকলে যা হয়, হঠাৎ ঠোঁটের কাছে ফলের স্পর্শ পেলে পাখিরা ঠোকর না মেরে থাকতে পারে না। ঠোকরের শব্দও বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ শোনা যায় না। ডালপালার ফাঁকে ওপাশের ঘন গা জড়াজড়ি করে থাকা গাছগাছালির শীর্ষভাগ এখন একটু করে হলুদ হয়ে উঠছে। ঠিক হলুদ নয়, ধূসরতা মেশানো খসখসে একটা গেরুয়া রঙের ছোপ। তাহলে এতক্ষণে চাঁদ উঠছে। ভাঙা চাঁদ কৃষ্ণপক্ষের। বাঁদিকের ফোকরে তাকালে দূরে নদীর প্রসারিত অববাহিকায় দিগন্তজোড়া খড়ের জঙ্গল চোখে পড়তে বাধ্য। মধ্যরাতে সেখানে হট্টিট্টি পাখিটা একটানা ডাকছিল, জোড়া মরে গেলে ওরা নাকি এই রকম ডাকে—তবে দিনের দিকে খড়ের মাঠে সেই বাচ্চা রাখালটা অবনীকে বলেছিল, এটা ওদের ডিম পাড়বার ইচ্ছে নিয়ে জোড়াকে ডাক দেওয়া, সেই প্রেমিকা পাখিও এখন চুপ করেছিল। কারণ মধ্যরাতের পর স্থাবর জঙ্গল চরাচর কিছুক্ষনের জন্যে অভিভূত থাকে—অভিভূত থাকে অজস্র প্রতিচ্ছবির দেখা পেয়ে যায় বলে, যার নাম দেওয়া হয় স্বপ্ন। এবং হিজলের শীষালো ফুলের ভিতর হঠাৎ উড়ে যেতে গিয়ে যে পাখিটা হঠাৎ ডালে প্রতিহত হয়ে নীচে পড়েছিল, নিশ্চিত কোন জানোয়ার তাকে কামড়ে ধরবার চেষ্টায় তাড়া করেছিল—এই বটের তলা অব্দি তাদের বেশ কিছুক্ষণ ছোটাছুটি জীবন মরণ লড়াই চলছিল ; শেষে কী হল অবনী বুঝতে পারেনি। তারাও একসময় নৈশব্দের মধ্যে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এমন কি অবনীর নিজেরও সেই-রকম একটা আবেশ আসছিল। বারবার চলে যাচ্ছিল সে অন্য কোথাও। যেন কে তার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল টেনে। সামনে

ছিল সীসেরঙা দেয়াল। দেয়ালে মা-বাবা চেনাশোনা মানুষদের ভীড়ে অপরিচিত হয়ে উঠছিল। আর সুষমাকেও দেখেছিল সে কয়েকবার। ঠিক সুষমাকে না। তার শরীরকে। চমক খেয়ে অবনী জেনেছিল স্বপ্ন নয়; সে সুষমার দেহকে চাটছে! সে দেহকে চাটতে চাটতে তার জিভ গেছে শুকিয়ে। তখন সে জিভ খুব পিপাসার্ত, ফলে দ্বারে মাথা খোঁড়ার মত প্রচণ্ড ছটফটানি তার—সেই করুন পিপাসার এবং…'আমি আবার জন্মাতে চাই।'…

উদ্‌ভ্রান্ত অবনী এই রকম কিছু বলবার চেষ্টা করছিল। মধ্যরাতের পর অভিভূত পৃথিবীতে এই ছিল তার কান্না। দেহের কান্না নয়, মনের কান্না। আত্মার অশ্রুপাত। আর ঠিক তখনই নীচের দিকে গুরুতর মচমচ শব্দ। ভারী পা ফেলে কোন সতর্ক জানোয়ার যেন হাঁটছে। অবনী বুঝল, এ শব্দ শেয়ালের নয়। আজ সারাটি রাতে তার যা অভিজ্ঞতা, গ্রীষ্মে বটফল পাকবার ঋতু, সব শেয়াল কাঠবেড়ালি পাখপাখালি এই গাছটাকে নিয়ে এনতার মজা লুটছে। দিনের আলো ফুটলে সে এক দৃশ্য দেখা যাবে, যদিও অবনী আর তা দেখছে না। অতক্ষণ অব্দি টিকে থাকার ফুরসৎ তার নেই। মাথার উপরের ডালটা খুব মজবুত। খুব মসৃণও বটে। যতবার উঠে দাঁড়াচ্ছিল, গালে ঠেকছিল ডালটা। গাভীর শরীরের মত। আর গাভীর জিভের মত স্নেহের আদর দিয়ে চাটতে এই পাতাগুলোও কম পটু নয়। কুফল হলেও অবনীর মনে পড়ছিল, কুসুম গয়লানী বলত—আমার গাইয়ের দুধ, যেন বটের আঠা গো, বটের আঠা। গাভীর সঙ্গে বটের উপমা বেশ শোভন ও সহজ। আহা, কুসুম আজ সকালেই বাজারের পথে তাকে বলেছিল, কোথা চললে গো ছোট ঠাকুর এই সকাল বেলায়! অবনী বলেছিল, যাই একটু জগতের ওখানে। জগতের চায়ের দোকান এড়িয়ে রেললাইন পেরিয়ে সে মাঠে নেমেছিল। বাঁ হাতে কুপথ ভেঙে টালিভাটার পাশ দিয়ে একেবারে নদীর পাড়ে চলে এসেছিল। কিছুক্ষণ হেঁটে অবনী বিলের দিকে চলে আসে। খড়ের জঙ্গলে কোথাও খড় কাটছে লোকজন। তাদের এড়িয়ে দূর থেকে দূরে সে হাঁটছিল। মাথার ওপর গণগণে নীল ভয়ঙ্কর আকাশ বাতাস। সাদা লিলি রোদ। ঘাস খড় সব শুকিয়ে গেছে চারপাশে। কোথাও একফোঁটা জল নেই। আশ্রয় নেবার মত ছায়া নেই। কদাচিৎ অনেক দূরে-

দূরে দুটি কি একটি বিশীর্ণ বাবলাগাছ। আর কোন গাছপালা নেই। ঝাঁ ঝাঁ বাতাসের চিৎকার সবখানে। ঘাসফড়িং উড়ছিল। চিড় চিড় চড় চড় অদ্ভুত শব্দ করছিল তারা। ছেলেবেলায় অবনী যখন পাখি পুষত, তার জন্যে ঘাসফড়িং মারতে আসত এতদূর অব্দি। স্কুল কামাই করে এই সব কীর্তি হচ্ছে জানতে পেরে বাবা কী প্রচন্ড মার না তাকে দিতেন! সারা গায়ে লাল ফুলো ফুলো দাগ হয়ে যত। অবনীর মা স্বামীর ভয়ে কিছু বলতে পারত না বটে, আড়ালে মাথা কুটে শাপমন্যি করত। মরুক, মরুক মুখে রক্ত উঠে যখের, আমি হাসতে হাসতে শাখা ভাঙি, সিঁদুর ঘুচোই। কিন্তু অবনীর বাবার কিছু হল না। মাঝখান থেকে মা বেচারাই গেল! তা যাক্, খুব বেঁচে গেছে মেয়েটি, অবনী বাঁচল না। আহা, অবনী তেমন করে বাঁচল না!

অন্য রকম ভাবে বাঁচতে চেয়ে আজ অবনী দারুন রোদের মধ্যে অত বড় গড়ের মাঠটায় ঘুরে বেড়িয়েছে। মাথার চুল আঁকড়ে ধরে দৌড়াদৌড়ি করেছে। তৃষ্ণায় গলা খস খস করছিল। জিভ খড়ের মত শুকনো বোধ হচ্ছিল। নগ্ন পা দুটো অনভ্যাসে শক্ত ধারাল মাটিতে, খড়ের ঘষা খেয়ে, কাঁটা ফুটে ক্ষতবিক্ষত স্মৃতিগুলো আড়ালে রেখে, অবনী উদ্‌ভ্রান্তভাবে কী খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কী খুঁজছিল, স্পষ্ট জানে না। অথচ সেই রকম প্রচন্ড প্রয়াস। সেই-রকম ছটফটানি। হায়, এই বিস্তৃত উদার মাঠ আর আকাশ তা পাইয়ে দিতে সাহায্য করল না। অবশেষে একটা শুকিয়ে যাওয়া নালার ধারে এসে অবনী গুটিকয় রাখালের দেখা পায়। নালাটা বেশ গভীর ছিল। দুপাশে লতাগুল্ম ঝুঁকে থাকায় নীচে ছায়া-ভরা জায়গা ছিল কিছুটা। সেখানেই গরুগুলো ঢুকে পড়ে জাবর কাটছিল। আর রাখালেরা পরস্পর ঝগড়া করছিল। অবনীকে দেখে ওরা থেমে যায়। অবনীর লাল চোখ, রুক্ষু কটা চুল, গায়ে হাতাগুটানো শার্ট ও পরণের ধুতিটাও যথেষ্ট ময়লা। অবনী হয়ত বা নদীর ওদিকে শ্মশানের কাছে হারু ডোমের পাল্লায় পড়ে এক-চোট তাড়ি গিলেছে গ্রীষ্মর দুপুরে—ওরা নির্ঘাৎ এরকমটি ধরে নিয়ে থাকবে। কারণ অবনী টলছিল। অবনী জড়ানো গলায় বলে-ছিল, এখানে কোথাও জল আছে?…আছে, আছে! ওরা জবাব দিয়েছিল। বয়সে ওরা কিশোর সবাই, একজন বাদে। অবনী বলে-

ছিল, কোথায় আছে জল, দেখিয়ে দিবি ? ওদের দলপতির মাথায় একটা মাথালি, তাতে ট্যাসকোনা পাখির ঘন রেশমীনীল ডানা গোঁজা একগুচ্ছের। অন্য সময় হলে, ছেলেবেলা হলে তখনই অবনীর সাড়া পড়ে যেত ট্যাসকোনো পাখির ডানা খুঁজতে। এ যৌবনের জ্বলন্ত দিনে ট্যাসকোনা পাখির নীল রেশমী ডানার চেয়ে জলের বড় বেশি প্রয়োজন। ফের ধমক দিতেই দলপতি উঠে গিয়ে নালার পারে দাঁড়াল। অবনীকে ডেকে বলল, দেখে যান। অবনী গেল। খুব কষ্ট করে মাটি আঁকড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে সে উঠতে পারল পাড়ে। দলপতি তার লাঠির ডগা দিয়ে দূরের নীলাভ আর ধূসর জঙ্গলটা দেখাচ্ছিল—ন্যাশনাল হাইওয়ে যাকে ভেদ করে রেললাইন ডিঙিয়ে চলে গেছে শিলিগুড়ির দিকে, কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি নীচের সেই নতুন সড়কে ভাড়া করা মোটর গাড়িতে অবনী তার বৌকে এনেছিল, সুষমাকে।

সুষমার কথা থাক্। অবনী রাখালটাকে বলেছিল, সঙ্গে যাবি! দেখিয়ে দিয়ে আসবি! সেয়ানা রাখাল শেষ অব্দি বখশিসের লোভেও সঙ্গে যেতে চায় নি। ধমক, এমন কি কান টেনে ধরেও বাগ মানানো যায়নি তাঁর গোঁকে। তারপর দুচোখে পিচুটি নিয়ে এল সেই বাচ্চাটা। কোমরে একফালি ন্যাতা। কানে তার বুনো ফুল গোঁজা। ছোট্ট লাঠির ডগায় সেও একটা ডানা গুঁজেছে। সে এসে বলছিল, চলেন মশাই, আমি যাই।...সে কি রে পাতকুড়ো! দলপতি রেগে কাঁই। তুই যাবি ওই গলায় দড়ের জঙ্গলে! শালা নির্ঘাৎ মরবে রে! প্যাতকুড়ো অদ্ভুত হাসছিল।...আমার মরন নাই রে, আমি আক্কস। দলপতি শাসাচ্ছিল, শালা ফিরে এলে তুকে দলে লিব না আর। বেঙড়ে দোব। তখন পাতকুড়ো একটা অবাক কথা বলে। সে বলে ওঠে, জানিস চন্ডী, আজ আমার মোন খারাপ নাই। আজ আমার সুখের দিন। দিদি এসেছে। আমার জন্যে জামা এনেছে। তবু শাসাচ্ছিল দলপতি। দলপতি, রোগাপটকা কয়লাকাঠ কিশোর রাখাল। জানিস, গলায়দড়ের কাছে যে যায়, তার মন্দ হয় ?

এই পাতকুড়োটা আজ ছিল বেপরোয়া। সে ভ্রূক্ষেপ না করে আগে-আগে হাঁটছিল। কুকুরের মত জিভ বের করে অবনী তাকে

অনুসরণ করছিল। গলায়দড়ের জঙ্গলে মন খারাপ থাকলে যেতে নেই।

ক্রমশ অবনী তার দুরন্ত হিংস্র তৃষ্ণাকে ভুলতে থাকে। সে বলে, হ্যাঁ রে পাতকুড়ো, গলায়দড়ে না কী বলছিলি ?

পাতকুড়ো যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে অদ্ভুত হাসে। আহা দুধের বাচ্ছা! বলে, হ্যাঁ গো মশাই! ওখেনে মোন খারাপ থাকলে যেতে নাই। গেলেই গলায়দাড়ি দিয়ে যারা মরেছে, তেনারা চাদ্দিক থেকে কান ভাঙানি দেয়। বলে কী জানেন ?

কী বলে রে ?

বলে, আয়, আয়, ঝুলে পড় গাছের ডালে। ফিসফিস করে বলতে থাকে পাতকুড়ো। ঢোক গিলে ফের বলে, উনারা খুব মজার লোক গো বাবুমশাই, বোঝলেন? আরও বলে—দড়ি এনেছিস সঙ্গে ? না এনে থাকিস, তারও অভাব নাই বাবামায়ের ছেলেরা, অ্যাতো মোটা-মোটা বুনোশিম বুনোআলুর লতা ঝুলছে। তাতেই কাজ হবে!

ভীষণ হাসতে থাকে ছোঁড়াটা। বুড়োমিতে ঠাসা আকণ্ঠ। অভিজ্ঞতা তো কম নেই ওদের। এই বিরাট তৃণভূমিতে ওদের দিন কাটবে। কৈশোর কাটবে। যৌবনও কাটবে। বার্ধক্যও কেটে যাবে। সে এক বিচিত্র জীবন। যে নিরাবরণ মুক্ত জীবনের স্বাদ পেতে চেয়ে ছেলেবেলায় অবনী স্কুল কামাই করত।

কিন্তু জীবনের কথা নয়, অবনী ভাবছিল মৃত্যুর কথা। ট্যাসকোনা পাখির ডানার বদলে তেষ্টার জল নয়, মৃত্যুর অন্বেষণ তীব্র হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। পেয়েছি, পেয়েছি! অবনী লম্বা পা ফেলে প্রায় দৌড়চ্ছিল। শিশু পাতকুড়োকে ফেলে। তার সদিচ্ছাকে মাড়িয়ে, বড় অনাদরে ওকে কষ্টের মধ্যে দারুন একাকীত্ব ও দলপতির লাঞ্ছনার দিকে ঠেলে দিয়ে অবনী ছুটছিল ; পেয়েছি, পেয়েছি!

তারপর পৌঁছে গিয়েছিল জঙ্গলটাতে। হিজল ভাট বুনোজাম ভাঁড়ুলে গাছের ঘন গভীর দুর্ভেদ্য জঙ্গলের কেন্দ্রেএক আদ্যিকালের অজস্র ঝুরিনামা বট গাছ। কোটরে তার মড়ার মাথা। কোলে তার এক বজ্রাহত ডাল। মুণ্ডহীন সে ডালের বুকে ছোট বড় গুটিকয় গর্ত। একটা গর্তের মুখে, কিমাশ্চর্যম,নীল রেশমী

ডানাওলা ট্যাসকোনা বসেছিল। অবনীকে দেখে সে ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডেকে উঠেছিল। ছেলেবেলার স্বপ্নের সেই অলীক পাখিকে হঠাৎ এখানে দেখেঅবনীর সারা যৌবনকাল, তার যৌবনকালের কেন্দ্রে ওই প্রচণ্ডভাবে দগ্ধ উজ্জ্বল গ্রীষ্মকালীন বিস্তীর্ণ খড়ের জঙ্গলটার মত একটা বর্তুলাকার ক্ষত, সব কিছু কোথায় মুছে গিয়েছিল। মুছে ফেলেছিল ছোট্ট কয়েকইঞ্চি নীলরেশমী পালকের পোঁচ। বিহ্বল অবনী ছেলেবেলার মতো ঢিল কুড়িয়ে পাখিটাকে খুন করতে চাইল। পাখি উড়ে গেল ভীত চিৎকার করে। হিজলের শীষলো কুলের মধ্যে দিয়ে আলোছায়ার ঝালর পেরিয়ে সবুজ গাঢ়তায় বিলীন হল। অবনী আর খুঁজে পায় নি তাকে। ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে পালিয়ে গেছেতার ছেলেবেলা। হতাশ অবনী মুখ তুলে বটফল দেখছিল। লালগুটি ফলে ভরা বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা—অজস্র স্তনের বোঁটার মত। ক্ষুধা জাগছিল অবনীর। পাকা বটফল পড়ে ছিল থরেবিথরে নীচের মাঠিতে। অসংখ্য কাক শালিক ছাতারে পাখিরা হল্লা করছিল নীচে ও উপরে। সেই মহাভোজে সোল্লাসে যোগ দিয়েছিল অবনী। মিষ্ট বটফলের স্বাদে তার শুকনো জিভ সরস হয়ে উঠেছিল। তার গায়ে চুপিচুপি স্পর্শ করেছিল ঝুলন্ত বুনো-আলু কুনোশিমের মোটা লতাগুলো। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একটায় গলা জড়িয়ে যেতেই অবনী থমকে দাঁড়িয়েছিল। অতৃপ্ত আত্মাদের আমন্ত্রন।

পাতকুড়ো বলেছিল, মন খারাপ থাকলে একাএকা গাছটার কাছে যেতে নেই। গাছটা তখন বাগে পায়। অবনী দারুণ শিউরে উঠে ভেবেছিল, আমার মন কি সতি-সত্যি খারাপ হয়ে আছে? আমার কি তাই?

অবনী, তুমি আজ সারাটি রোদের দিন খড়ের মাঠে ছুটে বেড়িয়েছ। তোমার বুকে বড় জ্বালা।

আমার জ্বালা জ্বালা নয় আনন্দ। মহা আনন্দ।

বেশ। তাই দিয়ে খুঁজে নাও তোমার পরিণাম—যা অমোঘ।

অবনীর গায়ের ঘাম স্নিগ্ধ ছায়ায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ফের সে ঘামতে থাকে এতক্ষণে। ছটফট করে। বুক দুহাতে চেপে ধরে ফিসফিসিয়ে বলে, আঃ আঃ! ঝুরির আড়ালে নরকের আগুনের মত সে দেখতে পায় তৃণভূমিকে। তার কানে আসে

অদূরে হাইওয়ের চলমান মোটর গাড়ির শব্দ। তার ধারণা হয়, সুষমা যে কোন একটি গাড়িতে চেপে ক্রমাগত তার কাছাকাছি আসছে। অবনী তখন ফের নরকের দিকে ফেরে। সে দেখে, সুষমার উলঙ্গ দেহ দাউদাউ জ্বলছে খড়ের জঙ্গলে। বড় অদ্ভূত আর ভয়াবহ দৃশ্যাবলী তাকে তাড়া করে। আক্রান্ত অবনী কাঠ-বেড়ালির মত হাঁচড় পাঁচড় করে ঝুরি বেয়ে গাছে ওঠে। পাখিরা চিৎকার করে দূরে সরে যায়। অনেক উঁচুতে গিয়ে বসে থাকে সে।

এবং বেলা ফুরিয়ে যায় অরণ্যে তৃণভূমিতে। অন্ধকার নামে। পেঁচা ডাকে। শেয়ালের পায়ের শব্দ হয় শুকনো পাতায়। বটফল ঝরে পড়ে। টুপ্…টাপ্…টুপ্…টাপ্ ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি। পতনের ধ্বনিপুঞ্জ।

অবনী ভাবতে থাকে। জীবনের ভাবনা মৃত্যুর ভাবনা। জীবনের যন্ত্রণা মৃত্যুর যন্ত্রণা।

গরুতর শব্দ উঠেছে নীচের দিকে অবনী কান পাতল। চোখের দৃষ্টি তীব্র করল। শেয়াল নয় কোন ভারী জানোয়ার চুপিচুপি হাঁটছে। বাঘ কি? বিচিত্র নয়। আরোয়ার এ জঙ্গলটার অনেক সুনাম ছিল এক সময়। ওপাশে কিছুদূর গেলে কুসুমপুরের রাজাদের সংরক্ষিত বন আমলাবাগ। হয়ত বন নয় বাগান। অযত্নে দিনোদিনে বনের চেহারা পেয়েছিল। হরিণ আছে সেখানে। ময়ূর আছে। আছে বিচিত্র জাতের সব পাখিরা। বাঘ তার আনাচে-কানাচে থাকা স্বাভাবিক ছিল। হাইওয়েতে রাতের দিকে বাঘের ভয় লোকের আছে। তাছাড়া ওই খড়ের জঙ্গল। বর্ষায় সবটা ডুবে যায়। দ্বারকার বন্যা বড় সর্বনাশা। অবনীদের উঠোন অব্দি ডুবেছিল গত বর্ষায়। স্টেশনবাবুর কোয়ার্টারে জল ঢুকেছিল। বাজারের সব দোকানপাট পক্ষকাল যাবৎ বন্ধই ছিল একরকম। ওদিকটা তো বেশ নীচুই। তা, বন্যায় ভেসে আসে বড়বড় পাহাড়ে চিতসাপ ময়াল। তাই সাপের উপদ্রব এলাকায় খুব বেশি। আর আছে শুয়ার। খড় কাটারা গ্রীষ্মকালে দুচারটে মারে। দুচার জন খড়কাটাও দাঁতালের ঘায়ে রক্তাক্ত হয়। সেই শুয়ার কি?

অবনী চমকাল ঠিক ভয়ের চমক নয়। অন্যরকম চমক। উলঙ্গ বসে আছে সে। জামা গেঞ্জী আণ্ডারওয়ার ছুঁড়ে ফেলেছে কোথায়।

ধুতিটা ফাঁস পাকিয়ে বেঁধেছে উপরের ডালে। দুচারবার মুন্ডুতে গলিয়ে অবস্থাটা চোখে দেখতে চেষ্টা করেছে। মন বলছে, ব্যস্ত কী, সবুর ব্যাটা সবুর। এখনও সময় আছে হাতে। ভাব, ভেবে দেখ। অবনী উঁচু হয়ে বসে ভাবছিল। এক হাত ডালে, অন্যহাত ফাঁসে ছিল তার। এবং আগে যা বলা হয়েছে, সে মধ্যরাতের পর বেশ শান্ত হতে পেরেছিল। সহজ ভাবে ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতি তার এসে গিয়েছিল। এমন কি অবনী নিজেকে অনর্গল গাল দিতে পারছিল।

শব্দটা যেন চক্রাকারে ঘুরছিল পায়ের নীচে। অবনী একবার মুন্ডুটা ঝুঁকিয়ে দিল। বাইরে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে। গাছপালার শীর্ষদেশে হলুদ ন্যাকড়ার মত চাঁদটাও একবার নজর হল তার। কিন্তু চাঁদ না দেখে সে ঘণ অন্ধকার আগাছায় ভরা পাদদেশটা দেখতে থাকল। কৌতুহলে ওর বুক ধক ধক করছিল।

পরক্ষণেই দেশলাই জ্বলে উঠল নীচে। তাহলে মানুষ। কিন্তু কী মানুষ এ! পলকের আলোয় লালচে মধ্যবয়সী মুখ একটা, গালময় খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ, মোটা ভুরু, কোটরগত উজ্জ্বল দুটো চোখ, কপালের ওপর বিশৃংখল চুলের রাশি। আর অবনী এও বুঝতে পারল, লোকটার গায়ে ছাইরঙা বুশসার্ট রয়েছে।

সিগ্রেটের আগুন জ্বলজ্বল করতে দেখল অবনী। এমনকি ধুয়ো টানবার আর ছাড়বার জোর শব্দও শোনা যাচ্ছিল। লোকটা পায়চারী করছিল। কখনও তার জলন্ত সিগ্রেট ঝুরির আড়ালে অদৃশ্য হচ্ছিল। অবনী শ্বাস টানতে থাকল। লোভনীয় ধুঁয়োর গন্ধে তার স্বাদহীন গলার ভিতরে যেন অজস্র স্নায়ু আরও তীব্র স্বাদের আশায় পোকার মত কিলবিল করে উঠেছে। অবনীর ভীষণ লোভ হচ্ছিল। সারা দিনরাতে তিন প্যাকেট সিগ্রেট খায়, সেই অবনী! জগতের দোকানে ঢুকলে কাজ হত। এখন আক্ষেপ করা বৃথা। অবনী দেখল, লোকটা সিগ্রেট ছুঁড়ে এবার অন্ধকারে কোথায় ডুবে গেছে।

একটু পরেই শ্বাসক্লিষ্ট কণ্ঠে ওর গালাগাল শোনা গেল—শালা শুয়ারকা বাচ্চা।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। কোন শব্দ হচ্ছে না কোথাও। অবনী দেখল, ফাঁসটা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট ফুটেছে মাথার উপর।

আর, তাতে ঠোঁটের আঘাত করছে কী একটা পাখী—সম্ভবত কাক। নীচের লোকটির ভয়ে অবনী কাকটা তাড়াতে পারল না। এদিকে আস্তে আস্তে গাছপালাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাদের ছায়া ফিকে হয়ে যাচ্ছে। নীচের সবকিছু সহজে দেখা যাচ্ছে। লোকটাকে খুঁজল অবনী। কোথাও দেখতে পেলনা। তার গা কুটকুট করছিল এতক্ষণে। তলপেটটা ভালো করে চুলকে পিঠ ঘষতে থাকল পাতায়। বেশ আরাম লাগছিল। অবনীর এবার হাসি পেল। হঠাৎ এই উলঙ্গ দেহে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়লে লোকটা নির্ঘাৎ ভির্মি খাবে, সে এক মজার কাণ্ড ঘটে যায়!

হঠাৎ একটা হাঁপানীর শব্দে অবনী ডান দিকে তাকাল। পাতার ফোকর গলিয়ে নরম অথচ ঘষা ঘষা কিছু আলো পড়েছে এক জায়গায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের জোর শব্দ হচ্ছে সেখানে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই কিম্ভুত মুণ্ডুটা দেখতে পেল সে।

লোকটা কয়েকহাত দূরে অন্য একটা ডালে উঠে বসল। অবনীকে তার পক্ষে দেখা মুশকিল। অবনীর বুকের কাছাকাছি সতেজ পাতার বুনুনি। ফোকরে চোখ রেখেছে সে। দেখছে, লোকটা ঠিক তার মতই কাপড়চোপড় খুলছে! যা বাব্বা!

কাপড়চোপড় ছুঁড়ে ফেলবার শব্দও শুনল অবনী। সর্বনাশ, চোখের সামনে এমন সাংঘাতিক কাণ্ড দেখে অবনী কি চুপ করে থাকবে নাকি?

অসম্ভব। এ অভ্যাস অবনীর আছে। চলন্ত রেলগাড়ীর চাকা থেকে এক বুড়িকে বাঁচিয়ে অনেক সুনাম অর্জন করেছিল সে। অবনী ভিখারীদের পয়সা দেয়। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিতে চায়। সে বড় দয়ালু।

প্রায় পাগলের মত অবনী হঠাৎ চীৎকার করে উঠল—এই, এই, কী হচ্ছে। এবং তার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে, যেমন করে একটা বাদুড় ঢিলের আঘাতে ডানার ঝাপটানি তুলে পাতায়-পাতায় শাখাপ্রশাখায় ধাক্কা খেতে খেতে নীচের দিকে পড়ে যায়, তেমনি করে পড়ে গেল লোকটা। একটা আচমকা ভয় পাওয়া অস্ফুট আর্তনাদ কয়েকমুহূর্ত গাছপালাকে কাঁপিয়ে দিয়ে থামল।

অবনী ভুলে গিয়েছিল যে সে একেবারে উলঙ্গ। সে দ্রুত নামতে থাকল ঝুরি বেয়ে। নামবার সময় অবনী টের পাচ্ছিল, অনেক

উঁচুতে চলে গিয়েছিল সে।

সারা গা ছড়ে গিয়েছিল অবনীর। মাটিতে পা রাখতেই সে বুঝল, জানু থেকে পায়ের পাতা অব্দি পাথর হয়ে গেছে। অসম্ভব ভারী বোধ হচ্ছে শরীরটা। মাথা ঘুরছে। টলতে টলতে সে চার পাশটা খুঁজতে থাকল। গাছের নীচে ভাঙাচোরা আলো পড়ে আছে। এতক্ষণে কোকিলডেকে উঠল। কাকগুলো কোলাহল করল। রাতের শেষ যামে শেয়ালেরাও দূরে ডাকতে থাকল। কয়েক পা হেঁটে একটা ঝুরির ওপাশে উলঙ্গ কিম্ভুত দেহটা আবিষ্কার করল অবনী

উপুড় হয়ে পড়েছিল লোকটা। ক্ষিপ্র হাতে তাকে চিৎ করতেই গোঙিয়ে উঠল। পানি, পানি। জল অবনীরও বড় দরকার ছিল। জল খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছিল। অন্যরকম জলের সন্ধান করেছিল। পেয়েছিল। পান করতে গিয়ে হঠাৎ সে আনমনা হয়ে উঠেছিল। ভাবছিল জীবনের কথা মৃত্যুর কথা। জীবনের যন্ত্রণা মৃত্যুর যন্ত্রণা।

রাগে আক্রোশে ফেটে পড়ল অবনী। শ্বাসক্লিষ্ট কণ্ঠে গর্জালি, থামো। তোমাকে পানি দিচ্ছি, হারামজাদা জানোয়ার! তারপর ঝুঁকে পড়ল ওর মুখের উপর।

ইসমাইল ড্রাইভার। হাজরা ট্রান্সপোর্টের লরীচালক ইসমাইল। গলায়দড়ে'র জঙ্গলে মরতে এসেছিল ঠিক তারই মত।

কেন, কেন মরতে এসেছিলি? অবনী ফুঁসে ওঠে ফের। দুহাতে ওর গলাটা চেপে ধরে পাগলের মত। বারবার বলে, কেন, কেন? ওরে শুয়ার পাজী হারামজাদা।

ইসমাইলের মুখে অল্প জ্যোৎস্না পড়েছে। চোখ দুটো চকচক করছে। সে ঘড়ঘড় করে বলে, অবনীবাবু? মধুপুরের অবনীবাবু। তুমি কেন এখানে?

অবনী একটু চুপ করে থেকে বলে, বাঁচতে আমার ভাল লাগে না।

আমরও। ইসমাইল জবাব দেয় পরক্ষণে তার দাঁতে জ্যোৎস্না জ্বলে ওঠে।···অবনীবাবু, আমার কলজেয় আঘাত লেগেছে। মরে আমি যাবই। কিন্তু আফশোষ, নিজের জান নিজে লিতে পারলাম

না তুমি নিলে অবনীবাবু।

আমি। আর্তনাদ করে ওঠে অবনী।

হ্যাঁ, তুমি। আর দেখ অবনীবাবু, আমি জানোয়ারের মত ন্যাংটা হয়ে আছি। জানটা চলে গেলে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিও।

অবনী বলে, আমিও উলঙ্গ ইসমাইল।

ইসমাইল গোঙানির মধ্যে বলে, কেন উলঙ্গ হয়ে আছ অবনীবাবু? তুমি তো মরবে না!

মরব। অবনী হাঁফাতে হাঁফাতে বলে। মরব ইসমাইল! কিন্তু তুমি কেন মরতে চেয়েছিলে?

ইসমাইল কী বলতে চেষ্টা করে। পারে না। হঠাৎ মুখটা একপাশে বেঁকে যায়। ফোঁস করে একটা প্রশ্বাস বেরিয়ে যায় তার। শেষ প্রশ্বাস। অবনী তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেহের জন্যে তার দেহ নিঃশব্দে কাঁদে। শিশুর মত কাঁদতে থাকে।

ফের অবনী পালাচ্ছিল। খড়ের মাঠ পেরিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। আকাশ ভেঙে রোদের প্লাবন আসছিল। নরম রোদের রঙমাখা গা নিয়ে অবনী দৌড়াচ্ছিল তাড়াখাওয়া জন্তুর মত। পিছনে জঙ্গলের বটের নীচে ইসমাইল ড্রাইভারের লাস পড়ে আছে। হাইওয়েতে লরী রেখে সে সম্ভবত ওখানে চলে এসেছিল। সঙ্গে এ্যাসিস্ট্যান্ট থাকলে সে এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নাকি খুঁজে বেড়াচ্ছে ড্রাইভারকে বনবাদাড় ভেঙে? জোর বেঁচেছে অবনী।

জীবন বিষিয়ে উঠলে মানুষ মরতে যায়। সুষমা তার জীবনকে বিষিয়ে দিয়েছে। সুষমাকে ঘৃণা করে সে মরতে এসেছিল।

এখন ফের সুষমাকে ঘৃণা করে সে বাঁচতে চাচ্ছে?

তাই কি? হঠাৎ অবনী থামল। ঘৃণা না ভালবাসা? সুষমাকে ঘৃণা? ঘৃণা যদি, কেন এই ছুটে পালানো? কেন উলঙ্গ শরীর ফের ঢেকে রাখা?

সেই রাখালগুলো গরুর পাল নিয়ে ধুলো উড়িয়ে আসছিল। সেই পাতাকুড়ো ফের। অবনীকে দেখে সে হাসছে। কি গো মশাই, জল পেয়েছিলেন?

অবনী হাসবার চেষ্টা করে। পেয়েছিলাম।

পাতকুড়ো বলে, আজও মাঠে এয়েছেন দেখছি। কেনে গো?

অবনী শান্তভাবে বলে, আমার ভাল লাগে রে, তাই

এখানে আসি।

কিন্তু খবর্দার মশাই, পাতকুড়ো চোখ বড় করে বলে, খারাপ মন নিয়ে উদিকে যাবেন না!

যাবো না।

কাল কিন্তু আপনার মন ভালো ছিল। দলপতি রাখাল মন্তব্য করে।

কেন রে?

বেঁচে আছেন, তাই বলছি।

হাসতে হাসতে অবনী হাঁটে। নীল ট্যাসকোনার ডানা সে পেয়ে গেছে, এমনিছেলেবেলার বিহ্বলতায় সে প্রায়নাচতে নাচতে এগিয়ে যায় নদীর দিকে। পিছনে তৃণভূমির দিকে মিশে যায় রূপকথার রাখাল ছেলেরা। তাদের কথার প্রতিধ্বনি চারপাশে ছড়িয়ে যায় —বেঁচে আছেন. বেঁচে আছেন, বেঁচে আছেন।

কিছুক্ষণ পরে।

সামনে পায়ে চলা পথ খুঁজে না পেয়ে অবনী সোজা কাশবনের ভিতর ঢুকে পড়েছিল। পরক্ষণে তার মনে হল, পায়ে কী একটা জড়িয়ে ধরেছে, ভীষণ ঠান্ডা। তীব্র একটা জ্বালা হঠাৎ বিদ্যুতের মত চাকিতে শিরায় ছড়িয়ে পড়েছে।

পায়ের দিকে তাকিয়ে অবনী কাঠ হয়ে গেল। চিত্রিত সোণালী সাপ, ফনায় নীলাভ আলপনা। আঃ আঃ…অবনী অস্ফুট বলে উঠল, আঃ আঃ।

সামনে সকালের রোদে ঘাসের বন অল্প বাতাসে কাঁপছিল। ক্রমশঃ সব স্থির হতে থাকে ছবির মতন। সবকিছু ধূসর হয়েআসে। আকাশজোড়া ট্যাসকোনা পাখীর নীল রেশমী পালকের প্লাবন দেখতে দেখতে অবনী শুয়ে পড়ে শুকনো খড়ের উপর। পৃথিবী একটু করে মুছে আসে। জেগে থাকে শুধু সুনীল শূণ্যতা। নাকি শূণ্যতা নয়, ট্যাসকোনা পাখীর নীল রেশমী পালকে আঁকা একটা মুখ। সম্ভবত ঈশ্বরের মুখ।

মৃত্যুর আগে সবাই ঈশ্বরকে দেখতে পায়।

বেঙ্গমি বলে, ও বুড়ো! জেগে আছ কি!

বেঙ্গমা বলে, আছি।

ছেলেটা আসছে।

মেয়েটা ?

আসবে'খন। না এসে পারে ?…

ধনুকবাঁকা ঝিলের ধারে বিশাল এক বটের গাছ। অজস্র ঝুরি নামিয়ে শেকড়বাকড় ছড়িয়ে মাটি আঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে : চারদিকের ডালপালায় স্বাধীনতার ব্যপ্তি। এই চৈত্রে চিকন পাতাগুলি আবহমণ্ডল থেকে কার্বনকণিকা শুষে নিচ্ছে ফোটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়ায়। আর এ গাছেই বাস করে দুই আদ্যিকালের পক্ষী।

পুরাবিদ স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এই বটতলা থেকেই কুড়িয়ে নিয়ে যান নাকভাঙ্গা মৌর্যযুগের বুদ্ধমূর্তি। এখনও টুকরো-টুকরো পাথর আটকে আছে শেকড়ের তলায়। এখানে-ওখানে ছড়ানো লাইমকংক্রিটের চাপড়ায় বসে ক্ষেতমজুররা দিন-দুপুরের জিরেন এবং পান্তা খায়। গুঁড়ির ভেতর খাঁজে-ফোকরে আরও চাপ-চাপ লাইমকংক্রিটের চাপড়া বেয়ে আঁকাবাঁকা একটি ঢেমনা সাপ একবার ওপরে একবার নিচে জ্বলজ্বলে চোখে কিছু খোঁজে। কিছু ভেবে কুল পায় না, উঠবে নাকি নামবে। কখনও সে দারুণ চমক খেয়ে কোটরে লুকিয়ে পড়ে। তীরধনুক নিয়ে ওই এগিয়ে আসে কষ্টিপাথরে গড়া এক মানুষ। অতি নিঃশব্দ তার হাঁটাচলা। হঠাৎ ঝুঁকে সে কুড়িয়ে নেয় আধপোড় ফিল্টার-টিপ্‌ড্‌ একটি সিগারেট। আনমনে ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুলের ভেতর কানের ওপরদিকটায় সেটা গুঁজে রাখে। তারপর মুখ তুলে ডালপালার ভেতর পাখি খোঁজে। কিছুক্ষণ পরে হতাশ সেই কষ্টিপাথর মানুষটি নিচের ঝিলের দিকে নেমে যায়। ঝিলের ধারে-ধারে হাঁটতে থাকে। ঝিলের জলে শাকতোলানি মাছধরুনি

মেয়েদের ভিড় দিনমান। আকলুর মেয়ে গৈরবা, গরবিনীকে বাংলার ছয় ঋতুর জলকাদারোদবৃষ্টিশীত এভাবেই অপভ্রষ্টা করে ফেলেছে, হাঁসের মতো ডুবে-ডুবে গুগলি তোলে। রাতকানা বাপকে সে রোজ গুগলির ঝোল খাওয়াবেই। এদিকে তার রাতকানা বাপের স্বভাব, বিকেল হলেই ঠুকুস্ ঠুকুস করে খেয়াজাল আর খালুই হাতে ঝিলের দিকে আসবেই। তখন গৈরবা স্টেশনবাজারে হারাধনবাবুর বাড়ি কোমরে আঁচল বেঁধে দুপুরের এঁটো থালাবাসন মাজছে। বাড়ি ফিরতে ঝিলের ওপারে বাবলাবনের কাঁধে নাদুসনুদুস চাঁদবাবুর দেখনহাসি রূপ। ঝিকমিকোচ্ছে ঝিলের জল জ্যোস্না-গুঁড়ো মেখে। ঝপাস করে ব্যর্থ শেষ জাল ফেলে আকলু বলে, ধুস শালা! রাতকানা মানুষ বটে, ঝিলের তল্লাটে ইঞ্চি-ইঞ্চি মাটি মুখস্থ তার। পাড় বেয়ে ঠিকই ওপরে উঠে যায় এবং সঠিক পা ফেলে সঠিক দিকেই হাঁটিতে হাঁটিতে বাড়ি ফেরে। রাতকানা হওয়ার পর তার বাড়তি একটি ইন্দ্রিয়ের আঁকুর গজিয়েছে। জীবজগতের খুব ভেতরদিকের. এমন কী জীবনমৃত্যুর সীমান্তরেখাটিও তার চেনা হতে চলেছে। এক নতুন মানচিত্র তার সামনে যাচ্ছে খুলে। সাপের মতোই মাটিতে পায়ের শব্দের স্পন্দন প্রতিধ্বনিত হয় তার ওই অতীন্দ্রিয়জাত বোধে। সে হাঁক দিয়ে, কে যায় গো ?

আমি।

চাপা, রুক্ষ, বিরক্ত এই শব্দটি রাতকানা লোকটিকে কোমল ও বিনীত করে। সে গোপনে হেসে বলে, ছোটবাবু নাকি ? সনজেবেলা চললেন কতি গো ছোটবাবু ?

যেখানেই যাই, তোমার কী ?

আকুল ধীবর অভিমানে চুপ করে যায়। আবার ঠাহর করে পা ফেলে! চষা মাটির চাঙ্গড়ে কদিন আগেকার এক কালবোশেখি একটুখানি বর্ষে গেছে। তাই মুখিয়ে উঠেছে হাতিশুঁড়ো, কুকুরশুঁকো দুব্বোঘাসের ছানাপোনা। থপথপিয়ে পা ফেলে অভিমানী ধীবর ভিজে জাল আর খালি খালুই হাতে বাড়ি ফেরে।

আর বাড়ি ফিরেই গৈরবার মুখোমুখি পড়ে বকা খায়। মরবে, তুমি মরবে। হয় কালে ডংশাবে, নয়তো ভূতপেরেতে ঘাড় মটকাবে।

আমোদিনীও গালমন্দ দেয় মরদকে। শেষে বলে, স্বভাব! স্বভাব যাবে কতি ?

আকলু গ্রাহ্য করে না। খ্যা খ্যা করে হাসে। তা মরণ যখন আসবে। তবে কথা কী, লোচনবাবুর ছেলেটা উদিকে কতি যায়, বুঝি না। পেরায় সনজেবেলা দেখি বুড়োতলাবাগে যাচ্ছে।

গৈরবা আস্তে বলে, যে-যেখানে যাক, তুমার কী ? মুখে খিল এঁটে বসে থাকো দিকিনি।

তবু আকলু বলে, বড় খটকা লাগে।...

সুবচনী দাওয়ার কোণায় উনুনে শুকনো পাতা ঠেলে দিচ্ছিলেন। টগবগিয়ে ভাত ফুটছিল এনামেলের হাঁড়িতে। রোজ রাতে রুটিই খাওয়া হয়। নেহাত কোনও রাতে দিনের বাড়তি ভাত। আজ দুপুরে কাটোয়া থেকে দেওর অবনী হাজির। শিউলির জন্য আবার পাত্র ঠিক করেছে। দেওয়া-থোওয়ার বালাই নেই। মেয়ে পছন্দ হলেই তুলে নিয়ে যাবে।

অবনীকে তার বিশ্বাস হয় না সুবচনীর। এই তিন তিনবার কথা আনল। কিন্তু কোথায় কী ? আসলে কুরুখন্ডীতে আপিসের কী কাজে এসেছিল। মা-মেয়ের অন্নে ভাগ বসিয়ে গেল। আর খায়ও বটে অবনী। বলে গেছে সন্ধ্যাবেলা, রাত্তিরে আজ ভাত চাই মা। আলুভাত তো আলুভাতই !

সন্ধ্যার দিকে একটা টিউশনি জুটিয়েছে শিউলি স্টেশনবাজারে। দিনকাল খারাপ। তার ওপর এই পাড়াটায় বিদ্যুৎ জোটেনি। জীর্ণ একতলা দালানবাড়ি আর মাটির ঘরে ঠাসা। ফাঁকে-ফোঁকরে পোড়ো ভিটের আগাছার জঙ্গল। মেয়ের জন্য মাঝে মাঝে উদ্বেগ বোধ করেন সুবচনী। কিন্তু বললেই তো বলবে, টর্চ আছে না ?

টর্চের আলোয় সামনেটা দেখা যায়। পেছনে কী আছে কেমন করে দেখতে পাবে শিউলি ! কিন্তু ওকে কিছু বলতেই আজকাল ভয় পান সুবচনী। দিনে-দিনে তার মেজাজ কেমন রুক্ষ হয়ে উঠেছে। টিউশনির টাকায় সংসার চালাচ্ছে বলেই কি এমন মেজাজ হবে মেয়ের ? ওর বাবা ছিলেন প্রাইমারি শিক্ষক। বড্ড তক্কবাজ মানুষ ছিলেন পাঁচুগোপাল। তেমনি জেদী আর রাগীও। এতকাল পরে মেয়ের মধ্যে যেন বাবার সেই খর মেজাজটি জেগে উঠেছে।

ভাঙ্গা পাচিলের আব্রু ঢেকেছে যে-বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি, তার ওপর ফিকে জ্যোৎস্না এসে ধাক্কা দিল। সেইদিকে তাকিয়ে গা ছমছম করল সুবচনীর। এখনও শিউলি ফিরছে না কেন ?…

বেঙ্গমি ডাকে, বুড়ো! জেগে আছ কি ?

বেঙ্গমা বলে, আছি।

মেয়েটা আসছে।

কৈ দেখি! দেখি!…

বরুণের সিগারেটের আগুন জ্বগজ্বগ করছিল। দূর থেকে দেখে শিউলি মিটিমিটি হাসে। চমকে দেবে নাকি সেদিনকার মতো ঝুরির আড়াল থেকে ? পরে ভাবে, থাক। ভূতপেরেতের ভয় না মেনে বুড়োতলায় তার জন্য এমন করে যে এসে অপেক্ষা করে, তার সঙ্গে জোক করা ঠিক নয়। ভয় তো প্রথম-প্রথম শিউলির করত। তারপর কেটে গেছে। সন্ধ্যারাতের মাঠ পেরিয়ে ঝিলের ধাবে বুড়োতলায় আসতে তার একটুও গা বাজে না। বরং কী এক আবেগ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় বটগাছটির দিকে। সে অভিসারিকা। অভিসারিকারা রাতবিরেতে ভয় পায় না।

হালকা জোৎস্নায় ছায়ামূর্তিটি দেখে বরুণ সিগারেট ঘষটে নিভিয়েছে। ছায়ার দিকে সরে গেছে একটুখানি। তারপর সে চিনতে পারে। সাড়া দিয়ে বলে, কী ? এত দেরি যে ?

শিউলি বলে, স্টেশন ঘুরে এলাম।

কেন ?

রোজ এক রাস্তায় আসি আর আকলুবুড়োর চোখে পড়ি! বুঝেও না বোঝার ন্যাকামি করো খালি!

ধুস। ও ব্যাটা রাতকানা জানো না ?

শিউলি এদিক-ওদিক তাকিয়ে গুঁড়িব পেছনদিকটায় যায়। সেখানে গাঢ় ছায়া। বলে, কী হল ? এখানে এস।

তোমাকে দেখতে পাব না ওখানে। মনে হবে অন্য কেউ।

বরুণ ছায়ায় ঢুকে শিউলির মুখোমুখি দাঁড়ায়। শিউলি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, অন্য কেউ! তাহলে অন্য কেউও আছে তোমার ?

ধুস! তুমি মাইরি জোক বোঝো না। বরুণ প্রেমিকের গলায়

ফের বলে, চাঁদের আলোয় তোমাকে দেখলে দারুণ লাগে। বিলিভ মি—মাকালীর দিব্যি!

সে তার প্রেমিকাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। একটুখানি ছটফটানির পর প্রেমিকাটি শান্ত হয়। প্রেমিকের চুম্বন গ্রহণ করে। তারপর আস্তে বলে, বসো এখানে। দুষ্টুমি কোরো না।

প্রেমিক তার প্রেমিকাকে দু' হাতে তুলে নেয়। নগ্ন শক্ত শক্ত মাটিতে শুইয়ে দেয়। প্রেমিকা বলে, আঃ! পিঠে ব্যথা করছে।

প্রেমিক বলে, চুপ! এখন কথা বলে না।

আমি বলব। আমার অনেক—অনেক কথা আছে বলার।

মনে-মনে বলো। আমি মনে-মনে শুনি।...

বেঙ্গমি বলে, লজ্জা করে না উঁকিঝুঁকি মারতে? সরে এস দিকিন।

বেঙ্গমা বলে, বুড়ো হয়েছি। আজকাল তত নজর চলে না।

বেঙ্গমি আনমনে বলে, আমার এ পোড়া চোখের দোষ!

কেন গো?

মেয়েটাকে দেখি, আর খালি ভাবি এ কাকে দেখছি!

কাকে বলো তো?

তোমার বড় ভুলো মন! মনে পড়ে না সেই ঘুটেকুড়ুনি মেয়ে আর রাজপুত্তুরের কথা?

বেঙ্গমা শ্বাস ফেলে বলে, হুঁ।...

নিচের ঘরে একটি কালার টিভি ঘিরে মৌমাছির মতো ঝাঁক। কাছের সদর শহরে রিলেসেন্টার বসেছে। তবে কলকাতা আসে না। সটান দিল্লি এসে ঝলমলায়। ইংরিজি বকবকানি থাকলেই চ্যানেল পাঁচে ঢাকা এসে পড়ে। বাংলা গান শোনো প্রাণ ভরে। ইংরিজি ছবি দ্যাখো। কথাবার্তা না বুঝলেও কান্ডকারখানা দেখে তাক লেগে যাবে।

ওপরের ঘরে লোচনবাবু সিগারেট টানছিলেন। সামনে ইতিহাসের শিক্ষক এবং শ্যালক ভবচরণ। তাঁর হাতেও সিগারেট।

খাটের ওপর বসে আছেন গৃহিণী অনুপমা। পা দুখানি ঝুলন্ত এবং স্থির। কচরমচর করে পান চিবুচ্ছেন। দাদার দিকে

সপ্রশংস চাউনি। পায়ের তলা দিয়ে গলিয়ে এসে নাদুসনুদুস বেড়ালটি তুড়ুক করে খাটে উঠলে অনুপমা তাকে আদরে কোলে নিলেন। তার কোমল পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে কী একটা বললেন স্বামীর উদ্দেশে। কথাটায় কান করলেন না স্বামী।

শ্যালক বললেন, মেয়েটা গ্র্যাজুয়েট। বাবার একমাত্র সন্তান। ব্যাপারটা বুঝলে তো?

ভগ্নীপতি হাই তুলে বললেন, রাধুউকিলকে আমি চিনি না ভাবছ নাকি?

তাহলে আর কথা কী?

আছে।

অনুপমা মুখ বাঁকা করে বললেন, ঠং! অর্থাৎ ঢং।

লোচন বিরক্ত হয়ে বললেন, পিন্টু যে স্কুলফাইনাল। তারওপর এ পাড়া গাঁয়ে--

কথা কেড়ে ভবচরণ বললেন, কুরুখন্ডী আর পাড়গাঁ আছে? আর স্কুলফাইনাল-টাইনাল কথা নয়। রাধুবাবু রাজি। আসলে একটুখানি খুঁত, গায়ের রঙ। নাকমুখের গড়নও চমৎকার। তবে তার চেয়ে বড় কথা, রাধুবাবুর কয়েক লাখ টাকার সম্পত্তি—সবই পিন্টু পাবে। টাউনে তিন-তিনখানা বাড়ি। গঙ্গার ধারে নতুন যে বাড়িটা করেছেন, দেখলে মনে হবে লন্ডন না প্যারিস।

লোচন অট্টহাসি হেসে বললেন, তুমি খালি—

খালি নয়। ক্ষুব্ধ ভবচরণ বললেন। খালি-টালি ছাড়ো তো তুমি। ফোটো তো দেখলে মেয়ের। কী অনু, মেয়ে দেখতে খারাপ?

বালো—কুব বালো। অনুপমা বললেন। ডাগর বেড়ালটি এবার ঝুপ করে লাফিয়ে গিয়ে লোচনের পায়ের ফাঁকে বসল।

লোচন বললেন, পিন্টু কী বলছে শুনেছ নাকি? দেখিয়েছ পিন্টুকে?

ভবচরণ বললেন, দেখিয়েছি। বলেছে, ভেবে দেখবে। তবে ওর দায়িত্ব আমার।

দ্যাখো ভবদা—লোচন আস্তে বললেন, আমার কেন যেন সন্দেহ হয়।

কী কী, ঝুঁকে এলেন ভবচরণ।

মানে—পিণ্টুর ভাবগতিক ভাল ঠেকছে না।

কেন, কেন ?

কেমন যেন…ঠিক বোঝাতে পারলেন না লোচন। গলার ভেতর বললেন, কী একটা…

টামো। গৃহিণী গর্জন করলেন। মুখ থেকে পানের কুচি ছিটকে পড়ল। অধরোষ্ঠ হাতের চেটোয় মুছে ফের বললেন, ঠবটাটেই টোমার ঠন্দ।

রুষ্ট কর্তা বললেন, আগে মুখের ভেতর থেকে আবর্জনাগুলো ফেলে এসে কথা বলো দিকি। কী বলে ঠ ঠ করে।

গৃহিণী হেসে ফেললেন। তারপর ধুপসধাপুস শব্দে মোজেক-করা মেঝেয় শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন। মুখের আবর্জনা ফেলতেই গেলেন।

ভবচরণ ভুরু কুঁচকে চাপা স্বরে বললেন, পিণ্টু কোথাও প্রেমট্রেম করছে নাকি ?

লোচন শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, আই ডাউট।

মেয়েটি কে জানতে পেরেছ ?

বেড়ালটিকে প্রায় লাথি মারার ভঙ্গীতে হাটিয়ে লোচন ফিস-ফিসিয়ে বললেন, গেনু—আমাদের গেনু আর কী। বুঝেছি। বলো।

গেনু বলছিল, ছোটবাবু রোজ সন্ধ্যাবেলা বুড়োতলায় যায়।

বেশ তো। তাতে কী হয়েছে ?

তুমি চিনতে না। পাঁচুমাস্টার—মানে পাঁচুগোপাল ছিল আমার ক্লাসফ্রেণ্ড। প্রাইমারি টিচার ছিল। বছর দুই আগে স্ট্রোকে মারা গেছে। তার একটি মেয়ে আছে। দেখত-শুনতে মন্দ না ; সেও স্কুলফাইনাল পাশ। খুব শার্প বুদ্ধিসুদ্ধিতে।

কাস্ট ?

লোয়ার কাস্ট। সে ব্যাপারে গণ্ডগোল তো আছেই, তাছাড়া তোমার বোনকে তো চেনো।

অনু জানে ?

মাথা খারাপ ? ওকে বলতে গিয়ে হিতে বিপরীত হোক।

ভবচরণ একটু ভেবে বলেন,কাস্ট-ফাস্ট আজকাল অবশ্য ফ্যাক্টর নয়। কিন্তু অবস্থা ?

বুড়ো আঙুল নাড়েন লোচন। সেদিকে ঢু ঢু। রোজ দেখি, আমাদের বাগান থেকে পাঁচুর বউ শুকনো পাতা কুড়িয়ে জড়ো করছে। বুঝলে না? কয়লার পয়সাও জোটে না।

ভবচরণ নড়েচড়ে বসেন। শক্ত মুখে বলেন, তোমার ঘরে তিন-তিনটে মেয়ে। খেয়াল আছে? তাদের বেলায় কে স্যাক্রিফাইস করবে, বলো? ব্যবসাতে লস খেয়ে তো ফতুর হতে বসেছিলে। সন্টু পঁয়তাল্লিশ হাজার নগদ এনে দিল—এই শর্মার জোরে। নয় কী না বলো?

তুমি ঠিকই বলেছ ভবদা।

এখন তোমার পেট্রল পাম্প, ময়দাকল, ধানকল—আবার শুনলাম সন্টু বলছিল, ঘানিকলও বসবে।

লোচন ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলেন, তুমি একটু বোঝাও না পিন্টুকে। আমার খালি ভয় করে, ভেতর-ভেতর রেজিস্ট্রি করে থাকলে তো কেলেঙ্কারি।

দেখছি। ভবচরণ আশ্বাস দিলেন। মুখটা বেজায় গম্ভীর। ফের সিগারেট ধরালেন। নেতাজির ছবির দিকে দুটি জ্বলজ্বলে চোখ।...

বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি রাতের হাওয়া আর জ্যোৎস্নায় ভূতে পাওয়া এলোকেশী মেয়ের মতো দুলছে আর দুলছে। দাওয়ায় বসে সুবচনী প্রতীক্ষা করছিলেন মেয়ের। বাড়ি ঢুকতেই ক্ষীণ-স্বরে বলেন এত রাত করে রে?

শিউলি জবাব দেয় না। কুয়োতলায় যায়। ঢনঢন শব্দে বালতি নামায়।

সুবচনী বলেন, কেন! ভুটুবাবুকে বলে সকালবেলায় টিউশনির ব্যবস্থা করতে পারিস নে?

শিউলি জলের শব্দে কণ্ঠস্বর মিশিয়ে বলে, প্রাইমারি সেকশন মর্নিং-এ জানো না?

সুবচনী চুপ করে থাকেন। উঠোনে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে তারে ভিজে শাড়ি মেলে দিচ্ছে শিউলি নজরে পড়লে অবাক হয়ে বলেন, চান করলি নাকি?

নাঃ। পিচরাস্তায় জলকাদা জমে আছে। ট্রাকের চাকা থেকে—

ড্রাইভারগুলো আজকাল বড্ড···টুকরো-টুকরো সব বাক্য। শায়া-ব্লাউজ-পরা শিউলি দৌড়ুনোর ভঙ্গীতে ঘরে ঢোকে। ঢোকার সময় দাওয়া থেকে লণ্ঠনটিও নিয়ে যায়।

একটু পরে শাড়ি বদলে বেরোয়। বলে, কাদায় ভূত করে দিয়েছে একেবারে। সব কাচতে হবে। সায়াটাও।

সুবচনী বলেন, কুয়োতলায় ভিজিয়ে রাখ বরং। সকালে কেচে দেব'খন।

শিউলি ফের কুয়োতলায় যায়। সুবচনী জানেন. মেয়ের যা জেদ। কথা নাবাড়ানোই ভালো। তবে পিচরাস্তার অবস্থা কী হয়েছে স্বচক্ষে দেখেছেন। কদিন আগে কালবোশেখি এসে ঝরঝরিয়ে গেছে। খানাখন্দ জলকাদায় ভর্তি। ওদিকে তাহের কণ্ট্রাক্টার জিপ হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে। ওই রাস্তা তারই তৈরি। তাহেরের বাবা ছিল চাষাভূষো লোক। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। কিন্তু অমন ঘরের অমন ছেলের রাতারাতি আঙুল ফুলে কী করে কলাগাছ হল, ভেবেই পান না সুবচনী। শিউলির বাবা বলতেন, তাহের পয়সা করেছে আসলে স্টেটরিলিফের সময়। পেমাস্টার হয়েছিল: ভুয়ো নামে চাল-গম বিলি হত। সেই চাল-গম রাত্তিরে ট্রাকে করে চালান যেত। স্বচক্ষে দেখেছি।

শিউলি শাড়ি ব্লাউজ মেলে দিচ্ছিল জ্যোৎস্নায়। বুড়োতলার মাটি এত ভেজা ছিল বুঝতে পারেনি।

সুবচনী বলেন, আয়। ভাত বাড়ি।

কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না মা।

সে কী? দরুণ চমকে ওঠেন সুবচনী। তুই-ই তো বলে গেলি রাত্তিরে আজ ভাত খাবি।

ভুটুবাবুর বাড়ি আজ কী যেন ব্রত-টত ছিল। একগাদা লুচি-আলুরদম, দুটো রসগোল্লা—মা. তুমি খেয়ে নাও। লক্ষ্মীটি।

তুই অন্তত দুমুঠো মুখে দে।

উঁহু! অম্বল হবে। একে তো অম্বলের ঠ্যালায় অস্থির। রোজ একগাদা করে অ্যাণ্টাসিড খাচ্ছি।

সুবচনী দাওয়ার কোণা ঘিরে তৈরি রান্নাঘরে ঢোকেন। লম্ফের দম বাড়িয়ে দেন। মেয়েটা অম্বলে ভুগছে কিছুদিন থেকে। গতকাল দুপুরে কুয়োতলায় ওয়াক তুলছিল।

অন্ন মুখে তুলে চিবুতে গিয়ে কিছুক্ষণ থেমে থাকেন সুবচনী। হঠাৎ—খুবই হঠাৎ মনে হয়, মেয়ের মধ্যে কী একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন চোখে পড়ছে যেন। সবসময় আনমনা ভাব। ঠোঁট কামড়ে ধরে বারবার। আজ সকালে খিড়কির ডোবার ধারে একলা বসে ছিল। ডাকলে মুখটা একটু ফেরাল। চোখের ভুলই কি? চোখ ভিজে মনে হচ্ছিল।

হয়তো বাবার কথা মনে পড়েই কাঁদে। সুবচনীর মায়ের মন হু হু করে ওঠে। অন্ন রোচে না। আঁচিয়ে এসে দ্যাখেন, লণ্ঠনের দম কমিয়ে তক্তাপোসের বিছানায় শুয়ে আছে পাশ ফিরে।

সুবচনী আস্তে বলেন, ট্যাবলেট নেই? অম্বল বোধ করলে—

সুবচনী থেমে যান। শিউলির পিঠটা কাঁপছে। দম-কমানো লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট বোঝা যায়। পাশে বসে পিঠে হাত রেখে বলেন, কী হয়েছে মা?

অমনি মেয়েটা ঘুরে মায়ের ঊরুর ওপর মাথা কোটে।...

বেঙ্গমি বলে, ও বুড়ো! ঘুমোলে নাকি?

বেঙ্গমা বলে, নাঃ।

বুঝলে কিছু?

কী বুঝব? বুঝেই বা লাভ কী?

মেয়েটার পেটে বাচ্চা এসেছে।

সে কী কথা?

ন্যাকামি কোরো না তো! অতক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি হল, কানে ঢোকে নি?

বড্ড হাওয়া দিচ্ছে আজ।

চোতমাসে হাওয়া দেবে না রাতবিরেতে? তবে কথা কী, আমার কান মেয়ের কান।

কী বলছে ছেলেটা?

কী সব ইংরিজি বলছে, বুঝতে পারিনি। লোকেরা বড় খটমটো কথা বলে আজকাল।

তাহলে চুপ করে থাকো।

পারছি না গো! আমার বড় জ্বালা যে!

কেন গো?

মেয়ে হলে বুঝতে। তুমি যে পুরুষ।…

ঝিলের দিক থেকে আবার ছুটে আসে চৈত্ররাতের হাওয়া। জ্যোৎস্নাগুঁড়ো মেখে ঝলমল করে ঝিলের বুক। চাঁদ এখন বুড়োবটের কাঁধের ওপর। ওপারের ভরাটচর জমিতে বাবলা আর হিজলের জঙ্গল। সেদিকে কোথাও ডেকে ওঠে এক নিঃসঙ্গ হট্টিটি পাখি—টিট্টি টিট্টি টিট্টি…টিট্টি টিট্টি টিট্টি! বেঙ্গমী চাপা শ্বাস ছেড়ে বলে, বোকা মেয়েটা!…

ভবচরণ ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন। স্টেশনের নির্জন ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে পুবের মাঠের দিকে তাকিয়ে বলেন, ঝিলে আজকাল আগের মতো হাঁসটাঁস আসে?

বরুণ আনমনে বলে, নাঃ!

ভবচরণ শহরের স্কুলে ইতিহাসের শিক্ষক। উদাত্ত কণ্ঠস্বরে বলেন, প্রাচীনযুগে গঙ্গা ওখান দিয়ে বয়ে যেত। ঝিলটি তারই স্মৃতিচিহ্ন। বুঝলে তো?

বরুণ ঝুঁকে সমান্তরাল রেললাইন দ্যাখে। কথা বলে না।

ইতিহাসের শিক্ষক বলেন, স্যার আলেকজান্ডার ক্যানিংহামের নাম শুনেছ? বিরাট পণ্ডিত ছিলেন। আমার লেখা এই জেলার ইতিহাস বইখানি অন্তত পাতা উল্টে দেখো। এই গ্রামের নাম ছিল কুলখাঁড়ি। সবে রেললাইন পাতা হয়েছে। স্টেশনের নামও দেওয়া হয়েছে কুলখাঁড়ি। স্টেশনমাস্টার ছিলেন এক অ্যাংলো সায়েব—তখন বলা হত ইউরেশিয়ান। তো সেই সায়েবেরও খুব হিস্ট্রির বাতিক ছিল। তাঁর কাছে খবর পেয়ে ছুটে এলেন স্যার অ্যালেকজান্ডার ক্যানিংহাম। তিনিই অনেক স্টাডি করে বললেন, কথাটি আসলে কুরুখণ্ড—অপভ্রংশে কুলখাঁড়ি: র ল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

হাহা করে হাসেন জেলার ইতিহাস লেখক। ফের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলেন, ইদানীং শুনছি গঙ্গার মজাখাতের ওপারে নাকি বুনোকুলের জঙ্গল ছিল। আর খাড়ি নাকি খাত। সেই থেকে কুলখাঁড়ি। তাছাড়া রাঢ়ের লোকের সব তাতেই চন্দ্রবিন্দু বসাতে সিদ্ধহস্ত। হাঁসপাতাল বলে, জানো তো? ভাগ্যিস, ইতিহাঁস বলে না!

বরুণ দেখতে পায়, দূরে কালো হয়ে একটি ট্রেন বা মালগাড়ি আসছে। কালো বৃত্তাকার গতিশীল বস্তুটিকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখে তার গা ছমছম করে। সে কথা বলে না।

ইতিহাসের শিক্ষক জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলেন, আজকাল সব ফোক-স্টাডিওলা জুটেছে। সদ্য গোঁফগজানো ছোকরা। এ'ড়ে তক্ক করে বলে কী জানো? কথাটা কুলখাঁড়িই হবে। আবার জেলা-সমাচার কাগজেও কয়েকটা চিঠি বেরিয়েছে পড়লাম। এক মুসলমান ভদ্রলোক লিখেছেন, আসলে কোন এক পাঠান জায়-গিরদার কুলি খাঁর নামে নাকি নাম। একজন লিখেছে, কথাটা হবে কলুর খাড়ি। কোন এক কলুভদ্রলোক নাকি গঙ্গার ওই মজা খাত ইজারা নিয়েছিলেন নবাববাহাদুরের কাছে। আচ্ছা, বলো তো পিণ্টু, কলুভদ্রলোক কি মজা খাত থেকে তৈলনিষ্কাশন করার জন্য —মানে, খাতে জলের বদলে তেল···খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা!

সেই হাসি ঝড়ের মুখে ছে'ড়া পাতার কুচি উড়ে যাওয়ার মতো উড়ে গেল, ভেসে গেল ছত্রখান হয়ে। কামরূপ এক্সপ্রেস এসে ঢুকল প্ল্যাটফর্মে। ইতিহাসের শিক্ষক তবু দমে গেলেন না। ভাগ্নের কাঁধে স্নেহের থাবা হাঁকড়ে সবকিছু কোলাহল, ওভারব্রিজে কাঠের প্রচণ্ড কম্পন ও স্পন্দন, ধাবমান মানুষজনের ভিড়ের ভেতর স্বকীয়তা ও নির্জনতায় নিজেদের কোণঠাসা করে নিয়ে তিনি কানে ফুসমন্তর দেওয়ার ভঙ্গীতে বললেন, ওটা কুরুখণ্ডীই হবে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর পরাজিত এক পলাতক কুরুরাজপুত্র এখানে এসে বাস করেছিলেন। কুরুরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। যোদ্ধার। জাত। তোমরা সেই ক্ষত্রিয় কুরুকুলজাত। ডোণ্ট ফরগেট দ্যাট। তোমরা ফাইটার বংশ। হাজার-হাজার বছরের ফাইটিং ট্রাডিশান তোমাদের।

বরুণ মুখ তোলে। বিকেলের শেষ উজ্জ্বলতা ওভারব্রিজটিকে হঠাৎ জ্বালিয়ে দিতে থাকে। তার মুখে সেই জ্বালা সেই আক-স্মিক তীব্রতার ঝকমকানি। মামার চোখে চোখ রাখে সে। তার মাথার ভেতর 'ফাইটিং ট্রাডিশন' কথাটি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আর তারপর ইতিহাসবিদ চোখে ঝিলিক তুলে বলেন, কী পিণ্টু? পারবে তো ফাইট দিতে পাঁচুগোপালবাবুর মেয়ের জন্যে?

বরুণ আস্তে বলে, পারতাম। কিন্তু বাবা যদি বা কিছু না বলেন, দাদা কেলেঙ্কারি বাধাবে। দাদা এখন এরিয়ার লিডার। সব গুণ্ডামস্তান ওর হাতে।

আহা, আফটার অল তুমি তার সহোদর ভাই!

বরুণ একটু চুপ করে থাকার পর বলে, শিউলির বাবা দাদার বেপার্টির লোক ছিলেন। দাদার বিরুদ্ধে পিটিশান করেছিলেন। দাদা জানতে পারলে খুব বিপদ হবে মামাবাবু!

হুঁ, তাহলে এটা একটা প্রব্লেম। ইতিহাসবিদ মামাবাবু সমব্যথী কণ্ঠস্বরে বলেন। বাই দা বাই, গোপনে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করোনি তো?

করেছি।

করেছ? ভবচরণ ভুরু কুঁচকে বলেন ফের, কবে করেছ?

গতমাসে।

হুঁ। ভবচরণ ভাগ্নের কাঁধ আঁকড়ে পা বাড়ালেন। সত্য উদ্ঘাটনে সমর্থ হয়েছেন, মনের ভেতরে সেই জয়গৌরব কানায়-কানায় উপচে উঠছে। ভাগ্নেবাবাজি তাঁর ফাঁদে এত সহজে পা দেবে, ভাবতে পারেননি।

আর বরুণ ভাবছিল তাহলে সে ফাইটারবংশ। দেবে নাকি একটা দুর্দান্ত ফাইট? কয়েক পা এগিয়ে ডাকল, মামাবাবু?

উঁ! অন্যমনস্ক মামাবাবু সাড়া দিলেন।

যদি আমি শিউলিকে আপনার বাসায় রেখে আসি?

থমকে দাঁড়ালেন মামাবাবু। গলার ভেতর বললেন, টু রুম ফ্ল্যাটে থাকি। কোনওরকমের ঠাসাঠাসি বসবাস। আমারও বড় প্রব্লেম বাবা! প্রচণ্ড প্রব্লেম-অফ স্পেস।

বরুণ শক্তগলায় বলে, কলকাতা-টলকাতা পালিয়ে যেতাম। কিন্তু তাহলে শিউলির মায়ের ওপর জুলুম হবে! সেই ভেবে সাহস পাচ্ছি না।

ওভারব্রিজ থেকে সিঁড়িতে নামতে নামতে ভবচরণ বলেন, সাংঘাতিক প্রব্লেম! ভেরি—ভেরি ডেঞ্জারাস।

নিচে প্ল্যাটফর্মে নেমে বরুণ বলে, আমি এখন এক জায়গায় যাব, মামাবাবু।

হুঁ।

প্লিজ মামাবাবু, এখনই বাবা-মায়ের কানে যেন কথাটা তুলবেন না!

উঁহু হুঁ হুঁ। ভবচরণ শক্ত মুঠোয় খপ করে ভাগের হাতের কবজি ধরলেন। এর একটা নিষ্পত্তি করে ফেলা দরকার। তুমি এস আমার সঙ্গে।

বলে খ্যা খ্যা করে হাসেন। কুরুবংশ ফাইটার। এস—দেখি, কেমন ফাইট দিচ্ছ!

আশা-নিরাশায় কুরুবংশীয় যুবাপুরুষ মাতুলকে অনুসরণ করে।...

বটবৃক্ষের ডালে বসে বেঙ্গমি ডাকে, ও বুড়ো, ঘুমোলে নাকি?

বেঙ্গমা বলে, জেগে আছি।

মেয়েটা কখন থেকে এসে বসে আছে।

তা তো দেখছি।

ছেলেটা এখনও আসছে না।

আসবে'খন। না এসে পারে?

দোতলার সেই ঘরে বসে হতবাক চারটি মুখ। একটি মুখ ঝুলে আছে, থুতনি গলার খাঁজে গোঁজা। পর্দার পেছনে আরও একজন। কোলে খোকামণি। চাঁদমামা দেখাচ্ছে খোকামণিকে। কিন্তু কান দুটি ঘরের দিকে ওত পেতে আছে।

অনুপমা কচরমচর পান চিবুচ্ছিলেন। কোলে নাদুস বেড়ালটি বারবার ওঠার চেষ্টা করছে। ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন শেষে উচ্চারণ করলেন, ঠণ্টুকে—

লোচন বললেন, চুপ। ওর কানে তুলো না।

ভবচরণ ম্লানহাস্যে বললেন, সণ্টুর চেয়ে প্রব্লেম হল তোমার ফ্যামিলির। তোমাদের রুর‍্যাল সোসাইটিতে এ জিনিস মেনে নেবে না—আই নো দ্যাট ভেরি ওয়েল।

লোচন বললেন, তা আর বলতে?

অনুপমা হাত নেড়ে বললেন, টা না। পাটাকুড়োনির মেয়েকে আমি ঘরে টুলতে ডেব না।

বিরক্ত লোচন বললেন, মুখের রাবিশগুলো ফেলে এসো দিকি।

তাপরে কথা বলো।

সুতরাং হাসলেন অনুপমা। বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বড় বউমা খোকাকে চাঁদমামা দেখাচ্ছে। খোকা কুঁই কুঁই করছে। নিচের উঠোনে মুখের রাবিশ ফেলে ফিস-ফিসিয়ে বললেন, শুনেছ বউমা—পিণ্টু…

জয়া ঝটপট বলল, শুনেছি।

চলো, তোমার ঘরে চলো। সণ্টুকে গিয়ে বলি. একটা বিহিত করুক শিগগির।

শাশুড়ি-বউ বারান্দা ধরে হাঁটতে থাকলেন। পুবদক্ষিণ কোনায় বউমার ঘর।…

এ-ঘরে চুপচাপ তিনটি পুরুষমানুষ। শিলিং ফ্যান চক্কর খাচ্ছে। নিচের ঘর থেকে টিভির হিন্দি গান আবছা শোনা যাচ্ছে।

ভবচরণ সিগারেট অ্যাশট্রেতে ঘষে নেবালেন। বললেন, আমি বলি কী, সিচুয়েশন যখন এমন ক্রিটিক্যাল, তখন ফ্যামিলির স্বার্থে এমন কী নিজের স্বার্থেও পিণ্টু স্যাক্রিফাইস করুক।

বরুণ মুখ তুলল। মামাবাবুর দিকে তাকাল।

মামাবাবু বললেন, তুমি মেয়েটিকে পরিত্যাগ করো পিণ্টু!

লোচন বললেন, রেজিস্ট্রি করে বসে আছে যে হতভাগা।

রাধু উকিল আছে। ভেবো না ভবচরণ আশ্বাস দিলেন। পিণ্টু ডিভোর্সের পিটিশান করুক।

গ্রাউণ্ড?

গ্রাউণ্ড ক্যারেক্টার। মেয়েটি ব্যাডক্যারেক্টার।

হাসলেন লোচন।…কিন্তু তাহলে রাধুবাবু কি আর পিণ্টুর সঙ্গে মেয়ে দিতে চাইবেন?

হুঁউ—চাইবেন।

কী সব বলো ভবদা। বিরক্ত মুখে লোচন বললেন। জেনে-শুনে—

কথা কেড়ে ভবচরণ বললেন, দেবে। কারণ মেয়ের একটুখানি খুঁত আছে—ভেবেছিলাম পরে বলব। এখনই বলে ফেলি। এক-খানা পা একটুখানি—মানে জন্ম থেকেই আর কী!

খোঁড়া?

না—না। খোঁড়া বলতে যা বোঝায়, তা ঠিক নয়। ভবচরণ

তেড়েমেড়ে বললেন, ওই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য লক্ষ বর ওত পেতে আছে! লুফে নেবে। কেন—তা তো আগেই বলেছি। লক্ষপতি লোক রাধু উকিল। শুধু দোষের মধ্যে বড্ড সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক। বড্ড খুঁতখুঁতে। কিন্তু আমার বলতে গেলে বুজম্ ফ্রেণ্ড। সারা টাউনে একমাত্র আমাকেই বিশ্বাস করে। এদিকে পিণ্টুর চেহারা ভাল। একেবারে ফিল্ম হিরোর মতো দেখতে। নিজের ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখো, দ্যাখো!

মামা ভাগ্নের নিচু মুখটিকে সজোরে উঁচু করে ধরেন দুই হাতে। পিণ্টু চোখ দুটো নিচু করে। কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করে। বলতে পারে না।

আর সেই সময় পর্দা তুলে তরুণের আবিভাব ঘটে। রাগী মুখ। নাসারন্ধ্র স্ফীত। ঘড়ঘড়ে গলায় ডাকে, পিণ্টে।

বরুণ শুধু বলে, কী?

তরুণ এসে তার গালে চড় মারে। ভবচরণ ঝটপট মাঝখানে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বলে, কী হচ্ছে সণ্টু। ছিঃ।

'সরে যান মামাবাবু। ওকে আমি মেরে শেষ করে ফেলব।

চড় খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল বরুণ। জোরে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। তরুণ শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে, কালই দুই বেশ্যামাগিকে গ্রামছাড়া না করে ছাড়ছি না।

লোচন বলেন, আঃ। বড্ড বাড়াবাড়ি করিস বাপু তুই। খালি তিলকে তাল—

তুমি থামো। বাবাকে ধমক দেয় ছেলে। বাবা কাঁচুমাচু মুখে বসে থাকেন।

লোচন বড় ভাগ্নের দুই কাঁধ ধরে বসিয়ে দেন খাটের ওপর। চাপা স্বরে বলেন, যা কেলেঙ্কারি হবার হয়েছে। আর মাথা ভাঙলেও তা ঘোরানো যাবে না। মাঝখান থেকে থানা পুলিশ হবে। কেলেঙ্কারিতে ঢিঢি পড়ে যাবে। তার ওপর কাগজওলারা বড়-বড় হরফে খবর ছাপবে: ওয়েস্টবেঙ্গলে এখনও কাস্টিজম? এ কি বিহারমুল্লুক হয়ে গেল? বাবা সণ্টু, মাথা ঠাণ্ডা রেখে এগুতে হবে। তাছাড়া তুমি একজন পলিটিসিয়ান—পলিটিক্সে নেমেছ। সাবধানে পা না বাড়ালে তোমার পলিটিক্যাল কেরিয়ারটিরও বারোটা বেজে যাবে।

পলিটিসিয়ান বড় ভাগ্নের নাকের ফুটো ফুলে-ফুলে ওঠে। ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ে।

অনুপমা ঘরে ঢুকে আর্ত চেঁচান, পিণ্টু অমন করে বেরিয়ে গেল কোথায়? তোমরা দ্যাখো—ওকে আটকাও গিয়ে। কী করে বসবে বাছা আমার ঝোঁকের বশে।

হু-হু করে কাঁদেন ছেলের মা। তাঁর বিজ্ঞ দাদা বলেন, দেখছি। আমি দেখছি ওকে।

ভবচরণ বেরিয়ে যাবার সময় ভগ্নীপতিকেও সঙ্গে নিয়ে যান। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগ্নীপতি ভারি শরীর বহন করে পেছন-পেছন হাঁটতে থাকেন।

রাস্তায় গিয়ে ভবচরণ বলেন, তোমাদের সেই পাঁচুবাবুর বাড়ি যাওয়া যাক। দেখি, কিছু নিষ্পত্তি করা যায় নাকি। পিণ্টু সম্ভবত সেখানেই গেল। চলো, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো আমাকে।

সুবচনী দাওয়ায় বসে ছিলেন লণ্ঠনের দম কমিয়ে। লোচন-বাবুর সাড়া পেয়ে চমকে ওঠেন। লোচনবাবুর সঙ্গে এক তাগড়াই চেহারার ভদ্রলোক। হকচকিয়ে বলেন, সুবচনী, কী হয়েছে?

ভবচরণ সহাস্যে বলে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনার। ইয়ে—পিণ্টু আছে নাকি?

সুবচনী আরও অবাক হয়ে বলেন, পিণ্টু? না তো। সে তো আমাদের বাড়ি কখনও আসে না।

লোচন বলেন, কেন মিথ্যে বলছ বাপু।

আপনার দিব্যি দাদা। সুবচনী হাঁসফাস করে বলেন। বিশ্বাস করুন আপনার ছেলে—

কথার ওপর কথা রাখেন ভবচরণ, ঠিক আছে। আমরা একটা ইমপর্ট্যাণ্ট কথাবার্তা বলতে এসেছি আপনার সঙ্গে। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে তো বলা যাবে না।

সুবচনী হঠাৎ শক্ত হয়ে ওঠেন। আস্তে বলেন, আসুন।

দাওয়ায় একখানি কম্বল বিছিয়ে দেন সুবচনী। শ্যালক-ভগ্নীপতি তাতে উপবেশন করেন। পদচতুষ্টয় দাওয়ার নিচে দোদুল্যমান হয়। ভবচরণ একটু হেসে বলেন, আপনার মেয়েকে ডাকুন।

ফ্যাঁসফেঁসে গলায় সুবচনী বলেন, শিউলি তো নেই। ভুটু-

বাবুর বাড়ি টিউশনি করতে গেছে।…

বেঙ্গমি বলে, ও বুড়ো। দ্যাখো, দ্যাখো।

বেঙ্গমা নিচে উঁকি মেরে বলে, কী? ছেলেটা এল বুঝি এতক্ষণে?

বেঙ্গমি ফিসফিস করে বলে, না, না।

তবে কী হয়েছে?

মেয়েটা ইট-পাটকেল কুড়িয়ে জড়ো করছে।

সে কী? কেন বলো তো?

অই মা। পরনের শাড়ি খুলে ইটগুলোন পুঁটুলি করে বাঁধছে যে। আমাব বুক কাঁপছে।

কিছু বোঝা যায় না। কী হচ্ছে বলোদিকি?

দ্যাখো, দ্যাখো। ঝিলবাগে নেমে যাচ্ছে মেয়েটা।

তাই তো।…

বেঙ্গমী শ্বাস ফেলে। বেঙ্গমা শ্বাস ফেলে। চৈত্ররাতের একটা দমকা হওয়া এসে সেই শ্বাসকে মিশিয়ে নেয় নিজের শ্বাসপ্রশ্বাসে। ঝিলের ওপারে হিজলবাবলার ডালপালা বেয়ে এতক্ষণে চাঁদ পৃথিবীর শিয়রে দাঁড়াল। একলা হটিটি পাখিটা ডাকতে লাগল টিট্টি টিট্টি টিট্টি…টিট্টি টিট্টি টিট্টি। ঝিলের জলে জ্যোৎস্নাগুঁড়োর ঝিলিমিলি। আকলু ধীবর কখন বাড়ি ফিরে গেছে। আজ ধীবরবুড়ো গুটি-কতক মৌরালা পেয়েছিল। তার ঘরে আনন্দলহরী।…

বেঙ্গমি বলে ওঠে, ও বুড়ো। জেগে আছ কি?

বেঙ্গমা বলে, আছি। কী হয়েছে?

ছেলেটা আসছে।

অ।

কিন্তু মেয়েটা ইটের পুঁটুলি নিয়ে কোথায় গেল? কেন গেল? আমার বড় ভয় করে গো।

আমারও।…

বরুণ হনহন করে এগিয়ে আসে বুড়োতলায়। চাপা স্বরে ডাকে, শিউলি! কোনও সাড়া পায় না। সে ছায়ার ভেতর ঢুকে পড়ে। শেকড়বাকড়ে ঠোক্কর খেতে খেতে বারবার ডাকে, শিউলি! ও শিউলি। শিউলি একরাতে এমনি লুকোচুরি খেলেছিল। আজ

আর লুকোচুরির রাত নয়। সে বারকতক ডাকাডাকি করে জ্যোৎস্নায় ফেরে। শিউলি তাহলে তার দেরি দেখে বাড়ি ফিরে গেছে। বরুণ আনমনে চাঁদের দিকে তাকায়। শিউলি বলেছিল, ভাবা যায় না ওই চাঁদে মানুষ হেঁটেছে। সত্যিই ভাবা যায় না। শিউলি ঠিকই বলেছিল, হয়তো এ চাঁদ সে-চাঁদ নয়। ঠিকই বলেছিল।

আরেকবার ডাকবে ভাবে বরুণ। ঠোঁট ফাঁক করে। কিন্তু ডাকে না। বরং সোজা শিউলিদের বাড়ি চলে যাবে। ওর মায়ের সামনে সব কথা খুলে বলবে। সে যদি কুরুবংশীয় হয়, সে যদি হয় ফাইটার—কেন ফাইট দিতে ভয় পাবে। আর যদি ভয় পায়, তাহলে মামাবাবুর ওই ইতিহাস মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে।

চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে বরুণের। সিগারেট ধরায়। হঠাৎ কেন বাতাস থেমে গেল। নিসর্গের গভীর থেকে ভেসে আসতে থাকল শ্রুতিপারের সব আশ্চর্য ধ্বনিপুঞ্জ। জীবন্মৃত্যুর সীমান্তরেখা থেকে কেউ কিছু বলার চেষ্টা করছে কি? বরুণ চষা নরম মাটিকে গুঁড়ো করে দিতে দিতে হাঁটতে থাকে।…

গৈরবা এখন স্টেশনবাজারে হারাধনবাবুর বাড়ি দুপুরের এঁটো থালাবাসন মাজছে। ধীবরবুড়ো বউকে পরোয়া করে না। তাছাড়া গত সন্ধ্যায় মৌরালামাছের ঝোল দিয়ে পান্তা খেতে-খেতে আমোদিনী বলেছিল, ঝিলে এখনও বেরৎ-বেরৎ মাছ আছে। রাতবিরেতে ঘাই মারে শোনোনি?

আকলু জাল ফেলে। ঝপাস করে শব্দ হয়। এখানটায় গভীর খাত। দহ হয়ে আছে। কাল সন্ধ্যায় এখানেই মৌরালা পেয়েছিল। ঝিলের জলে দিনশেষের ছায়া। জলমাকড়সা তরতরিয়ে সাঁতার কেটে বেড়ায়। কিন্তু জাল কিসে আটকে গেল যেন। টানাটানি করে বুড়োধীবর। দম ফুরিয়ে যায় জাল টানতে। জালখানি ছিঁড়লে তার কী হবে?

তবু মরিয়া টানাটানি করতে থাকে। একটু পরে জাল গুটিয়ে আসে। এত ভারি কেন বুঝতে পারে না। কিনারায় জাল গুটিয়ে আসতেই একখানি ফিকে হলুদ হাত তার চোখে পড়ে। মানুষের হাত। তারপর কালো চুল একরাশ। আকলু থরথর করে কাঁপে।

জালে মানুষ ধরা পড়েছে। মেয়েমানুষ !

বটের শেকড় নেমে এসেছে পাড়ের মাটি বেয়ে অজগর সাপের মতো। কাঁপা-কাঁপা হাতে খেয়াজালের মুঠোর দড়ি সেই শেকড়ে বাঁধে আকলু। এদিক-ওদিক তাকায়। দিনশেষে কেউ কোথাও নেই।

সে হাঁচড়-পাঁচড় করে পাড়ে ওঠে। থপথপিয়ে হাঁটে গ্রামের দিকে। এক্ষুনি খবর দিতে হবে। মরা মেয়েমানুষের চেয়ে তার জালখানির দাম তার কাছে অনেক বেশি।...

বেঙ্গমি ডাকে, ও বুড়ো। জেগে আছ কি ?

বেঙ্গমা বলে, আছি। কী হয়েছে ?

মেয়েটার জন্য মন কেমন করে গো।

হুঁ—আমারও।

দ্যাখো, দ্যাখো।

কী।

ছেলেটা আসছে।

এসে আর কী করবে ? চুপচাপ বসে খালি সিগারেট টানবে।

ছেলেটার জন্য বড় কষ্ট হয়, জানো ?

হুঁ—আমারও।...

গঙ্গাহাটির সেই পাখিডাকা দিনগুলিন আর শেয়ালডাকা রাতগুলিন কোথায় গেল ? কোথায় গেল শুওরচরা নালার পাড়ে কাঁটামাদার, কেয়াঝাড়, আকন্দ-কালকাসুন্দের জঙ্গলশোভা ? দহের ধারে একলা দাঁড়িয়ে থাকত একটা শিমুলগাছ। ঋতুর রাজা আগাম যাকে আঁচড়ে-কামড়ে রক্তারক্তি করে জানিয়ে দিত, আসতে দেরি নেই, সেও গেল ! গেল কোথায় ?

জীবদ্দশায় বহু দুঃখে তারারানী যাঁকে বলতেন, 'দারুবেম্ম', কারণ তিনি সবতাতে মিতবাক এবং নির্বিকার, সেই দারুব্রহ্ম ব্রজগোপালের মুখে এদিন এই সব হাহুতাশ শুনে চক্রধারী স্বভাবজ সাংকেতিক শব্দ বের করেন, 'পপুলেশন।' তারপর একটি প্যাঁচালো উক্তি করেন, 'বগা চরতে ২ যায় / বিল মরতে ২ যায়।'

উক্তিটি বহুপ্রচলিত ধাঁধা, যার সমাধান ব্রজগোপালের জানা। বলেন, 'লম্প ! লম্পের কথা আসছে কেন ?'

'আসছে।' বাঁকা ও রহস্যময় হাসেন ধূর্ত গ্রামীণ ভাঁড়পুরুষ। 'বগার চরা শেষ হলে লম্পও নিবিয়ে যাবে হে দারুবেম্ম !' বলে শিমুলগাছটার কথায় যান। 'শিমুলগাছ শিমুলগাছ করছ। ওটা ছিল না।'

দারুব্রহ্ম বলেন, 'ছিল না ! তাহ'লে ছোটবেলা থেকে এতগুলিন বছর' চুপ করে যান হঠাৎ। আজকাল গঙ্গাহাটিতে অসংখ্য না হ্যাঁ এবং অসংখ্য হ্যাঁ না হয়ে যাচ্ছে। কিংবা হ্যাঁ ও না-এর তফাত লোকে বুঝতে পারছে না। কাজেই চুপ করে থাকাই ভাল।

চক্রধারী ব্যাখ্যা করেন, 'ছিল না মানে রেকর্ড-পরচায় ছিল না। তিরিশ ডেসিমেল মাটিটা ছিল। নো টিরি।'

খুব হাসতে থাকেন। যেহেতু সমস্তটাই প্রমোদযোগ্য বিষয় সেইহেতু ট্রিকে 'টিরি'-তে পরিণত করা চলে। ইংরেজ আমলে থার্ড ডিভিসনের ম্যাট্রিকুলেট চক্রধারী যতকাল হাঁটাহাঁটি করতে পারতেন, ততকাল মামলার তদ্বিরকারী ওরফে 'দালাল' ছিলেন,

আঞ্চলিক লোক-টার্মে। তবে বিবিধ বিষয়ে তাঁর প্রতিভা ছিল। গাজনের সঙ ও ছড়া বেঁধে নিম্নবর্গীয় সমাজে যোগান দিতেন, ফলে জনপ্রিয় ছিলেন। পড়ো পড়ো দশা জমিদার-বাড়ির ঠাকুর-দালানে তরজা-পাঁচালি, এমন কী কবিয়ালি গাইতেও পটু ছিলেন। তবে কার কী গোপন কেলেঙ্কারি পরবর্তী গাজনের সঙে বা ছড়ায় ফাঁস হবে, সেই আমোদগেঁড়ে প্রতীক্ষা এবং যুগপৎ উদ্বেগের টানাটানিতে চক্রধারী বরাবর একটা দড়ি-টানাটানির খেলার মধ্যিখানে আটকে গিয়েছিলেন। সেজন্যই, নাকি মামলার দালালির দরুন তাঁর একটি ঠ্যাং নড়বড়ে হয়ে যায়, নিজের ভাষা অনুযায়ী অবশ্য তা নিছক দুর্ঘটনাজনিত। দুর্ঘটনাটি মহকুমা শহরেই ঘটেছিল, তাও ঠিক। তারপর থেকে তিনি নড়ি হাতে লেংচে হাঁটেন। পোস্টাপিসের বারান্দায় বসে অবাঙালী শ্রমিকদের মানিঅর্ডার ফরম লেখেন। সর্বশেষ একমাত্র জীবিকা।

এদিকে শিমুলগাছটির অন্তর্ধানের দিন ব্রজগোপাল গঙ্গাহাটিতে ছিলেন না। পেনসনের টাকা সাত বছর ধরে আটকে। নাকি ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিন সদর শহরের আপিসে গিয়ে কনিষ্ঠতম করণিকের ধমক খেয়ে প্রায়-মূক, মিতবাক দারুব্রহ্ম বিদীর্ণ হবার চেষ্টা করেন পৈতে ছিঁড়ে এবং সেই পৌরাণিক অভিশাপ কম্পিউটারযুগ একুশ শতকের যাত্রীদের অট্টহাসির থাপ্পড় হয়ে তাঁর সর্বাঙ্গে পড়ে। তখন নিছক দারুমূর্তি হয়ে বেরিয়ে আসেন। ফেয়ারওয়েল সম্বর্ধনায় সাত বছর আগে উপহার পাওয়া, বড় অবাক এই উপহার, বারো ইঞ্চি বাই ছ ইঞ্চি একটি ট্রানজিস্টার, যেটা সারাক্ষণের সঙ্গী, পৈতে না ছিঁড়ে সেটাকেই কেন আছড়ে ভেঙে দিয়ে এলেন না ভেবে পরে একটু পস্তেছিলেন। এ ছিল এমন একটা কষ্টের রাত, যখন ভগবানকে শালা বলে গাল দিতে ইচ্ছে করে। শেষে শান্তি খুঁজতে বিগত সাত-সাতটা বছরের দিন-রাতগুলিনের অভ্যাসমতো সঙ্গীত শুনতে যন্ত্রটির নব ঘোরান। তাঁর মতোই বুড়ো যন্ত্রটি ঘড়ঘড় করে ওঠামাত্র পেছন-বাড়ির লক্ষ্মীঠাকরুন খোলা জানালার বাইরে এসে, এ রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল, ব্যস্তভাবে তাঁকে বলেন, 'গাঁয়ে গণ্ডগোল আমরা সাতে-পাঁচে নেই বট্‌ঠাকুর। শুনলে পরে ভাববে, মজা দেখছি।' কিন্তু সত্যিই মজা দেখার মতো করে সারাটা রাত কোথায় নির্ঘোষে

মাইক্রোফোন বাজল ! আজকাল গঙ্গাহাটির কিছু বোঝা যায় না।

চক্রধারীর কাছে গণ্ডগোলের ব্যাখ্যা চাইতে গিয়ে ওইসব সাংকেতিক সংলাপ, যার অনেকটাই বুঝে নিতে দেরি হয়। ধূর্ত ও চিররসিক ভাঁড়পুরুষ দহের ধারের তিরিশ ডেসিমেল ভেস্টেড মাটি কীভাবে কালাচাঁদ সরকারের কাছে লাভ করে, করলেও জামশেদ-খোকন-পাণ্ডাবাহিনী সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা শিমুল-গাছটিকে আইনত অস্তিত্বহীনতাহেতু নির্মূল করে নিয়ে যায়, তার কাঠগুলিন এমুহূর্তে কোথায় আছে, নির্মূল করার সময় ও পরে ঠিক কতগুলিন বোমা ফাটে, গঙ্গাহাটির রাজপথে যে-মিছিল বেরোয় তার প্রকৃত জনসংখ্যা, তার শ্লোগান, যাবতীয় বিষয় বর্ণনা করেন—অবশ্যই নিজস্ব সাংকেতিক শব্দবিন্যাসে। শেষে বলেন, 'থাকত যদি তোমার সাধন-স্বপন !'

এই কথায় ব্রজগোপালের একটি শ্বাস ফোঁস করে। কেন সাধন আর স্বপন, এই দুই তালেবর পুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁরই ঔরসে, এও বোঝা যায় না। আজকাল চারদিকে এত ফাঁদ কে পাতল ? ট্রানজিস্টারটি একরাতে তাঁকে শুনিয়েছিল, 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে !' সেই থেকে খালি ফাঁদের কথাটাই মাথায় ঘোরে। হিংসার রাজনীতি করতে গিয়ে সাধন জেলে মৃত্যুরোগা-ক্রান্ত, কাগজের খবর চক্রধারী পাচার করেছিলেন দারুব্রহ্মকে ! তারারানী বেঁচে থাকলে 'দারুবেম্ম' শুনে শুনে কান ঝালাপালা হত। তবে স্বপন—স্বপন প্রশ্ন সৃষ্টি করে গেছে।

পেছন-বাড়ির লক্ষ্মীঠাকরুন, পাশের বাড়ির মন্মথ, দূরের বাড়ির এই চক্রধারী ধ্যাবড়া পোঁচে রঙবেরঙের সমবায় চিত্রকলা চর্চা করতেন। সেটির সস্নেহ ক্যাপশান ঃ 'এই ছেলেটা ভেলভেলেটা গঙ্গাহাটি কিনবে !' পরে ব্রজগোপালের মনে হয়েছিল, খারাপটা যে খারাপ, আজকাল সেটাও লোকেরা চিনতে পারে না। তিনিও পারেননি। স্বপনের টাকায় এই মাটির বাড়ির চালে টালি ওঠে, দেয়ালে চুনকাম, এমন কী নিয়মিত অন্নবস্ত্রও জোটে। কিন্তু পেনসনের আটকে-থাকা ফাইল বেরিয়ে পড়ার আগে সুহালে তিনি চিতেয় উঠবেন, এমন বেপরোয়া প্রত্যাশা অতর্কিত বোমা-বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এক গ্রীষ্মের দুপুরে। হতভম্ব ও স্থাণু দারুমূর্তির সামনে এসে চক্রধারী নাক ঝেড়ে

মর্মবেদনা প্রকাশ করেন এবং সাংকেতিকভাবে বলেন, 'পাকা বেল নয় যে মাথায় খসে পড়ল। বেদের মরণ সাপের হাতে, বোঝালেও বুঝত না হে!' সদরের কাগজে খবর হয়ঃ 'বোমা বানাতে গিয়ে সমাজবিরোধীর মৃত্যু।' চক্রধারীর প্রাক্তন 'দালাল' হৃদয় মোচড় দেওয়ায় কয়েকটি দিন দারুমূর্তিটির কানে ক্রমাগত ফুসমন্তর ঢালতে থাকেন, 'ডিফেমেশান ঠুকে দিই, এস। অন্তত লাখখানেক। স্বপন সমাজবিরোধী? আমাদের সকলের ভালবাসার ধন স্বপন।'

সত্যিই আজকাল খারাপকে খারাপ বলে আলাদা করে চেনা যায় না। ভাল-খারাপ জড়িয়ে-মড়িয়ে আছে। টালির চাল, নিয়মিত অন্নবস্ত্র, এসবের সঙ্গে বোমা বানানো, সমাজবিরোধী হওয়া মিলে-মিশে ছিল। বুঝে উঠতে সময় লেগেছিল।

মাটির বাড়ি আমূল ও পারিপার্শ্বিক ওতপ্রোত সার্চের পর দারোগা মথুরামোহন বলেছিলেন, 'আপনি শুনলাম সদব্রাহ্মণ মহাশয় ব্যক্তি। তা আপনি এত অ্যাণ্টিসোশ্যালের জন্ম দ্যান ক্যামনে?' তারপর হাঁটুর নিচে বেটন ঠুকতে ঠুকতে, 'মাইয়্যা নাই?'

দারুমূর্তি কাঠের। তাই তাঁর পক্ষ থেকে নেতিবাচক জবাব দেন চক্রধার প্রিয়মুখ। নেই শুনে আইনরক্ষক মুচকি হেসে 'বাঁইচ্যা গেছেন' বলে স্থানত্যাগ করেন। মাটির বাড়ি ও পারিপার্শ্বিকে সমাজবিরোধী ছেলেটা ভেলভেলেটা ন্যূনতম নিদর্শনও রেখে যায়নি!'

স্বপনের এই নিদর্শন-না-রাখার ঘটনা বুকে ধাক্কা দিলে দারুমূর্তি জীবন্ত হয়ে ঝাপসা চোখে ভেবেছিলেন, সদ্‌ব্রাহ্মণ মহাশয় ব্যক্তি জন্মদাতার প্রতি সমাজবিরোধী ও ক্লাস টেনের ড্রপ আউট পুত্রের এটা কিসের নিদর্শন? চক্রধারীর এবিষয়ে সাংকেতিক বক্তব্যঃ 'তোমার ছেলে দুটিন ভাল, তবে কালধর্ম'' ব্রজগোপালের ভেতরে সেই প্রথম একটি প্রশ্নের পোনামাছ ছেড়েছিল। পোনামাছ প্রশ্নটি ক্রমে পূর্ণকায় ও চঞ্চলতর হচ্ছে।...

এভাবে পেনসন আটকে-থাকা অবসরপ্রাপ্ত এক প্রাক্তন করণিকের জীবন থেকে ছেলেদুটিন-সহ আরও কতকিছু চলে গিয়ে হাতে

রইল ট্রানজিস্টার। ব্যাটারি কেনার অভাবে মুমূর্ষু যন্ত্রটি বেশি ঘড়ঘড় এবং চিঁচিঁ করে। তবু কী অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় সেই ক্ষীণ হাহাকার ফিরিয়ে আনে সুখকর স্মৃতিগুলিনকে। তখন চক্রধারীর 'বাঞ্ছাকল্পতরুতলে বাস ছিল হে, ভুল করেছ' এই ব্যাখ্যাটি মনঃপূত হয়। তরুটি ছিল অফিসঘরে। এতদিনে টের পান। মনে পড়ে যায়, তরুটির কাছে তাঁর সহকর্মীদের কেউ-কেউ বা অনেকেই যা বাঞ্ছা করেছিল, সত্যিই মিলেছিল। আব্দুল গফুর, চিত্তরঞ্জন, কী যেন নামটা ছিল—সাধুখাঁ, আরও অনেক। সত্যিই তাঁর মতো 'ভ্যাবলা মানুষ' চোখে পড়ে না, এই খেতাবটিও অবশ্য তারাসুন্দরীর। নিজের ভ্যাবলামি যত দিন যায়, এভাবে তুলনামূলক দৃষ্টান্তে বেশি করে চোখে পড়ে এবং যন্ত্রটি বন্ধ করে অভিমানী চোখে শুওরচরা নালার পারে তাকিয়ে থাকেন। অবাক লাগে. কাঁটামাদার কেয়াঝাড় আকন্দ-কালকাসুন্দের ব্যাপক দারুমৌন এফোঁড় ওফোঁড় করে হুইসল দিতে দিতে গর্জে বেড়াচ্ছে ভুসকালো শান্টিং ইঞ্জিন। দেখতে দেখতে রেলইয়ার্ড কোথায় চলে এল! ক'বছর ধরে একটা ওয়াগন প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঠিক তাঁরই মতো পায়ের তলা ও চারপাশটাতে ঘাস গজিয়ে গেল। চক্রধারীর ভাষ্যে 'উটিন প্রেমঘর'। জানালার ধারে বসে ব্রজগোপাল কখনও-সখনও প্রেমিক-প্রেমিকাদের ছায়ামূর্তির প্রবেশ-নির্গমন না দেখেছেন, এমন নয়। আসলে বড় বেশি দখলের সময় চলেছে। কালাচাঁদের পাওয়া মাটির শিমুল গাছটিকেও দখল করা হল। নালার পারের জঙ্গলশোভা দখল করল রেলইয়ার্ড। ওয়াগনটি দখল করল প্রেমিক-প্রেমিকারা। স্টেশনের কাছে রেলের জমিতে শুওরপালকদের দখল উচ্ছেদ করতে গেলে হিংসার রাজনীতি সাধন নামে নেতা প্রসব করেছিল। শেষে শূকরপালকদের ঝোপড়ি থেকে গেল, কিন্তু সাধন জেলে মৃত্যুরোগাক্রান্ত। আরও অদ্ভুত ঘটনা, রেলকোয়ার্টারের জমাদার চাঁদঘড়িও অন্যতম শূকরপালক, যদিও সে ঝোপড়িবাসী ছিল না, দুপুরবেলা এই নালায় তার শূকরগুলিনের তদন্তে এসে চেরাগলায় গান গায়, 'ক্যায়সা বদল হো গেয়া হ্যায়। অ্যায়সা বদল না চাহিয়ে' এবং 'অ্যায়সা বদল না চাহিয়ে'-কে পুনঃ পুনঃ টান দিয়ে যেন ঘোষণা করতে চায়, এ বদল অভিপ্রেত ছিল না—সত্যিই ছিল না, অথচ এই কথাগুলিন এবং

অন্তর্নিহিত বক্তব্য হিংসার রাজনীতির ; বস্তুত এই গানটিই হিংসার রাজনীতির অভ্যুত্থানের সময় সাধনরাই ওদের বোঝবার মতো পদ রচনায় এবং লোকসঙ্গীতের সুরে বেঁধেছিল !

কিছু বোঝা যায় না তার, কিছুই না। দারুব্রহ্ম ছটফট করেন কী গূঢ় জ্বালায়। গানটি তাঁরও আজ অন্তরের গান বলে মনে হয়। চক্রধারীর নির্দেশিত লম্প নিভে যাওয়ার পরিণামটি ত্বরান্বিত কি না খোঁজখবর নিতে চক্রধারীর চেয়ে আরও ঘোরালো দার্শনিকতার ভূতগ্রস্ত দারুব্রহ্ম ট্রানজিস্টার হাতে (পাছে সম্বল চুরি যায়) গ্রাম পরিক্রমা করতে থাকেন। খারাপগুলিন কতটা খারাপ হচ্ছে দেখতে গিয়ে প্রথমে দহের ধারে পোড়ো জমিটাতে কাঁলাচাঁদের ঝাকড়মাকড় বেগুনক্ষেতের অভ্যুদয় আবিষ্কার করেন এবং তখনই ধারণা হয়, খারাপগুলিন আরও খারাপ হচ্ছে আসলে ভালগুলিনকে জায়গা দেবার জন্যই। তিনি কালাচাঁদের তারিফ করেন, এক দক্ষ রূপকার মাটির অভাবে পৃথিবীকে রূপবতী করতে পারছিল না ভেবে, এবং শিমুলগাছটির জন্য হুতাশ বৃথা। ফলে রূপকার কাঁলাচাঁদ তাঁকে একটি প্রকাণ্ড বেগুন উপহার দেয়, যেটি পুড়িয়ে খেয়ে সে-বেলার মতো ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় ব্রজগোপালের।

দারুব্রহ্ম, সদব্রাহ্মণ মহাশয় ব্যক্তি ব্রজগোপালের জীবনের অন্যপর্ব এভাবেই শুরু হল। সামান্য একটি বেগুন থেকেই।

পেছন-বাড়ির লক্ষ্মীঠাকরুন পাড়াসম্পর্কে বট্‌ঠাকুরকে কখনও খাওয়া-দাওয়ার কথা তির্যক জিগ্যেস করতেন, ‘এ বেলা কী রাঁধলেন বট্‌ঠাকুর ?’ ঠাকুর হাসবার চেষ্টা করলে বোঝা যেত, রাঁধার মতো কিছু নেই। দয়াময়ী লক্ষ্মী অন্নপূর্ণাটি হয়ে কিছু অন্নব্যঞ্জন দিয়ে যেতেন। ‘আপনার খাওয়া তো জানি, পক্ষীর আহার।’ এই শুনে ইচ্ছে করত বলতে, ‘আমি পক্ষী নইকো, মানুষ’। সাক্ষাৎ দারুব্রহ্ম যিনি, তাঁর একথা মুখ ফুটে বলা সাজে না। অন্যের তুলনায় তাঁর খাওয়া কম, সেটা সত্যি। তাই বলে এই ‘দুর্মূঠিন’ আরও যন্ত্রণা দেয়। যন্ত্রণা অপমানজনক হয়, যেচে অন্নটুকু দেওয়ার বদলে চাল ধার চাইলেই। লক্ষ্মীঠাকরুনের ছেলে নেই। একটি কানাপুকড়ো মেয়ে। রোগাভোগা বলে রেলের চাকুরে জামাই ফেরত দিয়ে গেছে মায়ের কাছে যত্ন ও চিকিৎসার

ছলে। তিনবছর খবর নেই আর। চক্রধারীর কাছে চিঠি লেখাতে গেলে তিনি বলেন, 'বাঁজা ডাঙায় চাষ!' তবে ফাঁপরে পড়া মা ও মেয়ের জন্য দেড়বিঘে ধানী জমি আছে। নাম ছেলেটা ভেলভেলেটা স্বপনের বোমা-বিদারক মৃত্যুর ফলে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে এবং লক্ষ্মীঠাকরুন হাততোলা পান, ফলে বট্‌ঠাকুর তাঁর ওপর রাগ করতে পারেন না। শুধু অপমানে ভোগেন। শেষে বোঝেন, ভালগুলিন খারাপগুলিনের সঙ্গে জড়িয়ে-মড়িয়ে আছে। তবে খারাপগুলিন ভালগুলিনকে জায়গা একদিন দেবে এবং তাঁর আটকে থাকা পেনসন-ফাইল এই নিয়মেই বেরিয়ে পড়বে, আশা পিছু ছাড়ে না।

কিন্তু তারক মুদি, নিবারণ গয়লা, ঘেঁটুটেবেচুনি গদার মা, কয়লা-কেরোসিনের ডিলার রহমত আলি, জয় মা কালী বস্ত্র ভাণ্ডারের ধুলু দাস, এমন কী অগতির গতি হোমিওপ্যাথ (এম বি) শিবু ডাক্তার প্রমুখ তাঁর মতো আশাবাদী নন। এমন সুদিন গেছে, স্বপন যখন সমাজবিরোধী নয়, নেহাত হাফপেণ্টুল পরা ছেলেটা ভেলভেলেটা, সেই যুগে পেনসন আটকে থাকার বিশ্বাস বলবৎ ছিল গঙ্গাহাটির বাজারে। ধারবাকি অনিচ্ছা অনিচ্ছা করেও দেওয়া যেত। স্বপনের মরার পর কীভাবে রটে যায়, দারুব্রহ্ম কবে সরকারের কাছে পেনসন বেচে খেয়ে বসে আছেন। ফাইল আটকে থাকার চালাকি বুড়োর! যিনি দেখতে মৌনীবাবা, মহাশয় ব্যক্তিস্বরূপ, তাঁর ফাইল কেউ আটকাতে পারে না। আর, দেখ —এমন লোকের ঔরসে কাদের জন্ম! দারোগার বাণী পল্লবিত হতে থাকে, 'আপনি এত অ্যান্টিসোশ্যালের জন্ম দ্যান ক্যামনে?'

বেগুনপোড়া খাওয়ার দিন গ্রামপরিক্রমারত দারুব্রহ্ম সন্ধ্যার দিকে চক্রধারীর বাড়ি গেলেন। চক্রধারীর দাঁতে জোর নেই। প্রায়ই মাড়ি ফোলে। ডাক্তার দাঁত তুলতে বলায় আর সেপথ মাড়ান না। গরম নুনজল কুলকুচি করেন তিনবেলা। সন্ধ্যার আহারে বসেছিলেন সবে। বন্ধুকে দেখে শুধু বললেন, 'শালার দাঁতগুলিন!'

ব্রজগোপাল বারান্দার ধারে পলেস্তারা-ওঠা মেঝেয় বসতে যাচ্ছিলেন, চক্রধারীর মেয়ে শীলা ব্যস্তভাবে একটুকরো আসন দিতে এল। আসনে বসে হাসবার চেষ্টা করে বললেন, খাচ্ছ কী হে?'

চক্রধারী খাচ্ছিলেন না, গিলছিলেন কিছু। ভাঁড়োচিত

সাংকেতিকে বললেন, 'নিউটিরিশন !'

ব্রজগোপালের আবার মনে হল, এখানেও খারাপগুলিন-ভালগুলিন মিলেমিশে আছে। গঙ্গাহাটিতে নিউট্রিশন সেণ্টার হয়েছে! স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কৃতিত্ব দাবি করা হচ্ছে এবং আসন্ন ভোটের সঙ্গে তা জড়ানো হচ্ছে। শীলা রোজ সকালে নিউট্রিশন সেণ্টারে দুধ আর মাইলো বিলোনোর কাজ পেয়েছে। ব্রজগোপাল 'তাহলে—' বলেই থেমে গেলেন!

বুদ্ধিমতী শীলা অতি শীঘ্র ব্যাখ্যা দিল। 'পাওডার মিল্ক তো! গুলে জ্বাল দিয়ে ফুটিয়ে নিলে নষ্ট হয় না। কে দিচ্ছে জ্বাল? যে যারটুকু বাড়ি নিয়ে গিয়ে জ্বাল দিয়ে ফোটাও। এদিকে মাইলো সেদ্ধ করতেই যত কয়লা পোড়ে, তত কি গভমেণ্ট দেয়? দিলে তো—হুঁঃ!' শীলার মুখটা গোলগাল। তুলনায় ছোট বলা চলে। কুমারীর কপালে অসময়ে টিপ কেন? ব্রজগোপালের মনে পড়ে, একদিন বিকেলে একেই যেন রেলইয়ার্ডের প্রেমঘরের দিক থেকে চিতাবাঘিনীর মতো আসতে দেখেছিলেন। বন্ধুর মেয়ে—তবে যিনি সতত দারুমূর্তি, তাঁর মুখ দিয়ে এসব সন্দেহজনক গতিবিধির খবর হওয়া সম্ভব নয়। ভাবতে ভাবতে শুনলেন শীলা এখনও ব্যাখ্যা দিচ্ছে। 'জলে গোলা দুধ আর মাইলোসেদ্ধ কোনও কোনওদিন সবটা বিলি হয় না। আজকাল ছোটলোকদের হাতে পয়সা হয়েছে। বরং ভদ্রলোকেরাই—ঐদিকে গভমেণ্ট ভাবছে—'

চক্রধারী বললেন, 'সেল্‌ফ্‌-রেসপেক্ট।'

সেটা কাদের তা বোঝা গেল না। ব্রজগোপাল শুধু বললেন, 'বুঝেছি।' ওই সেল্‌ফ্‌-রেসপেক্টবশেই তিনি যে-উদ্দেশ্যে এসেছেন বলতে দ্বিধা হচ্ছিল।

চক্রধারী সেদ্ধ মাইলোর সঙ্গে দুধ গিলে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উঠোনের কোণে জবাঝোপের কাছে আঁচাতে গেলেন। শীলা রান্নাঘরে ঢুকে বুঝি খেতে বসল। চক্রধারী ধুতিতে হাত মুখ মুছে উঠোনে লম্ব হলেন। হেরিকেনের আলোয় মুহূর্তে বোঝা যায় না, তাঁর একটি ঠ্যাং খোঁড়া কি না। বিড়ি ধরিয়ে বললেন, 'ভ্যাঁ করো!'

অর্থাৎ হাতের ট্রানজিস্টারটি বাজাও, শুনি। বড় আশা নিয়ে ব্রজগোপাল ভ্যাঁ করতে গেলেন, কিন্তু নব ঘোরালে খুট করে একটু

শব্দই দিল যন্ত্রটা। ইদানিং মাঝে মাঝে এমন বেগড়বাঁই করে না, এমন অবশ্য নয়। ঝাঁকুনি দিলে কিংবা থাপ্পড় মারলে মুখ খোলে। ব্রজগোপাল অনেক কিছু করলেন। চক্রধারী গতিক বুঝে তাঁকে তাতানোর ভঙ্গিতে অনবরত 'হুঃ, হ্যাঁ-অ্যাঁ, হিঃ' এইসব সাংকেতিক চালিয়ে গেলেন। শেষে ব্রজগোপাল কানের কাছে তুলে যখন নাড়া-চাড়া করেছেন, রান্নাঘরের দরজা থেকে শীলার গোলাকার, টিপ-পরা মুখ বেরিয়ে বলল, ব্যাটারি জ্যাঠামশাই, ব্যাটারি!'

তবে তাই। সেই কবে পুজোর সময় ব্যাটারি কিনেছিলেন শাল বিক্রি করা টাকায়। শীতে খদ্দরের চাদর গায়ে কাটিয়ে এখন মধুর বসন্ত-উষ্ণতা। ফের শীত আসতে যথেষ্ট দেরি এবং ততদিনে পেনসনের ফাইল বেরিয়ে পড়বে। ট্রানজিস্টারের পেছনকার খোপ খুলে হেরিকেনের আলোয় দেখতে থাকেন ব্রজগোপাল। ব্যাটারিরও কি প্রাণ আছে প্রাণীদের মতো, যে প্রাণীদের মতোই গলে-পচে যায়? বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল কথাটা ভেবে। চক্রধারী হাসছিলেন। তাঁর মেয়েও হাসছিল। এটা হাসির সময় নয়, যখন কোনও ট্রানজিস্টারের ব্যাটারিগুলিনের মৃত্যু হয়, যখন গানগুলিন বাজনাগুলিন আবহমণ্ডলে নানা মাপের তরঙ্গে অশ্রুত হয়ে ভাসতে থাকে, অথচ তুমি তাদের ধরতে পার না! যখন কত গুরুত্বপূর্ণ ও বৈপ্লবিক খবরগুলিনও অগোচর থেকে যায় এবং এমন খবরও তো গভমেণ্ট ঘোষণা করতে পারেন, আটকে-থাকা ফাইলগুলিন ক্লিয়ার না করলে বেত্রাঘাত, মৃত্যুদণ্ড, ল্যাট্রিন সাফাইয়ের নির্দেশও!

'ল্যাট্রিন সাফাই' কে যেন বলেছিল? সাধনই বলেছিল। কী সূত্রে বলেছিল মনে পড়ে না। এই চৈত্রের সন্ধ্যারাতে গভমেণ্ট কি ঘোষণা করছেন, ফাইল আটকে রাখার শাস্তি ল্যাট্রিন সাফাই, অথচ তিনি স্বকর্ণে শুনতে পাচ্ছেন না, এ একটা কষ্টকর ঘটনা। সেই কষ্টের সময় শীলা বলে কী, 'বেচে দিন না জ্যাঠামশাই আমাকে, আর চক্রধারী সাংকেতিকে বলে ওঠেন 'নতুন—' এই দুমুখো ধাক্কা খেয়ে রাগ করে ব্রজগোপাল ওঠেন। হাতের সম্বল বেচবেন না, সেটা কথা নয়। কথাটা হল, চক্রধারী মেয়েকে বলতে চায়, কিনতে হলে নতুনই কিনবি। দারুমূর্তিটি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

জীবনের সবচেয়ে সংকটপূর্ণ একটি রাত ছিল এটি দারুব্রহ্মের

জীবনে।…

সংকটপূর্ণ রাত। কারণ সেই রাতটি পোহালেই ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ, যিনি দারোগার ভাষ্য অনুযায়ী সদব্রাহ্মণ মহাশয় ব্যক্তি.' লজ্জার মাথা খেয়ে ভিখিরি হতে থাকেন। এই মেটামরফসিসের সূচনা অবশ্য সূক্ষ্ম, এমনকি অতিসূক্ষ্মও বলা চলে। মূক যন্ত্রটি হাতে নিয়ে তিনি প্রথমে মাঠের চাষীদের কাছে হাত পাতেন। চৈত্রের কয়েকটি দিনেই তাঁর মাঠের ভিক্ষাবৃত্তি শেষ হয়ে যায়। বারবার চাষীরা একই মানুষকে বেগুনটিন, পটলটিন, ঝিঙেটিন, শশাটিন দিয়ে দিয়ে হাল্লাক। শেষে ক্ষেতের আনাচে-কানাচে দেখলেই কাকতাড়ুয়াটিন হয়ে হাত নাড়ে! ক্ষেতে লাঠির ডগায় রাখা মড়ার খালিটিন হয়ে দাঁত ভ্যাংচায়। গঙ্গাহাটি জুড়ে খবর হয়, দারুবেহ্ম ভিখিরি হয়েছেন।' এতে পেনসন বেচে খাওয়ার ধারণাটি দৃঢ় হয়। তাঁকে দেখামাত্র মানুষসকল তাঁর চেয়ে কঠিন বস্তু প্রস্তরমূর্তি হয়ে ওঠে। বাজারে ছেলেছোকরারা যাঁকে 'টেরানজিস্টারদাদু' বলত, তাঁকে তারাই পরামর্শ দেয় 'টেরানজিস্টারটিন বেচে ফেলতে।' কারণ এ জিনিস হাতে থাকলে ভিক্ষুকের বিপদ। অদ্ভুত কথা, এদেরই কেউ-কেউ স্বপনের বন্ধু ছিল! জামশেদ খোকন পণ্টার আড্ডা হাটতলার যে চায়ের দোকানে, সেখানে তাঁকে দেখলেই তারা বলে স্বপনের মৃত্যু তাদের খুব নাকি ভুগিয়েছিল। কেউ খিঁচিয়েও ওঠে, 'ভিক্ষে করতে লজ্জা করে না, বুড়ো ভাম?' কিছু বোঝা যায় না, কিচ্ছু না। হাতে একটি ট্রানজিস্টার এবং পেনসনের ফাইল আটকে থাকলে কেন এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে থাকে, বোধগম্য হয় না ক্ষুৎকাতর এবং পা টেনে কষ্টে হাঁটা দারুব্রহ্মের। তিনি মূক ছিলেন, আরও মূক হতে থাকেন। শুধু শীর্ণ জরাজীর্ণ ফ্যাকাশে হাতের তালু। আর বিশেষ বলার কথা, লক্ষ্মীঠাকরুনও বটঠাকুরের জানালায় এসে দাঁড়ান না। কোথায় গা ঢাকা দিলেন লক্ষ্মীঠাকরুন? কেন পাওয়া যায় না আগের মতো পেছনবাড়িতে তাঁর সাড়া? কোথায় গেল তাঁর রোগাভোগা মেয়েটাও? পাশের বাড়ির মন্মথই বা কোথায় গেল? আর চক্রধারীই বা কেন আসা ছেড়ে দিলেন? রেলস্টেশনে হাত পেতে পেতে কদাচিৎ দশ বা বিশ পয়সা, কারুর বাড়ি বিয়ে বা শ্রাদ্ধের ভোজকাজে কখনও পেটপুরে খাওয়ার সুযোগ, এভাবে

চলতে চলতে পোস্টাপিসের বারান্দায় একদিন চক্রধারীর সামনে দাঁড়ালে তিনি সাংকেতিকে বলেন, 'বার্ধক্যভাতার পিটিশান' এবং দুঃখিত বন্ধুবর তাঁর একটি সইও নেন, জড়ানো অস্থির দুর্বোধ্য কিছু রেখামাত্র। ক'দিন পরে ফের বিপুল আশায় চক্রধারীর সামনে গেলে যথারীতি সাংকেতিকে বলেন, 'স্যাংশন হল না। সাধন-স্বপন।' সেই পোনামাছ প্রশ্ন এখন পূর্ণকায় এবং বুকের ভেতর ঘাই মারলে দারুব্রহ্ম কাতর হয়ে ফিরে আসেন।

চৈত্র শেষ হয়ে আসছে। ভোরের দিকে এখন গাঢ় কুয়াশা শুওরচরা নালার পারের রেলইয়ার্ডকে ঢেকে রাখে। আবছা দেখা যায় প্রেমঘরটিকে। সেখানে জ্বলে ওঠে আগুন। শেষ রাতে বড়-বেশি শীত পড়েছিল। দুজন সেন্ট্রি আগুন ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। দারুব্রহ্ম তাঁর মাটির ঘরের জানালায় বসে এই ভোরে ট্রানজিস্টারে ধর্মসঙ্গীত শুনতেন। এখন যন্ত্রটা তাঁর মতো মূক। তবু অভ্যাসে বসে থাকেন, কখন কুয়াশা সরে রোদ ফুটবে. স্টেশনে যাবেন হাত পাততে। আর এভাবেই একটা ঘটনা ঘটতে দেখেন, একইভাবে বোধগম্য হয় না কিছু।

দুটো ছোট্ট মানুষ তাঁর চোখের সামনে কিছুদিন থেকে এগুলিন করছে। শুওরচরা নালার পারে আকন্দঝাড়ের গায়ে কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে গঙ্গাহাটির অতীতের খেঁকশিয়ালগুলিনের মতো তারা রেলইয়ার্ডে ঢুকে পড়ে। কুয়াশায় ভেতর কিছুক্ষণ ঢুকে থাকে। তারপর দুজনে তাদের উপযোগী একটা চটের থলে টানতে টানতে গুঁড়ি মেরে বেড়া গলিয়ে ফেরে। নালা এখন শুকনো। নালায় থলেটা ফেলে তারা কতক্ষণ খেঁকশিয়াল-দৃষ্টে আগুনের কুন্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর নালায় নামে। একটি ছেলে, অপরটি মেয়ে। চেনা চেনা মনে হয়।

জানালার নিচে খাঁ খাঁ একফালি কাঁচা রাস্তাচলে গেছে দহের দিকে। নিশিন্দাছোপের ভেতর থেকে খুদে মানুষ দুটিকে এভাবে থলে টানাটানির প্রথম দেখার দিন দারব্রহ্মের বাক ফুটেছিল, 'অ্যাই! কী, কী?' খুদে পুরুষটি ধমকেছি, 'চুপ বুড়ো?' খুদে মেয়েটি মুখ ভেংচেছিল।

বাজারে বটতলায় জুতো সারে হন্ডুলাল। তারই ঔরসজাত। কারণ হন্ডুলালের বউ ছুঁড়নি এদিক-ওদিকে তাকাতে তাকাতে

কাছে গেল এবং থলেটি বুকের কাপড়ের তলায় লুকিয়ে চলে গেল, পেছনে ছানা দুটিন, এবং ছানাদ্বয় ফেরে দারুমূর্তিকে মুখ ভেংচে শাসিয়ে গেল।

তার মানে, তাঁর চোখের সামনে দুটো ছোট্ট মানুষ চোর হয়ে উঠছে। চোর হওয়া খারাপ না ভাল, এই সংকটকালে বিচার করা কঠিন। কারণ, ঘটনার দ্বিতীয় দিনে হুড়ুলালের বউ জানালায় বসে থাকা দারুঠাকুমোশাকে একটি সিকি প্রাণামী দিয়ে যায়। সর্বশেষ ঘটনার দিন আসে স্বয়ং হুড়ুলাল। সে ঠাকুমোশাকে একটি আধুলি দিয়ে নমো করে। এদিন থলিয়াটিন অতিশয় ভারী ছিল এবং বালক-বালিকা শেষ চৈত্রের হিমনিশিভোরে, যখন নাকি গঙ্গাহাটির প্রাচীন প্রবাদ 'চত্তিরের জাড়ে। মোষের শিঙ্গ নড়ে' হাড়ে বোঝা যায়, ঘামছিল আর হাঁফাচ্ছিল। হুড়ুলাল ভিক্ষুকে পরিণত এবং অ্যান্টিসোশ্যালদের জন্মদাতা-হেভু বার্ধক্যভাতায় বঞ্চিত, পেনসন আটকে থাকা, এমন কী অ্যান্টিসোশ্যালদেরও কদর্য গাল-খাওয়া ঠাকমোশাকে সকাতরে ইস্পাতপিণ্ডগুলিন একবেলার জন্য ঘরে ঠাঁই দিতে বলে। আরও একটি আধুলির লোভ দেখায়।

তাই শুনে দারুব্রহ্ম করুণা ও লোভে বিগলিত হন। আধুলি দুগুণে এক টাকার পাঁউরুটির সাইজ, এক ভাঁড় চা তাঁর অবিকল চক্ষুগোচর হতে থাকে এবং তিনি খিক খিক করে হাসতেও পারেন, বহুদিন পরে এই হাসি একটা স্বাধীনতার মতো, একটা অতীত ও সুখী গঙ্গাহাটির সৌরভ ছিল এতে। তিনি দরজা খুলে দিলে হুড়ুলালের বউও নিশিন্দাঝোপের ভেতর থেকে আশ্চর্যভাবে নির্গত হয়। তারা সপরিবারে ওজনদার থলিয়াটিন ঘরে ঢোকায়। কিন্তু ঘর ; রুক্ষ ডাঙ্গাজমির মতো শূন্য। হুড়ুলাল বলে, তক্তা-পোস নাই ঠাকমোশা ?'

ঠাকমোশা চুপ করে থাকেন। তক্তাপোস কবে গোপনে মুসল-মানপাড়ার ইসমাইলকে বেচে দিয়েছেন, মনে পড়ে না। হুড়ুলালের বউ বলে, 'ঢাকব কিসে, কুছু তো দিবেন ? আঠান্নিটিন দুবো।'

পরবর্তী আধুলির আশায় অগত্যা ছেঁড়া সতরঞ্চিখানিই দিতে হয়। হুড়ুপরিবার স্থানত্যাগ করা মাত্র সেই পূর্ণকায় প্রশ্নমাছ সজোরে ঘাই মারে। বুকের ভেতর জলের শব্দ তোলপাড় হতে থাকে। খারাপগুলিন এবার তাঁর ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

তিনি ভালগুলিনের ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁকে এভাবেই দাঁড় করিয়ে রাখতে চেয়েছিল তাঁরই ঔরসজাত অ্যান্টি-সোশ্যাল ভেলভেলেটা। সহসা বোমাবিস্ফোরণ না ঘটলে সে তার জন্মদাতাকে ভালগুলিন নামক বেদিতেদাঁড় করিয়েরাখত। খারাপ-গুলিন থেকে দূরে প্রতিষ্ঠিত যথার্থ দারুব্রহ্ম, যিনি সদ ব্রাহ্মণ মহাশয় ব্যক্তি ও পূজ্য পুরুষ। হিংসার রাজনীতি-করা ছেলেটাও বলত, পচা-গলা লাসের কবর থেকে তাজা জীবন বেরিয়ে আসবে।

তিনি ফোঁস করে শ্বাস ফেলেন। ছটফট করেন। ঘণ্টাটাক পরে একটি সাইকেলরিকশো আসে। আধুলিদুগুণে একটাকা প্রাপ্তি-যোগের ফলে পাঁউরুটির সাইজের দিকে মনস্কতাসহ ব্রজগোপাল নড়বড় করে হাঁটতে থাকেন। তাঁর পূর্ববিশ্বাস বলশালী হয়, খারাপগুলিন তাঁর মতো ভালগুলিনে এসে জড়িয়ে গেল আরও খারাপ হয়ে আরও ভালগুলিনকে জায়গা দেবার জন্য।

ভকতলালজির লোহালক্কড়ের দোকানের সামনে হুড্ডুলাল ও সাইকেলরিকশোটি আবিষ্কার করে তাঁর বুকের ভেতর প্রশ্নমাছ আবার জোরালো ঘাই দিল। খারাপগুলিন আরও খারাপ হওয়ার জন্য ভালগুলিনেরই খারাপ হওয়া দরকার।···

এইখানে কাঁটামাদার, কেয়াঝাড়, আকন্দ-কালকাসুন্দের জঙ্গল-শোভা ছিল। পাখিডাকা দিন শেয়ালডাকা কত রাত চলে গেছে এইখান দিয়ে। কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাতে হিমে ও কুয়াশায় চাঁদের ফালি পোড়ো ওয়াগন প্রেমঘরের কোনায় আটকে গেল, যেহেতু দারুব্রহ্ম গুঁড়ি মেরে হাঁটছিলেন। হাল্কা নরম ও হলুদ আলো খুবই উঁচু পোস্ট থেকে ভূতের চোখে নজর রেখেছে। এই প্রথম হাতের সম্বল, ফেয়ারওয়েল-সভায় কলিগদের মর্মব্যথা যার ভেতর বাকি জীবনের জন্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই ট্রানজিস্টার ব্যাটা-রির ক্ষুধায় মূক, আর ক্ষুধা কী ভয়ঙ্কর তিনি তো জেনেছেনই, তাকে ফেলে রেখে এসেছেন ঘরে। এই প্রথম সে তার সঙ্গছাড়া।

রেলইয়ার্ডে আজ শেষ রাতে এত ওয়াগন, শুধু ওয়াগনের সারি ক্রমান্বয়ে, চারদিকে! গোলকধাঁধায় পড়ে যান দারুব্রহ্ম। কোথায় সেই ইস্পাতপিণ্ডগুলিন? যেদিকে গুঁড়ি মেরে এগোন, ওয়াগন সেদিকে। ওয়াগনগুলিন তাঁকে কি ফাঁদে ফেলেছে?

যত নড়াচড়া করেন, খোঁজেন, দেখতে পান ওয়াগনগুলিন তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে ক্রমে ক্রমে। শেষ চৈত্রের মোষের শিং-নড়িয়ে-দেওয়া শেষরাতের হিম তাঁকে নখের আঁচড় দেয়, কামড়ায়। কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে যাওয়ার ভয়ে খদ্দরের চাদরটা রেখে এসেছেন। ঠকঠক করে কাঁপেন। কোণঠাসা শেয়ালের মতো তাকান জ্বলজ্বলে চোখে। গতকাল সকালের পাঁউরুটি দুপুর অব্দি খেয়েছেন। তারপর শুধু জল। গলা শুকিয়ে গেল এবার। জীবন্ত হয়ে ওঠা ওয়াগন-পারিপার্শ্বিক, উঁচু থেকে অজস্র হলদে ভূতচক্ষু, হিম ও তৃষ্ণা বিপন্ন ফাঁদেপড়া দারুব্রহ্মকে মরীয়া করে তুলল। তখন ইস্পাতপিণ্ডগুলিনের আশা ছেড়ে দিয়ে সোজা হলেন। তারপর যেই কয়েক পা টলতে টলতে এগিয়ে গেছেন, কোথায় একটা অমানুষিক গর্জন শুনলেন এবং থমকে দাঁড়াতেই অদ্ভুতভাবে ইস্পাতপিণ্ডগুলিনকে আবিষ্কার করলেন এতক্ষণে, যেহেতু সেগুলিন ঋজু গতিতে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে তাঁর শরীরে ঢুকে গেল। মূক দারুব্রহ্মকে পাশের ওয়াগন ভক্তি ও যত্নে গ্রহণ করতে গেল, কিন্তু শেষাবধি পাথরকুচিগুলিন তাঁকে বুকে নিল। পাথর-কুচির স্তূপে কয়েকটি ঘাস মাথা তুলেছিল। রক্তে ভিজে গেল।...

গঙ্গাহাটিতে এভাবে আরও একটি হ্যাঁ না হওয়ার অর্থাৎ দারু-ব্রহ্মপতনের খবর হয়। কেউ হাসে, কেউ জিভ চুকচুক করে। হাড্ডুলাল সপরিবারে সাবধান হয়ে যায়। আর এক সপ্তা' পরে চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন। বহু বছরপরে ব্যথিত চক্রধারী তাঁর বন্ধুর জন্য ছড়া রচনায় বসেন। রস ও খেউড়ের ধুয়ো দুঃখবশে তিনি এরূপ রচনা করেন, যা ব্যতিক্রম এবং কাশীদাসী মহাভারত থেকে টোকা।

দারুব্রহ্মকথা রে ভাই অমৃতসমান।
চক্রধারী শর্মা ভনে শনে পুণ্যবান॥

তবে একটি বিশেষ কথা, এই ছড়ায় 'ট্রানজিস্টারটিন' থাকলেও 'পেনশন' শব্দটি ছিল না। অনুমান হয়, রসহানি এবং নিউট্রিশন সেণ্টারই তার কারণ।...

হায় চিল

ভোলার কথা ভাবলে গোপালের কথা মনে পড়ে। গোপালের কথা ভাবলে ভোলা, গোপাল আর চিকনের। চিকন ছিল জগৎ কম্পাউন্ডার মশাইয়ের মেয়ে। কাজেই চিকনের কথা ভাবলে জগৎ কম্পাউন্ডার মশাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়। যিনি মনুষ্যবিরল দেশে 'দা গ্রেট ফাদার' খেতাব পেতেন। কারণ তিনি ১১টি সন্তানের জনক ছিলেন। আসলে একজনের কথা ভাবতে গেলে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এভাবে ক্রমাগত একটার পর একটা মানুষ এসে পড়ে। কতকগুলো টুকরো টুকরো ঘটনা, সময়, পরিপ্রেক্ষিতও এসে পড়ে এবং ব্যাপারটা ভীষণ জট পাকিয়ে যায়। একটা পরিচিত বৃত্ত পেরিয়ে ক্রমাগত অপরিচিত বৃত্তের মধ্যে যেতে যেতে আবিষ্কার করি, আমি ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছি। আর তখনই চিকন এসে আমাকে উদ্ধার করে। তার সঙ্গে ভোলা ও গোপালও আসে। চিকনের পরনে চকরা-বকরা জংলি বাটিক ছাপ-দেওয়া মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি, গোপাল যেটা উপহার দিয়েছিল, আর আমি জব্বলপুরে গোপালের বাবা ব্রজরাজকে বলতে গিয়েছিলাম, জ্যাঠামশাই, গোপাল চিকনকে বিয়ে করবে। ব্রজরাজ ছিলেন কানে কালা। চেঁচিয়ে বলেছিলেন ভঞ্জু ! শোন তো এ কী বলছে ! ভঞ্জুবাবু ছিলেন তাঁর ভাগ্নে। হোঁতকা-মোটা এবং রাগী চেহারা। তিনি আসার আগেই আমি কেটে পড়ি। তবে ঘটনার সূত্রপাত আমার ওই ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া থেকে। সেবার শ্রাবণমাসে ঝুলনপূর্ণিমায় আমাদের শহরের রাজবাড়িতে (আমাদের শহরে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাকি সত্যিই একটা হাতি ছিল। আমার জন্মের বহু আগে একবার ঝুলনের মেলায় শোভাযাত্রার সময় হাতিটা হঠাৎ খেপে যায় এবং কিছু মানুষ হতাহত হয়। জেলা কালেক্টর ম্যাকর্সন তাকে গুলি করে মারেন। দ্রঃ জেলা গেজেটিয়ার), রাজবাড়িতে সেবার মেলায় খুব ভিড় হয়েছিল। সেবারকার ভিড়ের কারণ এক সাধুবাবার শূন্যে আরো-

হণ ও অবরোহণ। বেঁটে হওয়ার এই বড় এক বিপদ। সেই অলৌকিকতা থেকে বঞ্চিত তো হলামই, উপরন্তু ভিড়ের ঘামের গন্ধ আর ছিটেফোঁটা বৃষ্টির চোঁয়ানো ফোঁটায় ঘামের পরিমিশ্রণ পৃথিবীর সব সুগন্ধ সেই সুযোগে কেড়ে নিল। ভিড় জিনিসটাই এমন। অথবা ভিড় জিনিসটা সঠিক ভাবে কেমন, তা বোঝানো ভারি কঠিন। মানুষ নিজেই নিজের অনেক সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিতে পারে না। পরে চিকন বলেছিল, পুঁটুদা, তুমি এমন বোকা! সে ঠিকই বলেছিল। বোকারাই চিরদিন ভিড়ে হারিয়ে যায়। চিকন, গোপাল, ভোলার ভিড় ছোট্ট হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু একটা ভিড় এবং ভিড়ের সব লক্ষণ তার মধ্যে ছিল, আমি তার মধ্যেও হারিয়ে গিয়েছিলাম। যখন ছিটকে বেরিয়ে এলাম, আমার অবস্থা হল সেই চিলটার মতো। কোন চিল? সেটা ঝাঁক থেকে কীভাবে ছিটকে এসে আমাদের উঠোনের জবাঝোপের ভেতর লুকিয়ে ছিল। তখন অনেক রাত। বাইরে ঝটাপটি আর খ্যাঁও খ্যাঁও শব্দ শুনে বেরিয়ে টর্চ জেবলে দেখি, কী একটা মোটাসোটা পাখি জবাঝোপের তলায় দুটো ডানা বাড়িয়ে ঠোঁট বাগিয়ে একটা হুলো বেড়ালকে শাসাচ্ছে। বেড়ালটাও দাঁত বের করে থাবা তুলছে। খ্যাঁও খ্যাঁও গর্জনটা কার বুঝতে পারলাম না। কিন্তু যার ডানা আছে, অর্থাৎ যে আকাশে ওড়ে, তার প্রতি আমাদের প্রচুর বিস্ময় আছে। আর মাটিতে হাঁটা চতুষ্পদ ওই পার্থিব প্রাণী! পাখীকে আমরা প্রাণী ভাবি না, তাছাড়া বেড়ালটা জঘন্য চোর। তাকে তাড়া করে ভাগিয়ে দিলাম। এখন পাখিটাকে নিয়ে সমস্যা। তাকে নিরাপদে আশ্রয় দেব বলে যতবার হাত বাড়াই, সে ঠোকরাতে আসে। এতক্ষণে বুঝলাম, খ্যাঁও খ্যাঁও শব্দটা পাখির নয়। পাখিরা গর্জন করে না। আর্তনাদ করে। তাদের কণ্ঠস্বর পাশবিক নয়, বরং মানবিক। তবে পাখিটা যে চিল, তখনও বুঝতে পারিনি। হায় চিল! সোনালী ডানার চিল! টের পেয়ে মা বেরিয়ে এসে ভাল করে দেখার পর বললেন, চিল। আমার মা ছিলেন কাঁদুনে মহিলা। খুব সহজে কেঁদে ফেলতেন। তাঁর মনের মধ্যে একটা চিল ছিল, উড়ে-উড়ে খালি কেঁদে বেড়াত। মা বললেন, আহা রে! মনে হল, এখনই তিনি কেঁদে ফেলবেন। কাজেই চিলটার একটা ব্যবস্থা করতে হয়। চটের থলে এনে তাকে ধরে ফেলা পর্যন্ত মা টর্চ জেবলে

আমাকে সাহায্য করলেন। চিলটাকে আমি ঘরে এনে ছেড়ে দিলাম। সে খাটের তলায় তলিয়ে গেল। সারারাত চিলটা আমার নিচে অতল নৈঃশব্দ্যের ভেতর উড়ে-উড়ে কেঁদে বেড়াল। সে এক অদ্ভুত রাত। তারপর ঝিরিঝির বৃষ্টির শব্দ, রেললাইনে ট্রেনের শব্দ আর হুইসল, ভাবি চিলেরই কান্না, ব্যাঙ আর পোকামাকড়ের চাপা কোলাহল—বর্ষারাতের রহস্যময় চক্রান্তের মতো, চারদিকে শুধু 'জন্ম, জন্ম' বলে ডাকাডাকি, 'এসো, আমরা জন্ম দিই' বলে ব্যাঙ ডাকে ব্যাঙনীকে, পোকা ডাকে পোকানীকে, সাপ ডাকে সাপিনীকে আর আমার শরীরের নিচে এক চিল, রুগণ ও দলভ্রষ্ট চিল, উড়ে উড়ে কেঁদে বেড়ায় সারাটি রাত। অবশ্য ধানসিঁড়ি নদী না হলেও আমাদের শহরের পাশে একটা নদী ছিল। সেই নদীর তীরে ভাঙনরোধী সরকারী, জঙ্গল ছিল। জঙ্গলটা হাসপাতালের পেছনে এবং শহরের আবর্জনা ফেলার জন্য নির্বাচিত বিশাল জমিটার খুব কাছে। জমিটাতে প্রচুর আগাছা ছিল। হাসপাতালের রক্তাক্ত ছেঁড়া তুলো নিয়ে, কবিরা যেভাবে বলেন, ঠিক-ঠিক সেইভাবে পাখিরা—মানে কাকেরা, চিল নয়, আকাশে উড়ে যাচ্ছে দেখেছিলাম। ভোলা, গোপাল, চিকন মাঝেমাঝে ওই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে—ভোলা যেটাকে 'নিরিমিষ জঙ্গল' বলত, আবর্জনার গাদায় কী খুঁজতে যেত। পরে জানতে পারি, ওরা ভ্রূণ খুঁজতে যাচ্ছে। আসলে প্রথমবার একটা ভ্রূণ আমারই চোখে পড়ে, কুকুর আর কাকেরা যেটা কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছিল। ফিরে এসে ওরা তিনজনে খুব হাসত। চিকনের নাকে শাড়ির আঁচল ঢাকা। সেই শাড়িটা নয়, গোপালের উপহারটা তারও আগে পায় চিকন। পরে গোপাল একদিন জেল-খানার উঁচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে যাবার সময় বলেছিল, জানিস পুঁটু? ভঙ্গুদা চিকনকে একটা শাড়ি প্রেজেন্ট করেছে, আপন গড! আমি ওকে আরও দামী শাড়ি দিয়েছি, জানিস! মা কালীর দিব্যি। তুই বিশ্বাস কর। আর গোপাল ফের একদিন দুঃখ করে বলেছিল, চিকন মাইরি প্রস হয়ে যাচ্ছে, তোর দিব্যি। তারপর গোপাল প্রতিজ্ঞা করল, চিকনকে সে খুন করবে। ভোলা বলল, আমার আপত্তি নেই। পুঁটু, তোর কী ওপিনিয়ন? আমি বললাম তোরা যা ভাল বুঝিস কর। (আমার ওপিনিয়নে আমার প্রয়াত বাবার প্রাত্যহিক উক্তির প্রতিধ্বনি থাকা স্বাভাবিক। বাবা কিছু

কমিটির মেম্বার ছিলেন। ওইরকম বলতেন।) এরপর শলাপরামর্শ করে ঠিক হয়, চিকনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রেললাইনের ওপারে পোড়ো নবাবী মসজিদের ওখানে নিয়ে যাওয়া হবে। গোপাল ভঞ্জুবাবুর ভোজালিটা হাতাবে। ভোলা হাসতে লাগল মাছের তেলে মাছ ভাজা হবে বলে। তারপর অনিবার্যভাবে এসে পড়ল কিছু টেকনিকাল সমস্যা। কে কোপ মারবে এবং চিকন চেঁচালে ও পালাতে চেষ্টা করলে কীভাবে কী করা হবে—তাছাড়া বডিটার কী গতি করা হবে—এইসব। আমি বারবার একই কথা বললাম, তোরা যা ভাল বুঝিস করবি। চিলটা এসে পড়ার কদিন আগে এই চক্রান্ত হয়েছিল। চিকন তখন কলকাতা গেছে বেড়াতে। ওর কোন পিসে বা মেসো কলকাতায় থাকতেন। ফিরে এলে ওকে সাবধান করে দেব ভেবেছিলাম। চিলটা যে-রাতে আমার ঘরে পেঁছিয়, সেই রাতে চিকন কলকাতা থেকে ফিরল আর খুব সকাল-সকাল আমাদের বাড়ি এল। ও আসলে এসেছিল কলকাতা থেকে আনা একটা জংলিছাপের ম্যাক্সি দেখাতে। (জংলি ছাপ ওর প্রিয় ছিল) মা খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, তোকে দারুণ মানিয়েছে চিকন আমার দিকে তাকালে ওকে এক নিঃশ্বাসে চিলটার কথা বললাম। সে কী, এতক্ষণ বলবি তো, বলে চিকন আমার ঘরে ঢুকে গেল। চিলটাকে খুঁজে পেতে ওর কয়েক সেকেন্ডও লাগল না। হায় চিল! সোনালী ডানার চিল! সে খুব সহজে চিকনকে ধরা দিল। চিকন একহাতে তার ঝুঁটি ধরে ফেলেছিল, যাতে ঠোকর মারতে না পারে। চিকন আদুরে গলায় বলল, একে খাওয়ানো দরকার। পুটুদা, চিলেরা কী খায় গো? আমি বললাম, কেন বললাম জানি না, ইঁদুর। চিকন ভ্যাট বলে চিলটা নিয়ে বেরুল। সোজা বেরিয়ে গেল। মা কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন। বললেন না। তবে তাঁর চাপা শ্বাস ছাড়ার শব্দ আমার বুকেয় ভেতর ধাক্কা দিল। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। চিকনরা পাঁচভাই ছয় বোন। ওর ভাইবোনেরা রীতিমতো একটা 'দস্যি বাহিনী'। চিকন বলত, বাবা বেঁচে থাকলে অ্যাদ্দিনে আমরা একডজন হতাম, জানিস? পুরো টাউন ওদের হাতের মুঠোয় এসে যেত সন্দেহ নেই! চিকনের ওপর দুটো ভাই অর্থাৎ দাদা। চিমটে ও সাট্টা। চিমটে রেল্লের লোকোশেডে লোহালক্কড় চুরি করতে

গিয়ে সেণ্ট্রির গুলি খেয়েছিল। না, ও খায়নি—খেলে বাঁচত না। ওর ডানপায়ের কড়ে আঙুল গুলিটা আধখানা খেতে পেরেছিল। প্রবাদ আছে, সাট্টা কুপিয়ে দাদার কড়ে আঙুলটা বাদ দেয়। চিমটে অবশ্য সাতমাস, কিংবা ছমাস, হয়তো তিনমাস এগারোদিন জেল খেটেছিল। সাট্টা কিছুদিন লুকিয়ে বেড়াত। তবে তার কিছু হয়নি শেষ পর্যন্ত। চিমটে, সাট্টার পর চিকন। চিকনের পর ইডলি। স্বভাবত তারপর যে ভাই ভূমিষ্ঠ হয়, তার নাম ধোসা। ধোসার পর উদ্ভুট্টে সানলাইট। তাকে সানু বলা হত অবশ্য। সানুর পর স্বাভাবিকভাবে মানু, সে মেয়ে। এভাবে ক্রমশ পেট্রল, ডলার, ডন এবং হিপি। চিকনকে কুপিয়ে মারার চক্রান্ত এবং একটি হঠকারী চিলের আবির্ভাবের সময় হিপির বয়স তিন। চিকন মাঝেমাঝে হিপিকে কোলে নিয়ে আমাদের বাড়ি আসত। শিশুটির বদ অভ্যাস ছিল যখন-তখন বিনা নোটিশে হিসি। চিকন খাপ্পা হয়ে তার কচি শিশ্নটি খামচে ধরে বলত, ছিঁড়ে ফেলব একেবারে। শিশুটি—হিপি খিটখিট করে হাসত। তখন চিকনও হাসত। হাসলে চিকনকে আরও সুন্দর দেখাত। ভাবতাম এ মুহূর্তে কোথাও সূর্যোদয় হল। ফুল ফুটল। ফুলগুলির গড়ন হিপির কচি ও কোমল ওই জিনিসটার মতো দেখে ভীষণ চমকে উঠতাম। সেবারই আমাদের শহরে 'পথে হল দেরি' নামে একটা ফিল্ম আসে এবং চিকন বলেছিল, হিপির নাম আমি পথে-হল-দেরি রাখব ভেবেছিলাম জানিস পুঁটুদা? বাবা ওকে দেখে যেতে পারনি। চিকনকে মাঝেমাঝে নির্লজ্জ মনে হত, মাঝেমাঝে ভীষণ রক্ষণশীল। সরকারী জঙ্গলের ভেতর গ্রীষ্মের একদুপুরে ভোলা তার শাড়ি টেনে একটা থাপ্পড় খেয়েছিল। তারপর চিকন ফুঁসতে ফুঁসতে চলে যায়। গোপাল খালি খ্যা খ্যা করে হাসছিল। ভোলা রাগ করে বলেছিল, তুই হাসছিস? পরশু ও আমার কাছে দশটাকা ধার নিয়েছে! গোপাল বলল, টাকার সঙ্গে ওর শাড়ির সম্পর্ক কী রে শালা? তার মানে, মুখে হাসলেও ভেতর-ভেতর গোপালও খুব রেগে গিয়েছিল ভোলার ওপর। গোপাল দাবি করত, চিকন তার বউ হবেই, ঠেকানো যাবে না—খালি ওর বাবার মৃত্যুর ব্যাপারটা বাকি। তারপর যখন ও জানতে পারল, ওর পিসতুতো দাদা ভজবাবু চিকনকে একটা শাড়ি প্রেজেণ্ট করেছেন, তখন ও

চিকনকে খতম করার জন্য ভাবল। আমি বলেছিলাম, যা ভাল বুঝিস কর। কিন্তু চিকনকে আমিও মনের ভেতর আমাদের বাড়ির প্রতিবিম্বে সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে সবসময় হাঁটিয়েছি, আর চিকন মাঝে-মাঝে তাদের বাড়ির কিছু-কিছু গোপন কথা আমাকেই শুধু বলা যায় বলে শুনিয়েছে। যার ফলে আমি ধরেই নিয়েছি, আমিই—শুধু আমি তার কাছ ঘেঁসে হাঁটছি, গোপাল না, ভোলা না, ভঞ্জুবাবু না। এমন কী আমি মাঝে-মাঝে সিঁথিতে সিঁদুরপরা প্রতিবিম্বিত চিকনকে এই পুরনো, জংধরা লোহা-লক্কড়ের মতো—যার চারপাশে ও বুকে ঝোপঝাড় ও গাছপালা, একটা রোগাভোগা, ভুতুড়ে, ঐতিহাসিক শহরের ঘিঞ্জি গলিতে কাল্লুর সাইকেল-রিকশো চাপিয়ে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি—গোপাল ও ভোলাকে লুকিয়ে, অলিগলি চোরাপথে, খুব আড়ালে এবং সেটা নাইটশো। ফেরার সময় জেলখানার ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা। আমরা হাঁটতে হাঁটতে খেলার মাঠের মাঝামাঝি আসতেই একটা প্রবল চুম্বনের ইচ্ছা। তো হঠাৎ জানা গেল, ভঞ্জুবাবু চিকনকে শাড়ি প্রেজেন্ট করেছেন। হোঁতকা-মোটা, রাগী চেহারা, গুঁফো, টেকো, মাতাল একটা লোক। কাজেই আমি বলতেই পারি, তোরা যা ভাল বুঝিস, কর। কিন্তু সকালে চিকন এল, ম্যাক্সিটা দেখাতেই হোক বা যেজন্যই হোক, (ম্যাক্সি পরে সে তো গোপাল, ভোলা বা ভঞ্জুবাবুকে দেখাতে যায়নি!) আমি আঁতকে উঠেছিলাম। কথাটা জানিয়ে দেব ভেবেছিলাম। সুযোগই পেলাম না। হায় ছিল! সোনালী ডানার চিল! অবশেষে চিলটার খবর নেওয়ার ছলেই চিকনদের বাড়ি গেলাম। ওদের বাড়িটা ছিল ওয়াটার-ট্যাংকের পেছনে। তার ওধারে লছমন খৈতানের গ্যারেজ, পাম্পিং স্টেশন, তারপর হাইওয়ের ওধারে রেলইয়ার্ড আর লোকোশেড। আকাশ ছিল মেঘলা। গুমোট গরম ছিল। শিগগির বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা ছিল। বাইরে থেকে খুব চ্যাঁচামেচির শব্দ কানে আসছিল। খোলা দরজা দিয়ে উঠোনে ঢুকে সত্যিকার একটা দস্যি বাহিনীর মুখে পড়ে গেলাম। হায় চিল! সোনালী ডানার চিল! উঠোনে চিলটাকে ওরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। তারপরও রেহাই দেয়নি। তাকে কুপিয়ে-কুপিয়ে কেটেছে। পালকগুলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। রক্তের ছোপ। মুণ্ডু। ঠ্যাং। চিকন বারান্দার

থামে হেলান দিয়ে নির্বিকার মুখে তাকিয়ে আছে। বাহিনীটি আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, চিল! চিল! বাহিনীটি মুখে ঢাকের বোল বাজিয়ে নৃত্য করতে থাকল। কাটারি, ছুরি লোহার রড-গুলো জ্যামিতির ধাঁচে নড়াচড়া করতে থাকল। তারপর চিকন তার পট্টিবাঁধা একটা হাত দেখাল। একটু হাসলও। চিকনের মা নিষ্ঠুর মুখে বললেন, খুব হয়েছে। যা-সব ফেলে দিয়ে আয়। তারপর আমার দিকে ঘুরে বাঁকা হেসে বললেন, চিল! চিল পুষবে! বলো তো পুঁটু, চিল কখনও পোষ মানে? অমন ধিঙ্গি মেয়ে সব বোঝে, এটুকু বোঝে না? চিকনের স্বাস্থ্যবতী মা, যিনি মনুষ্যবিরল রাষ্ট্রে 'দা গ্রেট মাদার' খেতাবে ভূষিতা হতেন, সগর্জনে বললেন, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস তুই? যা শিগগির—ভোলার বাবার কাছে ইঞ্জেকশান নিয়ে আয় বলছি। চিকন ঠোঁট উল্টে ভেতরে ঢুকে গেল। তিমির পেটের মতো একটা ঘর জংলিছোপ ম্যাক্সিটা গিলে খেয়ে ফেলল। তারপর দা গ্রেট মাদার একান্ত হঠাৎ সন্দিগ্ধ স্বরে, তারপর কী মনে করে পুঁটু, বলায় থতমত খেয়ে দ্রুত বললাম, চিল!

ভোজালি এবং চিল

হুলো বেড়ালটা ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রথমে তাকে পাঁচিলের ওপর বুকে হেঁটে চুপিচুপি আসতে দেখেছিলাম। তখন চিলটার কথা মনে ছিল না। যখন সে নিঃশব্দে রান্নাঘরের নিচু ছাদ এবং ছাদ থেকে পোড়ো চৌবাচ্চার পাড়ে, তারপর মাটিতে নামল, তখন তার দিকে নজর রাখতে গিয়ে চিলটার কথা মনে পড়ল। হেসে ফেললাম। মা জানতে চাইলেন কেন হাসছি। শুধু বললাম, চিল। আর গাড়োল ওই নিছক চতুষ্পদ লৌকিক পশু ঠিক জবাঝোপটার দিকেই পাঁচিল ঘেঁসে চলতে থাকল। সে তন্ন তন্ন খুঁজে হতাশ হয়ে বসে পড়ল। দুপা ভাঁজ করে একপায়ের থাবায় ভর রেখে অন্য পায়ের থাবায় গোঁফ চুলকোতে লাগল। লৌকিক প্রত্যাশিত অলৌকিককে না দেখে এইরকম আনমনা হয়ে পড়ে। তার লেজ ও গোঁফ ঝুলে যায় এ একটা শিক্ষা। এও মহৎ শিক্ষা যে, আকাশচারী অলৌকিক রুগণতাহেতু লৌকিকে অবতরণ করে। আসলে চিলটা, সোনালী ডানার চিলটা আমার ভেতর উড়ে-উড়ে কেঁদে বেড়াচ্ছিল। আমিও খুব মনমরা হয়ে পড়ায়

বেড়ালটাকে ঘাঁটালাম না। গোঁফ চুলকানোর পর সে ভিজে মাটি শুঁকছিল। ওই মাটিতে চিলের গন্ধ ছিল। অলৌকিকের সুঘ্রাণ ছিল। এভাবে একটি নিখুঁত বাস্তবতা একটি পরাবাস্তবতাকে খুঁজছিল এবং দ্বিতীয়টিতে খুঁত ছিল। খুঁতযুক্ত পরাবাস্তবতাটির মৃত্যু ঘটেছে সকালের দিকে। এখন দুপুরে শুধু ঘ্রাণটুকু অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু ঝিরঝিরে বৃষ্টি এসে সেটুকু ধুয়ে ভাসিয়ে দিল। বেড়াল জলকে ভীষণ ভয় পায়। তাকে এক লাফে যেপথে এসেছিল সেইপথে পালিয়ে যেতে দেখলাম। বৃষ্টিটা বাড়তে থাকল। টানা দেড়ঘণ্টার বৃষ্টি হাড়জিরজিরে, পুরনো, বুড়ো শহরের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত ধুয়ে দিচ্ছিল। বৃষ্টিটা থামার পর ভোলা প্রথমে আমাকে এড়িয়ে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘরে ঢুকে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে হাসল। উত্তরে জানালার ধারে বসে খেলার মাঠ ও লোকোশেড দেখছিলাম, জল থৈ থৈ অবস্থা। ভোলা বসে বলল, গোপাল আসছে। তার পাঁচ মিনিট পরে সত্যিই গোপাল এল। তার কাঁধে একটা কালো কিটব্যাগ ছিল। ভোলা ব্যাগটা নিতে হাত বাড়ালে গোপাল ঠোঁটে আঙুল রেখে শিক্ করল। ভোলা খিখি করে খুব হাসতে লাগল আর গোপাল ভোলার ডাক্তার বাবা যে ভঙ্গিতে বাক্সো থেকে ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জের কৌটো বের করেন, সেই ভঙ্গিতে সত্যিই একটা খাপে-ঢাকা ভোজালি বের করল। আমার বুকের ভেতর চিলের কান্না। গোপাল! গোপাল! গোপাল! গোপাল শান্তভাবে ভোজালিটা আবার কিটব্যাগে ঢুকিয়ে দম আটকানো গলায় বলল, পুঁটু, এবার তোর ওপর বাকিটা ডিপেন্ড করছে। আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম পারব না বলে, ভোলা আমার মুখ চাপা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, তোকে পারতেই হবে। তুই ডাকলে চিকন যাবে। আমরা ডাকলে যাবে না। গোপাল বলল, তুই জাস্ট মিডল-ম্যান। তুই গিয়ে চিকনকে বলবি, ভজুদা আর্জেন্ট কাজে ডেকেছে। ভোলা বলল, মোতি মসজিদের ওখানে। গোপাল বলল, বলবি ভজুদা মোতি মসজিদে তোর জন্য ওয়েট করছে। আর কিছু না। আমি কুঁই কুঁই করে বললাম, বললে যাবে? যাবে। ভোলা ও গোপাল একগলায় বলল। তারপর গোপাল বলল, ভজুদা কলকাতা গিয়েছিল। চিকন কলকাতা গিয়েছিল। ভোলা বলল, মিলিয়ে

নে। দুয়ে দুয়ে চার। গোপাল বলল, আমরা গিয়ে ওয়েট করছি। আয় ভোলা! দুজনে বেরিয়ে গেলে কিছুক্ষণ নেতিয়ে বসে থাকলাম। আকাশে তখনও মেঘ। বাতাস বন্ধ। বাইরের রাস্তায় গরগর করে গজরাতে গজরাতে ট্রাক যাতায়াত করছে। মেঘলা দিনের শেষ বেলায় ধূসরতা আরও ঘন হলে বেরিয়ে পড়লাম। আমার ওজন বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ খুব সাহসী হয়ে উঠলাম। উল্টোদিকে ঘুরে গোপালদের বাড়ি এবং গোপালদের বড়লোকের বাড়ির গেট থেকে গোপালের বাবা ব্রজরাজের হুঙ্কার শুনতে পেলাম, কে ওখানে? তারপর আমাকে সামনে দেখে ব্রজরাজ যখন কী চাই বললেন, আমি ভাঙা গলায় বলে উঠলাম, গোপাল চিকনকে কাটতে গেছে। ব্রজরাজ হাঁক দিলেন, ভঞ্জু! শোন্ তো এ কী বলছে। ভেতরে কোথাও ভঞ্জু-বাবুর সাড়া পেয়েই ঠিক সেদিনকার মতো ভীষণ ভয়ে পালিয়ে এলাম। ব্রজরাজ পাকড়ো পাকড়ো চোর এরকম কিছু বলে থাকবেন, আমি গলিপথে 'ঘড়িঘর' নামে একটা ঐতিহাসিক ঘরের সুড়ঙ্গ দিয়ে শাঁখারিপট্টিতে, তারপর ভাঙা কেল্লাবাড়ির পাশ দিয়ে রেলইয়ার্ডের কাছে পেঁছে গেলাম। সেই সময় টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়তে লাগল। একটা অর্জুনগাছের গুঁড়ি ঘেঁসে দাঁড়ানোর পর অবাক এবং শিউরে উঠে দেখি চিকন। একটু দূরে রেলইয়ার্ডের কাঁটাতারের বেড়া।

বেড়াটা জায়গায় জায়গায় কাত হয়ে গেছে। কাশঝোপ প্রচুর একটা কাশঝোপের কাছে চিকন দাঁড়িয়ে আছে। চিকন এভাবে যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত। আমাদের শহরটা ততকিছু বড় নয়। ছোটবেলা থেকেই চিকনকে কোথাও-না-কোথাও দেখতে পেতাম। ধ্বংসস্তূপে, কী পোড়ো মোতি মসজিদে, কী ঝিলের ধারে, কী রেলইয়ার্ডের বা লোকোশেডের কাছাকাছি, কী বাজারে বা স্টেশনে, সরকারী জঙ্গলে, সবখানে। এই পুরনো শহরটাকে ভাবলেই চিকন অথবা চিকনকে ভাবলেই শহর, এমন কী নিশুতি রাতের সব ট্রেন এসে চিকনের পাশে থেমে যেত। হাইওয়ের সব ট্রাকড্রাইভার একটু থেমে ওর সঙ্গে কথা বলে যেত। কিংবা মাল-গাড়ির গার্ডরা ওকে দেখে নীল রুমাল নাড়তেন। চিকন হাত নেড়ে বলত, টা টা। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে ভিজে শেয়ালের মতো

দৌড়ে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম, চিকন! চিকন! চিকনের চোখ উজ্জ্বল দেখাল। ঠোঁট টিপে হেসে বলল, খুব ভাল হল তোকে পেয়ে। লক্ষ্মী পুঁটাদা, এটা একটু ধর্। দেখি, ঘাসের ভেতর চটের থলেয় ঢাকা কয়েকটুকরো মোটাসোটা লোহা। বললাম এ কী রে! চিকন এদিক ওদিক দেখছিল। হঠাৎ আমার কাঁধ চেপে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পড়ল। ফিসফিস করে বলল, গুলি ছুঁড়বে। নড়িস নে। দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটা ওয়াগনের ওপাশ দিয়ে বর্ষাতিপরা দুজন সেন্ট্রি খুব আস্তে হেঁটে লোকোশেডের দিকে যাচ্ছিল। তারা আরও সব থেমে থাকা ওয়াগনের ভেতর ঢুকে গেলে চিকন তার হাতটা দেখাল। ডান হাতের ওপর থেকে বুড়ো আঙুলের তলা পর্যন্ত জড়ানো ভিজে পট্টিটা খুলল সে। আস্তে বলল, চিলটা! চিলটা ওকে একটা রীতিমতো ক্ষত উপহার দিয়ে গেছে মৃত্যুর আগে। ক্ষতে রক্তের দাগ। ভিজে পট্টি আবার জড়িয়ে সে বলল, পনের কিলোর কম নয়। এগুলো ইস্পাত, জানিস! বললাম, ইস্পাতে কি মরচে ধরে? চিকন চোখ পাকিয়ে বলল, ধরে। নে, আমাকে একটু হেল্প কর। হাতটা ভাল থাকলে কখন চলে যেতাম। বললাম, চিকন, তোর সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল। ভঞ্জদার সঙ্গে তুই কলকাতা গিয়েছিলি, তাই—চিকন আমাকে থাপ্পড় মারল। মুখ ঘুরিয়ে নিলে কানে লাগল থাপ্পড়টা। তারপর সে হিংস্র চেহারায় কাদামাখা শাড়ির আঁচল জড়াল কোমরে এবং লোহা বা ইস্পাতের টুকরোগুলো থলেয় ভরতে থাকল। থাপ্পড় খেয়ে আমি ফুঁসছিলাম। বললাম, তুই মেয়ে না হলে তোকে পুঁতে ফেলতাম। চিকন একটা লোহার টুকরো তুলে শাসাল, আবার? খানিকটা সরে গিয়ে বললাম, ভঞ্জুদা আমাকে পাঠিয়েছিল। সে তোর জন্য মোতি মসজিদে ওয়েট করছে। শিগগির চলে যা। আমার আশেপাশে, লোহার টুকরো নয়, কাদামাখা পাথরকুচি পড়তে শুরু করল। সন্ধ্যার রঙ এখনই ফুটে উঠেছে। আবছা আঁধার আর টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে তাড়াখাওয়া শেয়ালের মতো পালিয়ে গেলাম। সন্ধ্যার পর থেকে সে রাতে বৃষ্টিটা বেড়ে যায়। আবার থামে। তখন উত্তরের জানালায় গোপালের ডাক শুনি। গলির মোড় থেকে ল্যাম্পপোস্টের আলো টেরচা হয়ে পড়েছিল জানালার

নিচে। গোপাল ও ভোলা ভিজে ঢোল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গোপাল আমাকে শালা বলে গাল দেয়। ভোলা বলে, বেরিয়ে আয় পন্টু। আজ রাতেই একটা বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া ভাল। গোপাল ভোজালিটা বের করলে আমি ঝটপট যা যা ঘটেছিল একনিঃশ্বাসে বলে দিই। তখন গোপাল জানালার ভেতর দিয়ে ভোজালিটা বাড়িয়ে বলে, এটা লুকিয়ে রাখিস। কাল একবার ট্রাই করে দেখব। কালো ভেলভেটমোড়া খাপেঢাকা ভোজালিটা হাতে পেয়ে আমার সাহস বাড়ে এবং সে-রাতে গোপালের মড়ার স্বপ্ন দেখি। গোপালের শ্বাসনালী-কাটা মড়াটা আমি নদীতে ফেলতে যাচ্ছিলাম। আমার হাতে সেই ভোজালি। কিংবা একটা চিল। চিল কিংবা ভোজালি। ভয় পেয়ে ফেলে দিতে সেটা ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল। বাঁকের ধসছাড়া খাতে কচুরিপানার ভেতর গোপাল ভাসছিল। একটা নীলচোখো শেয়াল পেছনের দুই ঠ্যাং মুড়ে গোপালকে দেখছিল। এইসময় নদীর ওপর দিয়ে জোরালো আলো ফেলে একটা স্টিমার চলে গেল। কতবছর পর আমাদের শহরের পাশ দিয়ে স্টিমার গেল। স্টিমারের আলো শেয়ালটার চোখে পড়ায় নীল ছটার ঝিলিক দেখে গোপাল কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাকে বাঁচা, পন্টু! তিনটে টাকা দেব। আর স্টিমারে জল খাওয়ার পর যেসব বড় বড় ঢেউ এসে পড়ে ধাক্কা দেয়, তাদের ধাক্কা খেয়ে কচুরিপানাগুলো ছড়িয়ে পড়ল। গোপালের চড়াটাও চলে গেল স্রোতের দিকে। শেয়ালটা পাড়ে তাকে অনুসরণ করতে থাকল। বললাম, গোপাল! তিনটে টাকা। গোপাল চেঁচিয়ে কিছু বলল। শেয়ালটার কথা অথবা টাকার কথা। তিনটে টাকা অথবা একটা শেয়াল। স্বপ্ন এরকমই হয়ে থাকে। সকালে চা খেতে খেতে দুঃখের সঙ্গে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠলাম দেখে, কালো ছ্যাতরানো হরফে লেখা আছেঃ 'গোপাল আর নাই'। দেয়ালটা গতবছর চুনকাম করা হয়েছিল। হয়েছে কী, অনবরত বৃষ্টির আর্দ্রতা চুনের প্রলেপের তলা থেকে ওকে ফুটিয়ে তুলেছে একটু একটু করে, আমার অলক্ষ্যে, তাছাড়া ওদিকে আমার চোখ দেওয়ার কথা না। তবে ওটা ভোলা লিখেছিল, যেদিন ব্রজরাজ তিনটে টাকা চুরি করার জন্য গোপালকে খুব প্রহার করেছিলেন। 'গোপাল আর নাই'। বেচারা গোপাল! ওর জন্য মন কেমন

করছিল। ওর মড়াটার কী হল এতক্ষণে, ভেসে গেল, নাকি শেয়ালটাই খেল, ভাবতে ভাবতে বুকের ভেতর চিলটার কান্না শুনলাম। সোনালী ডানার চিলটা উড়ে-উড়ে কেঁদে নেতিয়ে পড়ে কালো ভেলভেটের খাপে ঢুকে ভোজালি হয়ে গেল। আসলে সেই সকালে স্বপ্ন আর বাস্তবতা জগাখিচুড়ি পাকিয়ে যাচ্ছিল। গোপাল আর নাই', চিলটা, ভোজালিটা, নদী ও নীলচোখা শেয়ালটাও। সারাটা সকাল প্রচণ্ড মন খারাপ। খালি 'গোপাল আর নাই', 'গোপাল আর নাই', 'গোপাল আর নাই'। তার ফাঁকে ডলার এসে বলে গেল, বড়দির খুব জ্বর। বড়দি খালি বেঁকে যাচ্ছে। বেঁকে যেতে-যেতে বেঁকে যেতে-যেতে, আধবলা করে ডলার ছুটে বেরিয়ে গেছে। তখনও ভাবছি, চিকন কীভাবে বেঁকে যাচ্ছে, ভোজালিটার মতো, কিংবা চিল যেভাবে বেঁকে ছোঁ দিতে আসে মাটিতে, অলৌকিক যেমন করে বেঁকে লৌকিককে স্পর্শ করে, অথবা জীবন বেঁকে মৃত্যুর হাত ধরে। ভোলা এসে বলল, কী রে, তুই এখনও বসে আছিস? গোপাল—আমি বললাম, ওই দ্যাখ ভোলা, 'গোপাল আর নাই'। ভোলা দেয়ালের লেখাটা একবার দেখে নিয়ে বলল, গোপাল গেছে। তোকে ডাকতে বলে গেছে। আয়, আয়! মা জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে রে ভোলা! ভোলা শান্ত স্বরে, অথবা সে কাল বিকেল থেকে সন্ধ্যার বৃষ্টিটা সামলাতে পারেনি, ভিজে গলায় বলল, চিকন হসপিট্যালে মারা গেছে মাসিমা! টিটেনাস হয়েছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, চিল! চিল! ভোলা আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। চিল ছাড়া একটা শব্দও বেরুচ্ছিল না আমার মুখ থেকে।

মারাদোনা! মারাদোনা!

কাল সারারাত চারদিকে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ার মতো কারা চিৎকার করছিল, মার-দো-না, মার-দো-না! কাছ থেকে দূরে, দূর থেকে কাছে মার-দো-না, মার-দো-না। আমি ভয় পেয়ে ভেবেছিলাম কাউকে গণ ধোলাই দেওয়া হচ্ছে। পাশের ঘরে টিভির শব্দ। বউ তার বিচ্ছু ছেলেসহ টিভি দেখছিল। বললাম, পাড়ায় কাকে মারছে যেন এবং বিচ্ছু ছেলেটি সরু দাঁতে টিভির শাদা আলো নিয়ে বলল, ড্যাডি, মারাদোনা! বউ চোখ নাচিয়ে বলল, মারাদোনা! তখন শুয়ে পড়লাম এসে। সকালে চা খেতে

খেতে কাগজ খুলে দেখি, বড় বড় হরফে লেখা আছে : 'মারাদোনা,-মারাদোনা!' তাহলে তাই। এই সময় ঘরে একটা প্রকাণ্ড লাটিম এল, ওপরদিকটা লাল, নিচেটা শাদা। তাকিয়ে আছি দেখে লাটিমটি বলল, কী পুটু? চিনতে পারছিস না? আমি গোপাল কাগজ রেখে ওকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম। নাগাল পেলাম না। বললাম, গোপাল! তুই আছিস? লাল শার্ট শাদা প্যান্ট পরা অভিমানী গোপাল গাল ফুলিয়ে বলল, থাকব না ভেবেছিলি? তা তো ভাববিই। সেজন্যেই চিঠির জবাব দিস না। গোপাল কবে চিঠি লিখেছিল জানি না। ওকে দেখে আমার বুকের ভেতর কুড়ি-বছর আগের পুরনো চিলটা ফিরে এসে ডানা ঝটপট করছিল। ওকে ছুঁয়ে আমারই নিজস্ব অতীত বাস্তবতা পরখ করছিলাম। গোপাল খ্যাঁ খ্যাঁ করে হেসে বলল, তুই এখনও বাঁটকুল থেকে গেছিস পুটু! বউ বড় চোখে তাকিয়েছিল। আলাপ করিয়ে দিলাম। গোপাল বলল, বউঠান বলব, না বউদি? বউদি—উঁহু বউঠান। কী বলেন? বউ খুশি হয়ে বলল, বসুন। আসছি। গোপাল বলল, চিনিছাড়া বউঠান! বউ কিচেন থেকে বলল, আচ্ছা। বুঝেছি। গোপাল বসে বলল, তা যাই বলিস, পেলে-ফেলে, প্লাতিনি-ফ্লাতিনি—ধুস! ওই এক চয়েস—মারাদোনা! বিশ্বজয়ী মাইরি! গোপাল, তিনটে টাকা চুরি করে মার খেয়েছিল। সেই গোপাল, পিসতুতো দাদায় ভোজালি চুরি করে চিকনকে কাটবে ভেবেছিল। বললাম, চিকন—বলেই ভুল শুধরে নিলাম, ওরা সব কেমন আছে, গোপাল? চিমটে, সাত্রী ওদের আর কীসব নাম ছিল যেন। গোপাল সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, চিমটে পার্টি করে। লিডার। সাত্রী কয়লা-কেরোসিনের আড়ত দিয়েছে। গোপাল সিগারেট এগিয়ে দিল। নিজে একটা নিল। ধরানোর পর ধোঁয়ার সঙ্গে বারবার বলতে লাগল, মারা-দোনার জুড়ি নেই, যা বলবি বল! আমি বললাম, ইডলি, ধোসা, সানলাইট—মানে সানু, পেট্রল, ডলার ডন হিপি—ওরা সব কে কী করছে রে? গোপাল একটু হাসল। বলল, মানুকে মিস করলি। ভোলা মানুকে বিয়ে করেছে। আমি খুশি হয়ে বললাম, খুব ভাল করেছে ভোলা। ভোলা এখন কী করছে? গোপাল বলল, ওর লাকটাই খারাপ। বাবার ওষুধের দোকান বেচে দিয়েছে। এখন চা

বেচে। মানুকে প্রস বলতে পারিস। হাইওয়ের ট্রাকডাইভারদের মদ সার্ভ করে—নিজের চোখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। চিকন বেঁচে থাকলে পারত, বল? চিকনকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম। তবে ভঞ্জুদা এবার আমার রিয়্যাল এনিমি, জানিস তো? এই যে মাসে একবার করে কলকাতা আসি, হাইকোর্টে লড়ছি। আমি আস্তে বললাম, আমাদের বাড়িটা? গোপাল তেতোমুখে বলল, বাড়িটা নিয়েই তো! ওখানে ভঞ্জুদা গোডাউন করেছে। কন্ট্রাক্টারি করে লুটে খাচ্ছে দুহাতে। গভমেন্ট মাইরি কিছু দ্যাখে না? চিমটেকে টাকা খাইয়ে—ছেড়ে দে! বউঠান, কাল রাত্তিরে খেলা দ্যাখেননি? বউঠান উজ্জ্বল হেসে বলল, হুঁউ! অসাধারণ! গোপাল বলল, পেলে কী লিখেছে পড়েছেন? সে কাগজটা তুলে দেখে বলল, ধুস! এ কাগজটা না। বউঠানের সঙ্গে সে 'বিশ্বজয়ী মারাদোনা' নিয়ে কথা বলতে লাগল। এক ফাঁকে আমি ওকে ডাকলাম, গোপাল! গোপাল খ্যাখ্যা করে হাসতে হাসতে বলল, জানেন বউঠান, ও একবার ঝুলনের মেলায় হারিয়ে গিয়েছিল? ভাবুন অবস্থা। নিজের হোমটাউনে নিজেই খ্যা খ্যা খ্যা। তার বউঠান অর্থাৎ আমার বউ ডাল-পোড়ার গন্ধ পেয়ে কিচেনের দিকে ছুটে গেল। আমি দেখলাম একটা সোনালী ডানার চিলের উড়ে যাওয়া। গোপালের সঙ্গে চিলটাও উড়ে এসেছিল। বললাম চিকন—গোপালও পলকে গম্ভীর হয়ে বলল, চিকন! চিকন থাকলে ইডলি ভেসে যেতে পারত ভাবছিস? সামান্য একটা রিকশোওয়ালার সঙ্গে—আপন গড। তুই চিনবিনে। গোপাল উপসংহারে বলল, চিকন থাকলে আর যাই হোক, এসব হত না। আমাদের তখন বয়স কম। বুঝতে পারিনি, চিকন ওদের সংসারকে বাঁচাবার জন্য স্ট্রাগল দিচ্ছিল। হঠাৎ মরে গেল। গোপাল খবরের কাগজটা টেনে নিল। পড়তে পড়তে সে ক্রমাগত হুঁ, হুঁ দারুণ, বলতে বলতে উরে ব্বাস চেঁচিয়ে উঠল। কী লিখেছে মাইরি! পায়ে বল, জিওমেট্রিক গতিতে বেঁকে যেতে-যেতে, কাট বাই কাট করে, এঁকেবেঁকে গোলের দিকে, তারপর ছিলেছেঁড়া ধনুকের মতো হঠাৎ সোজা হয়ে বিমূর্ত মানে? বিমূর্ত কামনাটিকে নেটে ঝুলিয়ে দিল—গো-ও-ল! আমি বললাম, চিল! গোপাল ভুরু কুঁচকে আনমনা হয়ে জিগ্যেস করল, উঁ? বলতে চাইলাম, জীবনের অলৌকিক বেঁকে যেতে-যেতে চিলের

মতো নেমে এসে পৃথিবীর কোমল লৌকিক মাটিকে ঠোঁটে চিরে দিলে যা হয়, তাই। জীবনের ফুটবল মৃত্যুর নেটে গিয়ে আটকে পড়লে যা হয় তাই। গোপাল আমাকে তাচ্ছিল্য করে কাগজে বাস্তবতাগুলোর ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ল আবার। কিছুক্ষণ পরে সে ঘড়ি দেখে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল এবং তার বউঠানের কাছে বিদায় নিয়ে মাঝে-মাঝে বিরক্ত করতে আসবে অর্থাৎ চিনি-ছাড়া চা খাবে বলে চলে গেল। তারপর মহিলাটি ভুরু কুঁচকে আমাকে জিগ্যেস করল, চিকন কে? বললাম, বৈজয়ন্তী। কী? ...চিল। ...তার মানে? ...জীবন। ...চালাকি কোরো না। বলো কে চিকন?... মৃত্যু।...আবার?...জীবন্মৃত্যু।...বলো না সে কে? নিশ্চয় তোমার পুরনো প্রেমিকা?...চিল। আমার বউ খুব রাগ করে কিচেনে চলে গেল। কিচেন থেকে মাছের ঝোলের গন্ধ ভেসে এল। বাস্তবতা। বাড়ির খুব কাছের স্কুল থেকে আমার বিচ্ছু ছেলে ফিরে এসে গানের সুরে বলতে থাকল, মারাদোনা! মারাদোনা! বাস্তবতা। আমার আপিস যাওয়ার সময় হয়ে এল। বাস্তবতা। আর এইসব বাস্তবতার দিকে বুকের ভেতর উড়ে-উড়ে কাঁদা একটা সোনালী ডানার চিল একদা মধ্যরাতে বেঁকে যেতে যেতে কাট বাই-কাট করে, তারপর ছিলেছোঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে গেলে, স্থির হয়ে গেলে, থেমে গেলে, বিমূর্ত কামনাটি নেটে ঝুলে যায় এবং সব শব্দ থেমে যায়, অবশেষে মারাদোনা. মারাদোনা তোমার জয়। মারাদোনা, তুমি জীবন। মারাদোনা, তুমি মৃত্যু। তুমি মধ্যরাতের চিল। তুমি ধনুকের মতো বেঁকে বুকের ভেতর সোজা হয়ে স্থির থাকো, যখন নেটের বাস্তবতায় আটকে ছটফট করতে করতে থেমে যায় একটি অলৌকিক। একটি চিল। সোনালী ডানার চিল।...।